অক্ষয়-সুধা

[অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের রচনা-সংগ্রহ]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক,' 'গোপীচন্দ্র,' 'চিন্ময়ী,' 'সাঁজের কথা,' 'নিশির কথা,' 'প্রবন্ধ-রত্ন,' 'প্রবন্ধ-মুকুল,' 'সীতার বনবাস,' 'শকুন্তলা,' 'রতন-পাঠ,' 'রত্ন-কণা,' 'সাগর-কণা,' 'ভারত-কণা,' 'ভারতবর্ষের ইতিহাস,' 'শিশুতোষ ভারত-ইতিহাস,' 'সাগর-সুধা,' 'মোহন-সুধা,' 'প্যারী-সুধা,' 'বিচিত্র-সুধা,' Types of Early Bengali Prose (Cal-University) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা ও সম্পাদক

শ্রীশিবরতন মিত্র

সঙ্কলিত

প্রথম সংস্করণ

১৩৩১

মূল্য ১।০ এক টাকা মাত্র

ভূমিকা

প্রতিভাশালী সাহিত্যিকগণের বিভিন্ন বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার সংগ্রহ-
স্থ বালকগণের ভাব-সঞ্চয়ের পক্ষে সহায়তা করিলেও, ভাব প্রকাশের
ান একটি বিশিষ্ট ধারা, স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দেশ করে না। যে সকল বালক,
.ঙ্গ-সাহিত্য আলোচনায় কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, বিভিন্ন ভাবরাজি কতকটা
আয়ত্ত করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের মনোগত ভাব প্রকাশের জন্য,
কোন একটি বিশিষ্ট ধারা বা রচনা-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।
কিন্তু কোন প্রতিভাশালী লেখকের রচনার ধারা, তাঁহার দুই একটি প্রবন্ধ
বা দুই একখানি মাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে, সম্যক্রূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না। বিভিন্ন
ভাব অবলম্বনে রচিত বিভিন্ন বিষয়ক রচনা পাঠ করিলে—এক কথায়,
.কান এক নির্দ্দিষ্ট লেখকের সর্ব্ববিষয়ে মনোগত ভাব প্রকাশের ধারা
আলোচনা করিলে, তাঁহার রচনাভঙ্গির আদর্শ বালকগণের প্রকৃষ্টরূপ
আয়ত্ত হইতে পারে—অন্যথায় নহে।

বালকগণ, তাহাদের রচনাবিষয়ে কিরূপ ধারা অবলম্বন করিবে, তাহার
আদর্শ স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় যে কয়জন খ্যাতনামা লেখকের নাম নির্দ্দেশ
করিয়া থাকেন, অনন্য সাধারণ প্রতিভাশালী লেখক স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত
মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের রচনা
সঞ্চয় করিয়া 'অক্ষয়-সুধা'-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। এই গ্রন্থে, অক্ষয় কুমার
দত্ত মহাশয়ের সর্ব্ববিধ রচনা হইতে আদর্শ সংগৃহীত হইয়াছে। আশা করি,
বিদ্যার্থিগণ এই গ্রন্থ পাঠে দত্ত-মহাশয়ের অবলম্বিত বিশুদ্ধ রচনা-পদ্ধতি,
সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

প্রতিভাশালী সাহিত্য-শিল্পিগণের সাধনা দ্বারা, সাহিত্যের রচনা রীতি
ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতেছে এবং ভাষার সামর্থ্য, লালিত্য, স্বচ্ছতা ও

প্রকাশক—
৺কালী প্রসন্ন নাথ
রিপণ লাইব্রেরী, ঢাকা।

কলিকাতায় প্রাপ্তিস্থান
স্কুল লাইব্রেরী
৬৪নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশিবরতন মিত্র সম্পাদিত

গদ্য-সুধা গ্রন্থাবলী

১ মোহন-সুধা—(রাজা রামমোহন রায়ের রচনা-সংগ্রহ)
২ প্যারী-সুধা—(প্যারী চাঁদ মিত্রের রচনা-সংগ্রহ)
৩ অক্ষয়-সুধা—(অক্ষয় কুমার দত্তের রচনা-সংগ্রহ)
৪ সাগর-সুধা—(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা-সংগ্রহ)
৫ বিচিত্র-সুধা—(বিভিন্ন প্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনা-সংগ্রহ)

প্রত্যেক পুস্তকে বিস্তৃত ভূমিকা ও পরিশিষ্ট আছে।

Printed by S. A. Gunny,
At the Alexandra S. M. Press, Dacca

মাধুর্য্য ক্রমে ক্রমে প্রকটিত হইতেছে। সাহিত্যের রচনা-রীতির এই ক্রমবিকাশের প্রতি শিক্ষার্থিগণের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। কোন সাহিত্যিকের রচনা-রীতি বুঝিলে, তাঁহার মানসিক প্রকৃতিও বুঝিতে পারা যায়—রচনা-রীতির মধ্যে সাহিত্য-শিল্পীর ব্যক্তিত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে। Style বা রচনা-রীতি বর্ত্তমান সময়ে, এই সমুদয় প্রণালীর অনুবর্ত্তনে আলোচিত হইতেছে। এই আলোচনা বড়ই শিক্ষাপ্রদ ও হিতকারী। এই দুইটি প্রণালী বা পদ্ধতিকে ঐতিহাসিক Historical এবং মনোবিজ্ঞান মূলক Psychological পদ্ধতি বলে। বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য, এখন আর কেবল মাত্র সুকুমারমতি বালক বালিকার পাঠ্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে পর্য্যন্ত ইহার পঠন-পাঠন চলিতেছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি অনুসারে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের রচনা রীতির ক্রমবিকাশ আলোচনা করা দরকার। এই নিমিত্ত, 'অক্ষয় কুমার দত্ত ও বঙ্গ সাহিত্য'-প্রবন্ধে, অক্ষয় কুমারের গদ্য রচনা-রীতির আলোচনা-প্রসঙ্গে, সাধারণ ভাবে বাঙ্গলা গদ্য রচনা-রীতি বা রচনা-ভঙ্গির কিছু বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছি। এই প্রবন্ধে, সাধারণভাবে বাঙ্গালা গদ্য রচনা-ভঙ্গি-বিষয়ের কতকগুলি মূল-সূত্রের আলোচনা করা হইয়াছে। এই পর্য্যায়ের পর পর গ্রন্থাবলীর ভূমিকা পাঠ করিলে, পাঠকগণ অনায়াসেই, রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে প্রায় বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য ও রচনা-ভঙ্গির ক্রমবিকাশের একটি সুস্পষ্ট ধারাপাত লক্ষ্য করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, এই ক্রমবিকাশের ধারা পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশেই, 'গদ্য-সুধা-গ্রন্থাবলীর' আদর্শ-রচনাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। এই সুযোগে, প্রত্যেক আদর্শ গ্রন্থকারের সাহিত্য-সাধনার বৈশিষ্ট্য যাহাতে সহজেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়, তদ্বিষয়ে নিয়ত সতর্ক লক্ষ্য রাখিয়াছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরদর্শী কর্ত্তৃপক্ষগণ, এই পর্য্যায়ভুক্ত 'সাগর-সুধা'

গ্রন্থ ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার্থিগণের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করিয়া, সঙ্কলয়িতাকে চিরঋণী ও পরম উৎসাহিত করিয়াছেন। এখন, 'অক্ষয়-সুধা' গ্রন্থ খানিও শিক্ষার্থিগণের জন্য গৃহীত হইলে, গ্রন্থকারের পরিশ্রম ও যত্ন সফল হইবে।

এই গ্রন্থের ভূমিকা-অংশের—'অক্ষয় কুমার দত্ত ও বঙ্গ-সাহিত্য' প্রবন্ধ 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' (পৌষ ও মাঘ-সংখ্যা, ১৩৩১) এবং পরিশিষ্ট অংশের 'স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত—স্বরূপ নির্ণয়' প্রবন্ধ, 'নব্যভারত' (ভাদ্র, ১৩৩১) পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সুযোগে, এই পত্রদ্বয়ের সম্পাদকগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া ধন্য হইলাম।

রতন-লাইব্রেরী
বীরভূম
২৬ শে বৈশাখ, ১৩৩১

শ্রীশিবরতন মিত্র

সূচী

চতুর্থ খণ্ড—বিবিধ

পরিশিষ্ট

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্গসাহিত্য

(১)

মানুষের ন্যায় সাহিত্যেরও দেহ ও আত্মা আছে—এই উভয়েরই আলোচনা করিতে হইবে। ভাষা বা রচনা-রীতি—এই দেহ ; আর ভাব, অর্থ ও আলোচ্য বিষয়—এই আত্মা। ভাবের সহিত ভাষার ব্যবধান যত কম, সাহিত্য ততই প্রাণময়। ভাষা এমন স্বচ্ছ ও সুনির্ম্মল হওয়া চাই যে, ভাবের প্রতিবিম্ব, সেই ভাষার দর্পণে অক্ষুণ্ণভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ভাষা এমন কমনীয় হওয়া চাই যে ভাবের অনুমাত্র স্পন্দন-বৈচিত্র্য, ভাষার মধ্যে প্রতিফলিত হইবে। ইহাই আদর্শ রচনা-রীতি। কিন্তু, কোনও সাহিত্যের রচনা-রীতি হঠাৎ একদিনে, এই আদর্শ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয় না। সাহিত্য-শিল্পিগণ পরিশ্রম করিয়া, সাহিত্যকে ক্রমে ক্রমে এই আদর্শ অবস্থায় পরিচালিত করিতেছেন। সাহিত্যের সমালোচনায় ইহাই প্রথম সূত্র।

জাতীয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, জাতির প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই। অনেকগুলি নরনারী যে সময়ে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবিধ প্রকারের বৈষম্য সত্ত্বেও, একটি সাধারণ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া একতাবদ্ধ হয়, সেই সময়ে ঐ মানব সমষ্টিকে জাতি বলা যায়। যে সাহিত্য, ঐ জাতীয়-চিত্তের ও জাতীয়-কল্পনার দর্পণস্বরূপ, অর্থাৎ জাতির জীবনের যাবতীয় আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, চিন্তা, চেষ্টা ও রসাস্বাদন সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন ঐ সাহিত্যকে জাতীয়-সাহিত্য বলা যায়। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের কেবল যে একটা মূল্য আছে তাহা নহে—সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব আছে। এই মহত্ত্ব, নানারূপ আচরণের দ্বারা সকল সময়ে সুপরিস্ফুট নহে। কিন্তু মানব যখন সচ্চিদানন্দের

কণা, তখন ভাবুকের দৃষ্টির নিকট, সেই সৌন্দর্য্য আত্মগোপন করিতে পারে না। একটি জাতি বলিলে, নানা প্রকারের বহু নরনারীকে বুঝায়। সুতরাং, জাতির জীবন অনন্ত বৈচিত্র্যময়। দ্বিতীয়তঃ, এই বৈচিত্র্যময় জীবন নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল—সর্ব্বদাই এক সুদূরবর্ত্তী লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কোনও সাহিত্য, 'জাতীয়-সাহিত্য'—এই নামে অভিহিত হইবার যোগ্য কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে দেখিতে হইবে—এই সাহিত্যে জাতির জীবনের বৈচিত্র্য, পরিবর্ত্তন ও উন্নতিমুখী গতি, কি পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে আমাদের দেশে, জাতীয়-সাহিত্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু একদিনে জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিবার নহে। প্রত্যেক মানুষকে জাগিয়া উঠিতে হইবে, আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সাহিত্য এই প্রকাশের বাহন। সাহিত্যের দ্বারা আমরা প্রত্যেকে অপরকে বুঝিব, অপরের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া প্রেমসূত্রে বদ্ধ হইব এবং আমাদের মধ্যে বাহ্যজীবনে বৈষম্য ও ব্যবধান থাকিলেও, হৃদয়রাজ্যে আমরা সকলেই যে এক পরম ঐক্য-সূত্রে বদ্ধ তাহা বুঝিতে পারিব। জাতীয়-সাহিত্যের সাধনা, মানুষকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিবে, এই দীক্ষায় দীক্ষিত করিবে। জাতীয় সাহিত্যের পর—বিশ্বমানবের সাহিত্য। কিন্তু সে বিষয়ের এখন আলোচনা করার প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাহিত্যের আলোচনায় দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে—ভাব ও ভাষা। ভাবের আলোচনা দ্বারা অনেকে দেখাইয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির হৃদয় ও মন বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। কিন্তু ভাষার আলোচনা দ্বারা এই তত্ত্ব দেখাইবার তেমন বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। অর্থাৎ, বাঙ্গালা সাহিত্যের রচনা-রীতি বা পদ-বিন্যাস, অন্তর্মুখী হইয়া বিশেষভাবে আলোচিত

হয় নাই। কিন্তু এই আলোচনা বিশেষরূপে আবশ্যক। আমরা এই উদ্দেশেই বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনা-রীতি আলোচনার চেষ্টা করিতেছি।

কোনও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-শিল্পী সম্বন্ধে যথার্থরূপে আলোচনা করিতে হইলে, তাঁহার সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্য কি, তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। সাহিত্যালোচনার দ্বারা কি হয়? মানবের হৃদয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তি অনুশীলিত ও মার্জ্জিত হয়, তাহার অনুভবশক্তি ও উপভোগ-শক্তি ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করে। স্বভাবের শিশু মানব, সাহিত্য আলোচনা দ্বারা একটি উন্নততর অবস্থায় আরোহণ করিয়া, মানব-জীবনের ধন্যতা ও পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং, সাহিত্যশিল্পী মানব জীবনের গুরু ও পথপ্রদর্শক। তিনি বন্ধুর ন্যায় হাস্যমুখে ও মিষ্টভাবে জনসাধারণের আপনার জন হইয়া, তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার একটি উন্নততর লক্ষ্য থাকা চাই। সেই লক্ষ্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই প্রতিবিম্বিত হইতেছে। আর তিনি নব নব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া, মানবকে সেই আদর্শ বা লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সাহিত্যশিল্পে ইহার নাম—**লক্ষ্য বা আদর্শ**।

সাহিত্য-শিল্পীর যেমন একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন, তেমনি সেই লক্ষ্যে মানবকে পরিচালিত করিবার একটি সুনির্দ্দিষ্ট **পন্থাও** থাকা আবশ্যক। মানবের আলোচনার বিষয় অসংখ্য। আমরা আমাদের ভাবুকতার দ্বারা, প্রতিদিন বিবিধ প্রকার বিষয় ও ব্যাপারের সংস্পর্শে আসিতেছি। সমাজ, ধর্ম্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্য্য ও রহস্য, নরনারীর বিচিত্র প্রকারের জীবনযাত্রা পদ্ধতি, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের, ইহলোকের ও পরলোকের, নিকটের ও দূরের, বহু বহু বিষয় ও ব্যাপার আমাদিগকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া, সুখী করিয়া

দুঃখী করিয়া, ভোগাসক্ত করিয়া বিষয়-বিরক্ত করিয়া, আমাদের বাস্তব-জীবন, মানসজীবন ও ভাবজীবনের উপর চেষ্টা, কল্পনা, অনুভূতি ও বিচারণার সাহায্যে অসীম-প্রসারী প্রবাহবৎ বহিয়া যাইতেছে। ইহার ভিতর হইতে কোন্ কোন্ বিষয় ও ব্যাপার নির্ব্বাচিত করিয়া তাহার সহিত মানবের বিশেষ প্রকারের পরিচয় সাধন করাইতে হইবে, তাহার ভিতরের রস আবিষ্কার করিয়া, মানবকে আস্বাদন করাইতে হইবে, সাহিত্য-শিল্পীকে তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই নির্ব্বাচনের দ্বারা সাহিত্যশিল্পীর মানসিক প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। নির্ব্বাচন ও রসসৃষ্টি, সাহিত্য-শিল্পীর পন্থা।

কোনও সাহিত্য-শিল্পীকে যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে তাঁহার লক্ষ্য ও পন্থা—এই দুইটি বিষয় আলোচনা করা দরকার। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য একটি অতি সুবৃহৎ ব্যাপার। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। একজন সাহিত্যশিল্পী, প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য স্বয়ং উপভোগ করিতেছেন—এই উপভোগের আনন্দ যেন তাঁহার হৃদয়ে ধরিতেছে না, তিনি সকল মানবকে এই আনন্দ যেন আস্বাদন করাইবার জন্য আকুল হইয়া সাহিত্যের সাহায্যে, সেই সৌন্দর্য্য ও সেই সৌন্দর্য্যের উপভোগকে মূর্ত্তিদান করিয়া বিতরণ করিতেছেন। অসংখ্য কবি ও সাহিত্যশিল্পী এই কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই একই প্রকারের সুন্দর বস্তু নির্ব্বাচন করেন নাই, এবং সকলের উপভোগের প্রণালীও ঠিক একরূপ নহে। প্রকৃতি একজন ভাবুকের নিকট এক এক মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্মশান, ভাঙ্গা বাড়ী, পরিত্যক্ত জনপ্রদ প্রভৃতি কাহারও উপভোগের বিষয়; জলপ্রপাত, ভীষণ বনভূমি, মরুদেশ কাহারও হৃদয়বৃত্তির অনুকূল; ক্ষুদ্র গ্রাম, গ্রাম্য-সমাজের সুখ দুঃখ, গার্হস্থ্য-জীবনের হাসিকান্না কাহারও প্রীতিপ্রদ। কেবল সাহিত্যশিল্পীর মানসপ্রকৃতির আলোচনা করিতে হইলে, গভীর ভাবে

অনুভব করিতে হইবে কোন্ শ্রেণীর চিত্রে ঐ শিল্পীর স্বভাবতঃই গভীরতম রসাস্বাদন হইয়া থাকে। কোন কোনও লেখক, সাহিত্য-রচনায় আত্ম-গোপনের চেষ্টা করিতে পারেন। অর্থাৎ নিজের সত্যসত্যই ভাল লাগুক বা না লাগুক, সাহিত্যিক-বিধানের ব্যবস্থানুসারেই শ্মশান, বনস্থল, রাজসভা প্রভৃতি বর্ণনা করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত রসভাবনাচতুর সমালোচকের নিকট এই প্রকারের কৃত্রিম রচনা আত্মগোপন করিতে পারে না। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে পরবর্ত্তী যুগের অনেক রচনা এবং সেই সমুদয় রচনার অনুকরণে বা আদর্শানুযায়ী রচিত অনেক বাঙ্গালা রচনা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

সুতরাং সাহিত্য-শিল্পীর হৃদয় ও মন, কোন্ কোন্ বিষয়ে ও ব্যাপারের আলোচনায়, তাহার স্বরূপের উপলব্ধি করে, তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কোনও লেখকের রচনাবলী হইতে যদি কতকগুলি বিষয় শিক্ষার্থিগণের জন্য নির্ব্বাচিত করিতে হয়, তাহা হইলে সেই লেখকের মানসপ্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া, তাঁহার সাহিত্য-সাধনার লক্ষ্য ও পন্থা বুঝিয়া তদনুযায়ী এই নির্ব্বাচন কার্য্য করিতে হইবে।

এমন অনেক লেখক আছেন, যাঁহাদের সাহিত্যের কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য বা সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা নাই। এই শ্রেণীর লেখকগণ, দুই একটি খণ্ড রচনায় যশোলাভ করিয়া সাময়িক-সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাওয়া অসম্ভব। অনেক সাহিত্য-শিল্পী, তাঁহার লক্ষ্য ও পন্থা এবং তাঁহার মানস-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নিজে না জানিতে পারেন, তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যাঁহারা সাহিত্যের সমালোচক ও প্রকৃত ব্যাখ্যাতা তাঁহারা এই লক্ষ্য, পন্থা ও মানসিক বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করিবেন—ইহাই সাহিত্য-শিল্পীর নিজস্ব। এই নিজস্বের পূর্ণ বিকাশ, মানব-জীবনকে প্রকৃত প্রস্তাবে মহিমান্বিত করে।

লেখকের ব্যক্তিগত মানস-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের প্রকাশরূপে রচনা-রীতির আলোচনা করা, আমাদের দেশে প্রাচীন কালে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ, রচনা-রীতিকে যে তিন বা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশের কোন কথা নাই। তবে যাঁহারা উচ্চতম শ্রেণীর লেখক, তাঁহাদের রচনায় ব্যক্তিত্বের চিহ্ন ধরিতে পারা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির অনুসরণ করাই, সে কালের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা-সাহিত্য, কেবল মাত্র সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের বিধানের শাসনাধীনে বিকশিত হয় নাই। সুতরাং, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের তুলাদণ্ডে ইহার পরিমাপ করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যে যে সমুদায় লেখকের লক্ষ্য, পন্থা ও বৈশিষ্ট্যও ধরিতে পারা যায়, তাঁহাদের রচনা-রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ ভাবে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, আমাদের সাহিত্য-সাধনা অনেক সময়ে কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায়, সাময়িক উত্তেজনায় ও বিভিন্নমুখী প্রবাহের তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে। অতীতের হিসাব নিকাশের প্রয়োজন, এরূপ অবস্থায় অত্যন্ত অধিক। নতুবা, বর্ত্তমানকে আমরা একটি গৌরবময় সুনিশ্চিত পথে, সজ্ঞানভাবে লইয়া যাইতে পারিব না।

(২)

বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য-রচনার সুপ্রতিষ্ঠিত লক্ষ্য এই যে, সকলে যেন রচনা বুঝিতে পারে। কারণ আমাদের এই যুগ যে জনসাধারণের যুগ, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই। অবশ্য একেবারে প্রত্যেক নরনারীকে সকল বিষয় বুঝাইয়া বলা অত্যন্ত কঠিন এবং অনেক সময়ে অসম্ভব বলিয়াই

মনে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য-সাধনার আদর্শ এইরূপ। পূর্ব্ব-কালে এই আদর্শ বা লক্ষ্য সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের রীতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, গ্রাম্যতাদোষ কাব্য-রচনায় পরিত্যাগ করিতে হইবে। গৌড়-রীতি ওজোগুণ যুক্ত—ইহাতে পদের আড়ম্বর ও দীর্ঘ সমাসের বাহুল্য থাকা প্রয়োজন। পাঞ্চাল-রীতিতেও রচনা কৌশলপূর্ণ। সুতরাং এই উভয় প্রকারের রচনার রীতি বুঝিতে হইলে, বিশেষ প্রকারের শিক্ষার প্রয়োজন। অনেক সময়ে লেখক নিজেই, কাব্যের টীকা রচনা করিয়াছেন—নতুবা, পণ্ডিতের পক্ষেও তাঁহার রচনা অবোধ্য থাকিয়া যাইত। যে রীতিতে প্রসাদগুণ অধিক, তাহাকে বৈদর্ভী-রীতি বলে। এই রচনায়, শব্দের অর্থ পরিস্ফুট। কিন্তু প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, বাক্যের বা পদের অর্থ সুব্যক্ত করিবার জন্য, রচনা যেন গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট না হয়।

সকলেই যাহা বুঝিতে পারে, তাহাই গ্রাম্যতা দোষ। 'সর্ব্বলোকাবগম্যং যৎ গ্রাম্যং তদভিধীয়তে'—'কাব্যচন্দ্রিকায়' এই লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। অতএব অশিক্ষিত বা গ্রাম্য জনসাধারণ যাহা বুঝিতে পারে, তাহাই 'গ্রাম্য'। এই আদর্শে যখন সাহিত্য রচিত হয়, তখন উহা সম্প্রদায় বিশেষের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হইয়া থাকিত। অভিজাতবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিরা কাব্য রচনা করিতেন। যাঁহারা ভদ্রস্থানে ধনবান বা ভাগ্যবান বা সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সভায় যাতায়াত করিতেন, তাঁহারাই কাব্যরস আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইতেন। সকলেই কাব্য-রস আস্বাদনের বা সংস্কৃত সাহিত্যের উপভোগের অধিকারী ছিলেন না। ইংলণ্ডেও এই প্রকার সময় ছিল। কেবল ইংলণ্ডের কথাই বা বলি কেন? পৃথিবীর সকল দেশেই সাহিত্যে ও সমাজে, এই প্রকারের সাম্প্রদায়িকতার যুগ ছিল এবং এখনও সেই প্রাচীন যুগের অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

একদিকে বাছাই করা সুবিধাভোগী কতকগুলি মানুষ, আর একদিকে অসংখ্য জনসাধারণ। ভদ্র-সাহিত্য, এই বাছাই করা মানুষদের উপভোগের সামগ্রী। জনসাধারণের মধ্য হইতে সাহিত্য-স্রষ্টার উদ্ভব হইলে, ঐ ভদ্রলোকেরা তাহাকে উন্নীত করিয়া নিজেদের দলে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সাহিত্য-রচয়িতাগণ সুবিধাভোগী ও শক্তিশালী রাজন্যবর্গের গুণগান ও তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া, নিজেদের সামর্থ্যের সার্থকতা সাধন করিয়াছেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সমুদয় দেশে, দলাদলির দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালিত হয়, সেখানে অনেক শক্তিশালী লেখক, কোন রাজনীতিক দলের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়াছেন এবং সেই দলের সেবায় নিজের শক্তি নিয়োজিত করিয়া পার্থিব সুবিধা ভোগ করিয়াছেন।

সাহিত্য-সাধনার এই অবস্থা সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারের অবস্থার মধ্যে কোন কোন কবি বা সাহিত্য-স্রষ্টা, জনসাধারণের সহিত থাকিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা তথা কথিত ভদ্রলোকের দলে আসিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৈদিক-যুগে বা তাহার পরবর্ত্তী যুগে, সাহিত্য সাধনার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বলা বড় সহজ নহে এবং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু বৌদ্ধ যুগে, যখন পালি-ভাষায় এবং নানারূপ সরল উপাখ্যানের সাহায্যে তত্ত্বকথা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল এবং তাহার পর প্রাকৃত ভাষায় রচিত কোনও দোঁহার দ্বারা জনসাধারণের সাহিত্যের ভিত্তি সংগঠিত হইতে আরম্ভ হইল, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, জনসাধারণের জাগরণ হইয়াছে এবং সাহিত্য, সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তিরূপে না থাকিয়া সর্ব্বসাধারণের মহামিলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগে যেমন, মধ্য-যুগে আমাদের বাঙ্গালা দেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্ভব ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের সৃষ্টিও সেইরূপ। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ঠিক্ এই সময়ে শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভুর যুগের সমলক্ষণাক্রান্ত যুগ দেখিতে পাওয়া যায়। নানক, কবীর, দাদু, রামানন্দ, আসামের শঙ্করদেব, উৎকলের জগন্নাথ দাস বা অচ্যুতানন্দ দাস প্রভৃতি—এই জনসাধারণের যুগের প্রবর্ত্তক। ধর্ম্ম ও সাহিত্য এই উভয় বিভাগেই এই সমুদয় যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন এবং তাঁহারা ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ, জনসাধারণের ভাষায় সর্ব্বসাধারণের জন্য, যুগবাণী প্রচার করিয়াছেন। আমাদের দেশে, নবযুগে বা আধুনিক যুগে, রাজা রামমোহন রায়ের উদ্ভব ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা এই শ্রেণীর ঘটনা।

নবীন বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃতি আলোচনা করিবার সময় এই বিশেষ লক্ষণটি মনে রাখা আবশ্যক। রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাব ব্রাহ্ম সমাজ নামক একটি সীমাবদ্ধ ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্য দিয়াই যে বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা নহে—নানা দিক্ দিয়া সেই প্রভাব, নানা প্রকারে রূপান্তরিত ও পরিপুষ্ট হইয়া, আমাদের সমগ্র সমাজ-জীবনে ক্রিয়া করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। নব্য-বঙ্গের বা নব্যভারতের নব যুগ বলিতে যাহা বুঝায়, এবং বঙ্গ-সাহিত্যের যেগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ, সেই লক্ষণ গুলি, রাজা রামমোহন রায়ের সাধনার প্রত্যক্ষ ফল। রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবেই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ভব এবং তত্ত্ববোধিনী-সভার প্রতিষ্ঠা। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় মূলতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আনুগত্য করিয়া, তত্ত্ববোধিনী-সভার প্রধান কর্ম্মী হইয়াছিলেন। একদিকে অক্ষয়কুমার দত্ত, আর একদিকে তাঁহারই সমসাময়িক টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্র—উভয়েই রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া, বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্যারীচাঁদ মিত্র—বঙ্গীয় সাহিত্য-সাধনার এই দুইটী ধারা ব্যতীত, আর একটি ধারা উল্লেখযোগ্য। উহাকে আধুনিক হিন্দু

ধর্ম্মের পুনরুত্থান বলা যায়। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে, রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে শক্তি জাগ্রত হইয়াছিল, সেই শক্তি বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধন-ক্ষেত্রেও আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। এই তৃতীয় ধারার নেতৃগণ, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পণ্ডিতী বাঙ্গালার উত্তরাধিকারী হইলেও, তাঁহাদের প্রকৃতি অল্প দিনের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই পরিবর্ত্তনের কারণও রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলন ও জন-সাধারণের জাগরণ।

আমরা সাহিত্যের রচনা-রীতির এই ত্রি-ধারার আলোচনায়, সর্ব্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত, তাহার পর প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) এবং তাহার পর সমসাময়িক পণ্ডিতী-আন্দোলনের আলোচনা করিব। এই স্থানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে—এই তিনটি ধারা যে প্রথম হইতেই, স্থূলরূপে পৃথক্ পৃথক্ পথে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে ক্রমাগত অল্পাধিক পরিমাণে বিচিত্র প্রকারের মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। এই তিনটি ধারা অবশ্য পরিণামে এক পুণ্য-প্রয়াগে সম্মিলিত হইবে। কিন্তু এই মিলনের পথে, নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাত ও আলোচনা-আন্দোলন স্বাভাবিক ; এবং যাহা স্বাভাবিক, তাহাই ঘটিয়াছে।

(৩)

সাহিত্য রাজ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের প্রকৃত স্থান কোথায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসের দুই একটি কথা জানা আবশ্যক। রাজা রামমোহন রায় একটি রহস্য। তিনি কি, তাহা সম্পূর্ণ রূপে ও সঠিক ভাবে বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন। বহু বহু মনীষী তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকেই নূতন কথা বলিয়াছেন। সাধারণ মানুষ হইতে যাঁহারা খুব বেশী উপরের লোক, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই

প্রকারের মতভেদ চিরকালই হইয়া থাকে। ইহাতে বিস্মিত বা বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। আমরা এস্থলে একটি মাত্র উদাহরণ দিতে চাই। 'তত্ত্ববোধিনী-সভা' (প্রথম নাম—'তত্ত্ব-রঞ্জিনী সভা') প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে যখন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হয়, ঠিক্ সেই সময়েই (১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৩) The Hindu Theo-Philanthropic Society নামক একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া, পরমাত্মরূপে ও সত্যরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করা এবং জনসেবা করা, এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এই সভার সহিত প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। এই সভা দাবী করিতেন যে, তাঁহারা রাজা রামমোহন রায়েরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। এই সভা অবশ্য স্থায়ী হয় নাই—মাত্র তিন বৎসর কাল ইহার পরমায়ু। কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে এই সভা, বাঙ্গালা ভাষায় বহু উন্নত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়, এই সভার বিশিষ্ট সভ্য ও পরিচালক ছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে, তিনি রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি দেখাইয়াছিলেন যে —হিন্দুরা বলেন যে রাজা হিন্দু ছিলেন, খ্রীষ্টানেরা বলেন যে তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন, আবার মুসলমানেরা বলেন, তিনি মুসলমান ছিলেন। একত্ববাদী খ্রীষ্টান ও বেদান্তমতাবলম্বিগণও তাঁহাকে তাঁহাদের আপনার লোক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বর-বিশ্বাসী বেন্থাম-মতাবলম্বী (Religious Benthomite) ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয় প্রচারক ডাফ্ সাহেবের জীবনচরিত লেখক জর্জ্জ স্মিথ বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর সময় রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন—তিনি হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান নহেন। স্মিথ

সাহেবের মতে রাজা ঈশ্বর-বিশ্বাসী বেন্থামমতাবলম্বী ছিলেন। অবশ্য রাজা রামমোহন রায়ের মতের বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমাদের অধিকার বহির্ভূত। আমাদের বক্তব্য এই যে, রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাব, নানা মূর্ত্তিতে বঙ্গীয় সমাজে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। Hindu Theo-Philanthropical Societyর সভ্যেরা, রাজা রামমোহন রায়কে গুরু বা পথ-প্রদর্শকরূপে স্বীকার করিতেন—কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের উপর তুষ্ট ছিলেন না। রাজা রামমোহন রায় যে কেমন 'রহস্য', ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

যাহা হউক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রত্যক্ষ ভাবে রাজা রামমোহন রায়ের ভাবরাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজার সাধনার পতাকা হস্তে লইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

(৪)

নব্যবঙ্গের ভাবজীবনের ইতিহাসে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', এক সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিশালী ব্যাপার ছিল। এই পত্রিকা যাহা করিয়াছেন, সেই কার্য্যসাধনে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। অক্ষয়কুমার তাঁহার সহিত অনেক সংগ্রাম করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি দেবেন্দ্রনাথেরই প্রধান সেনাপতি ছিলেন। অক্ষয়কুমার যখন সাধনক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন তখন দেখিলেন, দেশের ও আমাদের জীবনের সর্ব্বত্রই অতি ভয়ঙ্কর জড়তা। আমাদের এই প্রাচীন দেশের নরনারী, নানারূপ ভ্রান্ত সংস্কারে শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া, একেবারে জড়বৎ পড়িয়া রহিয়াছে। বাহিরে বিশাল ও বিচিত্র জগৎ, চারিদিকে উন্নতিশীল নানাজাতির বিচিত্র সাধনা ও উদ্যম;—কিন্তু আমরা একেবারেই অসাড় ও নিস্পন্দ! আমাদের বুদ্ধিকে নিগড়মুক্ত করিয়া, স্বাধীন চিন্তায় দীক্ষিত

করাই অক্ষয়কুমারের জীবনের সাধনা ছিল। ইউরোপ বা নব্যজগৎ তাহার নবীন উদ্যম লইয়া, প্রাচীন ভারতের দুয়ারে উপস্থিত। ভারতবর্ষ, এই নবসাধনার চাপে নিপ্পেষিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, কিংবা জাগিয়া উঠিয়া এই নবসাধনকে আত্মসাৎ করিয়া, নববলে বলীয়ান হইয়া সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে—ইহাই সেদিনের সমস্যা ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু নবযুগের ধর্ম্ম ঠিক্ প্রাচীন যুগের ধর্ম্ম নহে। অক্ষয়কুমার ইহা বুঝিতেন এবং অক্ষয়কুমারের নেতৃত্বাধীনে ইউরোপের সমুদয় বিদ্যাকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা, এই 'তত্ত্ববোধিনীর' মধ্য দিয়া আরম্ভ হয়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—বাঙ্গালীর ছেলেদের মধ্যে ইংরাজী ভাব প্রবেশ করান, সর্ব্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা সাধিত হয়। সে সময়ের একজন বড় অধ্যাপক Rev. John Anderson সাহেব বলিয়াছেন Akhoykumar is Indianising European Science। অক্ষয়কুমার দত্তের বাণী সংক্ষেপে এই—"তোমরা চিন্তারাজ্যে স্বাধীন হও এবং প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বকে আদর করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর। আজ এই বিশ্ববেদ তোমাদের গ্রহণীয়।" প্রাচীন বেদের প্রতি অন্ধ অনুরাগ, আমাদের সাধন শক্তিকে পঙ্গু করিয়াছে বলিয়া অক্ষয়কুমার বিশ্বাস করিতেন। পূজা ও প্রার্থনা প্রভৃতির ভাবুকতা অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের অকর্ম্মণ্য করিয়াছে বলিয়া অক্ষয়কুমার বিশ্বাস করিতেন। তাই তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথকেও বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ক ধারণা হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলেন এবং অমিত সাহসের সহিত প্রার্থনার আবশ্যকতা অস্বীকার করিয়াছিলেন।

স্বাধীন চিন্তার পরিণাম কি? সংস্কারমুক্ত বুদ্ধি মানুষকে কোথায় লইয়া যাইবে? স্বাধীন চিন্তার সহিত নাস্তিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বিজাতীয়

ভাবানুকরণ ও স্বদেশদ্রোহিতার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। এই কারণে আমাদের সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তার ও সংস্কারমুক্ত গবেষণার একটা প্রতি-ক্রিয়াও দেখা যায়। কিন্তু স্বাধীন চিন্তার স্বাস্থ্যকর পরিণতি কি? অক্ষয়কুমারের নির্ম্মল, বিলাস-বিমুখ, আড়ম্বরহীন, সরল ও উদার জীবন, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অক্ষয়কুমার দত্তের সাহিত্য-সাধনার যাহা লক্ষ্য ছিল, তাহা বলা হইল। এই লক্ষ্য রাজা রামমোহন রায়েরও ছিল। রাজা রামমোহন রায় দেশে যে জাগরণ আনিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময় হইতে চারিদিকে যে আন্দোলন, আলোচনা ও শিক্ষাবিস্তার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ফলে অক্ষয়কুমার অনেক সুবিধা পাইয়াছিলেন। রাজা রামমোহনের সময়ে সুপাঠ্য ও সর্ব্বজনীন বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য একেবারে ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল, তাহা উল্লেখযোগ্য নয়। রাজা রামমোহনকে দুর্গম বনপ্রদেশে পথ প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। গদ্য কেমন করিয়া পড়িতে হয়, পাঠকগণকে তাহা শিখাইয়া লইতে হইয়াছিল। কিন্তু অক্ষয়কুমারের এ সমুদয় অসুবিধা ছিল না। দেশের লোকের মানসিক প্রকৃতি, চিন্তা-প্রণালী ও সংস্কার তখন বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় চিন্তা ও সাধনা-রাজ্যে যে যে বিভাগে আঘাত করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার তাহার প্রত্যেক বিভাগে রাজা রামমোহনের সাধনাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন এবং এই মৈত্রী স্থাপনের জন্য সকল ধর্ম্মের ও সকল সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ, আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি শ্রদ্ধার সহিত অথচ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করা একান্তভাবে আবশ্যক। ধর্ম্মের বাহিরের আবরণ লইয়া মানুষ কলহ করিতেছে—ধর্ম্মের যাহা প্রাণ তাহা অন্বেষণ করিবার জন্য কাহারও আগ্রহ নাই।

অক্ষয়কুমারের 'ধর্ম্মনীতি', 'বাহ্যপ্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ও 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' প্রভৃতি গ্রন্থ, রাজার এই সঙ্কল্প-সাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। বর্ত্তমান জগতে আমরা অতিশয় পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছি—বিজ্ঞান অনুশীলনের অভাব ও বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধির অভাব, ইহার প্রধান কারণ। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার সাহস নাই, প্রবৃত্তি নাই, সামর্থ্যও নাই। অন্ধভাবে গতানুগতিকের অনুবর্ত্তন করিতেছি। আমাদিগের দৃষ্টি অতিশয় সঙ্কীর্ণ—বিজ্ঞানের চর্চ্চার দ্বারা স্বাধীন চিন্তায় অভ্যস্ত হইতে হইবে—রাজা রামমোহন রায়ের ইহা সঙ্কল্প ছিল। অক্ষয়কুমার, এই কার্য্য বহুল পরিমাণে সাধন করিয়া গিয়াছেন।

(৫)

রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়ের সহিত বাঙ্গালা দেশে এবং ভারত-বর্ষের জনসাধারণের জাগরণের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের জাগরণ একদিনে অকস্মাৎ সাধিত হইতে পারে না। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের অবস্থা সে সময়ে যেরূপ ছিল, উচ্চ শ্রেণীর সহিত নিম্নশ্রেণীর, পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের প্রভেদ এতই অধিক ছিল যে, জনসাধারণের এই জাগরণের প্রচেষ্টা, ক্রমে ক্রমে কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট স্তরের মধ্য দিয়া সাধিত হইয়াছে। এখনও এই জাগরণ যে পূর্ণাবস্থায় বা সন্তোষজনক অবস্থায় আসিয়াছে, তাহা নহে—এখনও কাজ অনেক বাকী রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেও আমরা এই স্তরগুলি দেখিতে পাই এবং বাঙ্গালা সাহিত্য রচনার রীতিতেও এই স্তরের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিলেন, তখনও ব্রাহ্মসমাজে জনসাধারণের আন্দোলন হয় নাই। ব্রাহ্মণেরা গোপনে বেদপাঠ

করিতেন—জনসাধারণের সেখানে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। বেদপাঠ হইয়া যাওয়ার পর, যখন বাহিরে আসিয়া বক্তৃতা হইত, তখন অবশ্য সকলে তাহাতে যোগ দিতে পারিতেন। এই ব্যবস্থা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ তখনও জন-সাধারণের সহিত সমান ভাবে মিশিতে পারেন নাই। তাঁহারা উপদেষ্টা ও শিক্ষকরূপে নিজেদের উন্নত শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করিতেন এবং জন-সাধারণ তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিবে, ইহাই আশা করিতেন।

শিক্ষাদান কার্য্যের দুই প্রকারের আদর্শ, বর্ত্তমান সময়ে আলোচিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের সিদ্ধান্ত এই যে, শিক্ষককে ছাত্রের নিকট যাইতে হইবে—ছাত্রকে বুঝিতে হইবে, ছাত্রের ভাবের ভাবুক হইতে হইবে এবং ছাত্রের সহিত সম্পূর্ণরূপে বন্ধুর ন্যায় মিশিয়া, তাহাকে সম্মান করিয়া, তাহাকে আনন্দদান পূর্ব্বক, তাহার স্বাধীন অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি জাগাইয়া, তাহাকে উন্নীত করিতে হইবে। এই পদ্ধতি অত্যন্ত আধুনিক। আমাদের দেশে, এই পদ্ধতি এখনও সাধারণতঃ অপরিচিত—অন্ততঃ পক্ষে, এই পদ্ধতিতে আমরা এখনও অভ্যস্ত হই নাই। প্রাচীন কালের পদ্ধতি অন্যরূপ—ছাত্রকে শাসন করিয়া, ভয় দেখাইয়া, শিক্ষকের অনুগত করিতে হইবে; এই আনুগত্যের দ্বারা ছাত্র ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। এই প্রাচীন পদ্ধতি হইতে আধুনিক পদ্ধতিতে একেবারে আসিয়া উপস্থিত হওয়া সম্ভব নহে। কতকগুলি স্তর অতিক্রম করিয়া প্রাচীন পদ্ধতি হইতে নূতন পদ্ধতিতে আসিতে হইবে।

অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা যে সর্ব্ব-সাধারণের সুবোধ্য নহে, এবং তিনি যে ইচ্ছা করিয়াই সংস্কৃত শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া, তাঁহার রচনা মার্জ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, তাঁহার পূর্ব্বের সংস্কৃতবিৎ বাঙ্গালা লেখকেরা ভাষাকে ওজস্বী ও গম্ভীর করিবার

জন্য, যেমন দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য করিতেন এবং ভাবের দৈন্য, সমাসবহুল ও অনুপ্রাস মুখরিত শব্দাড়ম্বরের দ্বারা লুক্কায়িত করিতেন, অক্ষয়কুমারের ভিতর তাহা ছিল না। তিনি শব্দের ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই— ভাবের দ্বারা ও তত্ত্বের দ্বারা দেশবাসীর হৃদয় মনের দৈন্য দূর করিয়া, তাহাদিগকে সত্যরূপে উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু একেবারে জনসাধারণের ভূমিতে নামিয়া আসিতে পারেন নাই।

সাহিত্যের রচনা-রীতি সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের অভিমত, তিনি তাঁহার 'স্বপ্নদর্শন—কীর্ত্তিবিষয়ক' প্রবন্ধে বর্ণন করিয়াছেন। মাঘ, ভারবী, ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের সহিত বাল্মীকির তুলনা করিয়া তিনি বলিতেছেন "বৃদ্ধ বাল্মীকির যেরূপ স্বাভাবিক সরল ভাব ও অকৃত্রিম অনুপম শোভা, তাঁহাদের কাহারও সেরূপ নহে। তাঁহাদের উত্তম শোভা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকেরই শরীরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বস্ত্রালঙ্কারের শোভা অধিক। কেহ কেহ আপন আপন পরিচ্ছদ, এ প্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন যে, বহু যত্নে ও অনেক কষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া না দেখিলে, তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, তাহাও দৃষ্টিগোচর হয় না।"

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে Hindu Patriot কাগজে, অক্ষয়কুমার দত্তের 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থের যে ইংরাজী সমালোচনা বাহির হয় তাহাতে বলা হইয়াছে— This, like other works of the author, is one of the best specimens of chaste Bengali writing, devoid of Sanskriticism for the sake of pedantry." অর্থাৎ, কেবল পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ নাই—ইহাই মার্জ্জিত বাঙ্গালা রচনার সর্ব্বোত্তম নিদর্শন।

অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাবলী মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক। ছাত্রদিগের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনায় তিনি যে পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, জনসাধারণের জন্য লিখিত গ্রন্থে সে পরিমাণ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন নাই। 'চারুপাঠের' রচনার সহিত 'ধর্ম্ম-নীতি'র তুলনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। অবশ্য তিনি সর্ব্বসাধারণের সুবোধ্য করিবার জন্য গ্রন্থ রচনা করিলেও, সংস্কৃত শব্দের প্রতি যে তাঁহার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকারের রীতির বিরুদ্ধে, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার মহাশয়ের কর্তৃক প্রচারিত "মাসিক পত্রিকা" নামক পত্রিকায় অপেক্ষাকৃত সরল, প্রাঞ্জল ও কথ্যশব্দবহুল ভাষার উদ্ভব হয়। টেক চাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থ যে এই ভাষার স্বাভাবিক বিদ্রোহরূপে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা নহে—একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থ প্রচারিত হয়।

যাহা হউক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে কারণে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বাহির হইয়া আসেন এবং ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার মধ্যে ভবিষ্যতের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হয়, ঠিক্ সেইরূপ অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনারীতির অপর দিকে এই কথ্য ও সরল বাঙ্গালার উদ্ভবের মধ্যে ভবিষ্যতের বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির ভাবী বীজ রোপিত হয়।

(৬)

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু গভীর ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। এক শ্রেণীর ভাগ্যহীন লেখক দুর্ব্বোধ্য শব্দ-প্রয়োগের দ্বারা গদ্য-সাহিত্যকে দুর্গম কণ্টকারণ্যে পরিণত করিয়াছেন,

ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অক্ষয় কুমার দত্ত সে শ্রেণীর লেখক নহেন। প্রকৃত সাহিত্যিক বা প্রাণময় প্রজ্ঞা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, অক্ষয়কুমার দত্ত সর্ব্বতোভাবে সেই শ্রেণীর সাহিত্য-রচয়িতা। সুতরাং, তাঁহার বা তাঁহার ন্যায় সুলেখকের রচনায় সংস্কৃত-শব্দের বহুল প্রয়োগ কেনই বা হইয়াছে, এবং তাহার ফলে আমরাই বা কি পাইয়াছি, তাহার বিচার করিতে হইবে।

জনসাধারণের মধ্যে সচ্চিন্তা উদ্রিক্ত করিয়া, বর্ত্তমান জগতের যাবতীয় উন্নততর বিষয়ের সহিত দেশবাসিগণকে পরিচিত করিয়া, তাহাদের মনোবৃত্তির ও হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন যাহাতে উত্তমরূপে সাধিত হয়, তাহারই জন্য অক্ষয়কুমার সাহিত্যের সাধনা করিয়াছিলেন। কোনও রাজসভায় বসিয়া, পৃষ্ঠপোষক সৌখীন ব্যক্তিগণের সাময়িক আনন্দ বিধানের জন্য তিনি সাহিত্য রচনা করেন নাই। অক্ষয়কুমারের সাহিত্য, সর্ব্বতোভাবেই জনসাধারণের সাহিত্য। জনসাধারণের সাহিত্যে, কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ কেন, এরূপ প্রশ্ন, বর্ত্তমান সময়ে কাহারও কাহারও মনে জাগিতে পারে। কাজেই ইহার উত্তর আবশ্যক।

অক্ষয়কুমার এবং তাঁহার যুগের যাবতীয় সুলেখকগণের হৃদয়ে অতীত ভারতের প্রতি একটি অতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যজাতির প্রতিভা, মনীষা ও মহত্ত্ব তাঁহাদিগকে অতিমাত্রায় বিমুগ্ধ করিয়াছিল এবং তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন যে, আমাদিগকে যদি আবার মানুষ হইতে হয়, আমাদের হৃত গৌরবের যদি উদ্ধার সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অতীতের সহিত অতি উত্তম রূপে পরিচিত হইতে হইবে। সেই অতীতের রসে হৃদয়ক্ষেত্র সরস করিয়া, সেই অতীতের আলোকে পথ আলোকিত করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

কিন্তু সেই অতীতকে আয়ত্ত করিবার উপায় কি? সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত উত্তমরূপে পরিচয়ই ইহার প্রথম ও প্রধান উপায়। আমরা বাঙ্গালী

—ইংরাজরাজের শাসনে দেশের নূতন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সকলেই বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুক—সৎ-সাহিত্য রচিত হউক, সৎ-সাহিত্যের আলোচনা দ্বারায় দেশের নরনারী ধনীদরিদ্র সকলেরই হৃদয় ও মন মার্জ্জিত হউক। কিন্তু এই শিক্ষা যথার্থ রূপে সফল করিতে হইলে, শিক্ষিত জনসাধারণকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্যে অতীত ভারতের সহিত প্রাণময় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন, আমাদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যের পিতা বা পিতামহ যে সংস্কৃত সাহিত্য—তাহার সহিত যদি কোনরূপ পরিচিত না করে, তাহা হইলে এই বাঙ্গালা শিক্ষা নিষ্ফল হইবে—ইহাই তখনকার ধারণা ছিল। অক্ষয়কুমার নিজেও, প্রথম জীবনে উত্তম রূপে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণেই সে যুগের লেখকেরা চেষ্টা করিয়া সংস্কৃত শব্দের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌষ্ঠব সাধন করিতেন। এই সমুদয় বাঙ্গালা গ্রন্থ যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ, ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হইয়া অল্প পরিশ্রমে সংস্কৃত সাহিত্য আয়ত্ত করিতে পারিবেন। অথচ পৃথক্ রূপে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা না করিলেও, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সাধারণ জ্ঞান হইয়া যাইবে। ইহাই সে সময়ে সাহিত্য চর্চ্চার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এবং অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি লেখকেরা অনেক স্থলেই, এই উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থ রচনা করিতেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কেবল মাত্র পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য নির্ব্বিবাদে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার দূষণীয়। কিন্তু অক্ষয়কুমারের রচনায় এবং তৎপরবর্ত্তী এই শ্রেণীর অনেক সুলেখকের রচনায় এই দোষ নাই।

সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের আরও কারণ রহিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য যে পৃথিবীর একটি উন্নততম সাহিত্য, ইহা সকলেই জানেন। সুতরাং,

আমাদের চিন্তারাজ্য ও ভাব-ক্ষেত্র যখন প্রসারিত হইল, যখন নূতন নূতন চিন্তা ভাষায় পরিব্যক্ত করিবার প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার নিতান্তই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইল। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা, সাধ্যমত সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শব্দ প্রয়োগের এই প্রয়োজন দুইটি চিন্তা করিয়া, দেখিবেন। একেবারে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার না করিয়া প্রত্যেক অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক বুঝিতে পারে—এই প্রকারের শব্দের সাহায্যে যদি সাহিত্য রচনা করা যায়, তাহা হইলে আমাদের চিন্তা, ভাব ও কল্পনা অতি অল্পদূরে মাত্র প্রসারিত হইবে। তখন নূতন নূতন শব্দ গঠনের আবশ্যকতা স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইবে।

নূতন শব্দ কি একেবারে গঠন করিবেন? যে সমুদয় অসভ্য বন্য জাতিগণের কোনরূপ উজ্জ্বল সুসভ্য গৌরবময় অতীত নাই এবং সেই অতীতের প্রকাশক সুপুষ্ট ও সমুন্নত সাহিত্য নাই, তাহারা হয় কোন বৈদেশিক সাহিত্য হইতে, এই সমুদয় শব্দ সঞ্চয় বা আহরণ করিবে, নতুবা কৃত্রিম উপায়ে শব্দ নির্দ্ধারণ করিবে। কিন্তু আমরা যদি সে পথ অবলম্বন করি, তাহা হইলে আমাদের অতীতের উত্তরাধিকারীত্ব ও আত্মপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হইতে বঞ্চিত হইব।

(৭)

অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কথা—ব্যক্তিত্বের ও স্বাধীন চিন্তার পূর্ণ বিকাশ (Strong Individuality)। আমাদের ভারতবর্ষে এই জিনিষটিরই অভাব হইয়াছিল এবং আমাদের যাবতীয় দুর্গতির মূলে এই ব্যক্তিত্বের অভাব, হেতুরূপে বিদ্যমান। আমি ঐশীশক্তির অংশ, অতএব আমাকে আমার স্বাধীন চিন্তায় আমার নিজের পথে ফুটিয়া উঠিতে হইবে—অন্ধ ভাবে গতানুগতিকের অনুবর্ত্তন করিলে, আমার জীবন সফল হইবে না

—এই বোধ আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। প্রচলিত ধর্ম্ম ও সামাজিক অবস্থা, এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিকূল ছিল। প্রতীচ্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের সর্ব্বপ্রধান উপকার এই হইয়াছে যে, ব্যক্তিগত জীবনকে, তাহার বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া স্বাধীন ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার আবশ্যকতা আমরা বুঝিয়াছি। রাজা রামমোহন রায়, এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভূমিতে দাঁড়াইয়া স্বাধীন চিন্তার পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন, এই বৈশিষ্ট্য স্ফুরণের প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল।

দশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় প্রাকৃতিক ভূগোলের বঙ্গানুবাদ পড়িয়া তিনি বুঝিলেন যে, প্রকৃত জ্ঞান-রাজ্যে উন্নত হইতে হইলে, আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির অনুবর্ত্তন করিলে চলিবে না। ইহাতে তাঁহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন —'ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্'; অক্ষয়কুমার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন— 'সর্ব্বশক্তিমান্ ন'ন—বিচিত্র শক্তিমান্।' ইহা অবশ্য পরিণত বয়সের কথা। কিন্তু এই কথায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও নিজের প্রকৃত বোধের উপর নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া বহু কালের প্রচলিত মত ও বহু জনের আদর পূর্ব্বক স্বীকৃত মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার অতি বিপুল শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার অনাবশ্যকতা প্রচার করিয়াছিলেন—সে সময়ে ইহাও বড় কম কথা নহে।

অক্ষয়কুমারের জীবনের দ্বিতীয় কথা—তিনি 'ব্রতধারী' ছিলেন। নিজে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া, নিজের দেশের ভাষার সাহায্যে, দেশবাসী জন-সাধারণকে সেই জ্ঞান বিতরণ করিব—ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। সাংসারিক উন্নতির নানারূপ সুযোগ তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিল—ইচ্ছা করিলে তিনি সে যুগে ব্যবসায় করিয়া, বিপুল ধনার্জ্জন করিতে পারিতেন, চাকুরী করিয়া বহু টাকা বেতন পাইতে পারিতেন। কিন্তু জীবনে যাহা ব্রত বলিয়া গ্রহণ

করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিছুতেই বিচলিত হন নাই। তিনি কত পরিশ্রম করিয়াছেন ও কত গ্রন্থ পড়িয়া কত দুরূহ নূতন নূতন বিষয় আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে ধারণাতীত। এই উৎকট পরিশ্রমে তিনি দেহপাত করিয়াছেন। এই প্রকারে পরিস্ফুট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্রতধারী লোক, এই ভারতবর্ষের জন্য একান্ত ভাবে আবশ্যক।

অক্ষয়কুমারের রচনা-রীতির আলোচনায় প্রথমতঃ মনে রাখা উচিত যে, তাঁহার রচনা-রীতির উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ প্রভাব ছিল। তাঁহার প্রথম সময়ের অনেক রচনা, বিদ্যাসাগর মহাশয় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। যে সাহিত্যিক বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তিনি তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেখানে সে সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল প্রভাব না থাকিয়াই পারে না। সেই সময়ে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাভারতের অনুবাদ করিতেছিলেন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ করিতেছিলেন। অক্ষয়কুমার যদিও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন, কিন্তু প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের জন্য একটি স্বতন্ত্র সমিতি ছিল। সুতরাং তত্ত্ববোধিনী-সভা, কিরূপ ভাষায় প্রবন্ধাদি রচনা করিবেন, সে বিষয়ে 'তত্ত্ববোধিনীর' লেখকগণের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। ঐ সমিতির ভিতর সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহাদের মত যে সমাদরের সহিত গৃহীত হইত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

সাধনার প্রথম যুগে অবশ্য এই প্রকারের বন্ধন, সকল ক্ষেত্রে না হউক, অনেক ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণপ্রদ। এই প্রকারের বন্ধন সত্ত্বেও, অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত-রীতির অনেক পরিবর্জ্জন করিয়া, বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহার নিজের প্রকৃতির অনুবর্ত্তী করিয়াছেন। ধনী, মানী জ্ঞানী প্রভৃতি সংস্কৃত ইন্‌ভাগান্ত শব্দগুলি, বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্বে কর্ত্তৃকারকের এক বচনে ঈকারান্ত হইত, অন্যান্য স্থলে ই-কারান্ত হইত। অক্ষয়কুমার

সেই প্রয়োগ রহিত করিয়া, সকল বিভক্তিতে ও সকল বচনে ঈ-কারান্ত করিয়া লিখিতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষার সম্বোধন পদে— মুনে, দেবি প্রভৃতি লিখিবার রীতি ছিল। এই রীতিও অক্ষয়কুমার কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত হয়। বাঙ্গালা ভাষার যে একটি নিজের জীবন ও নিজস্ব প্রকৃতি আছে, বাঙ্গালা ভাষা যে একটি জীবিত ভাষা—এ কথা অক্ষয়কুমার বুঝিয়াছিলেন এবং ইহা বুঝাইবার জন্য সে সময়ে অনেক সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতের সহিত তাঁহাকে বাদানুবাদও করিতে হইয়াছিল। মোট কথা, গতানুগতিকতা বর্জ্জন করিয়া বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি লইয়া, সামাজিক পরিবর্ত্তন ও অভিব্যক্তির নিয়মের তিনি অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মানব মাত্রেরই উচ্চতম অধিকার তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—সংস্কার বর্জ্জন করিয়া, স্বাধীন চিন্তার পথে নিজের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করিয়া, তিনি দেশবাসীকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ও সাহিত্য-সাধনার ইহাই প্রথম ও প্রধান কথা।

(৮)

আজ সাঁইত্রিশ বৎসর হইল, অক্ষয়কুমার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং অক্ষয়কুমারের প্রতিভারশ্মি 'তত্ত্ব-বোধিনীর' সাহায্যে বঙ্গীয় সমাজের উপর ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে, তাহার পর আশী বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই আশী বৎসর বাঙ্গালী জাতি নানা বিষয়ে চিন্তা ও চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতির হৃদয় ও মনে প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যও সকল বিষয়ে বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

আজ বর্ত্তমানের ভূমিতে দাঁড়াইয়া, যদি অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে যে মূর্ত্তি

দান করিয়া গিয়াছেন, সেই মূর্ত্তি জয়যুক্ত হইয়াছে। অবশ্য এই মূর্ত্তি গঠনের কৃতিত্ব অক্ষয়কুমারের সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মিগণও ইহার অংশভাগী। কিন্তু অক্ষয়কুমারের ভাব ও চিন্তা, আমাদের দেশে অমরতা লাভ করিলেও বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। এই শেষোক্ত কথাটি বুঝিতে হইলে, নব্যবঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ভাবের দিক হইতে আলোচনা করিতে হইবে।

অক্ষয়কুমার প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক। আজ ইংরাজ জাতি, জার্ম্মাণ জাতি, ফরাসী ও মার্কিণ জাতি, বৈজ্ঞানিকতায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকতার প্রতিষ্ঠা একদিনে হয় নাই। বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধির অনুশীলনে, ইংরাজ জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মনীষী বেকন হইতে জনষ্টুয়ার্টমিল্ পর্য্যন্ত মনীষিগণ কি কঠোর তপস্যা এবং কি ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বেকনের সময়ে ভদ্রলোকেরা নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সূক্ষ্ম ও উন্নত বিষয়ের আলোচনাকে ভদ্রলোকের উপযুক্ত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আরিষ্টটল প্রভৃতি প্রাচীন যুগের বড় বড় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করা সমাজে সম্মান-জনক কার্য্য ছিল। এই মানুষকে প্রত্যক্ষ স্থূল ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করাইয়া অধ্যবসায় সহকারে সেই সমুদায় বিষয়ের শ্রেণী-বিভাগ করিবার সহিষ্ণুতায় দীক্ষিত করিতে, বেকনকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

আজ ইংরাজ যে গৌরবান্বিত, তাহার কারণ এই বৈজ্ঞানিকতা। অক্ষয়কুমার আমাদের দেশে এই বৈজ্ঞানিকতার প্রতিষ্ঠার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন এবং সেই কঠোর তপস্যায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকের যাবতীয় লক্ষণ অক্ষয়কুমারের চরিত্রে পরিদৃষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধি ছাড়া, মানবের আর একটি বৃত্তি আছে—তাহার নাম কবিত্ববৃত্তি বা

ভাবুকতা। এই দুইটি বৃত্তির মধ্যে দ্বন্দ্বও দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী ভাষায় এই দুইটিকে যথাক্রমে Reason and Imagination বলা যায়। কোনও মানবের প্রকৃতিতে এই দুইটি বৃত্তি যদি সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা আদর্শ মানব বলিতে বাধ্য। কিন্তু এই প্রকারের পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্য বড়ই বিরল। অক্ষয় কুমারের প্রকৃতিতে এই উভয় প্রকারের উপাদানই যে বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে অতি অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই সামঞ্জস্য ছিল কি না, সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না এবং বলিবার সময়ও হয় নাই।

পরবর্ত্তী সময়ে আমাদের দেশে, আর এক প্রকারের চিন্তাপদ্ধতি জাগিয়া উঠিল। তখন সমালোচকেরা অক্ষয়কুমারের মতের নানারূপ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন—অক্ষয়কুমার অনেক বিষয়ে উকীলের মত কার্য্য করিয়াছেন, ইংরাজী সাহিত্যে মেকলে জন্‌সনের যে সমুদয় দোষ দেখাইয়াছেন, কোন কোন সমালোচক তাহারই অনুবর্ত্তনে দেখাইয়া দিলেন যে অক্ষয়কুমারেরও এই সমুদয় দোষ ছিল। অক্ষয়কুমার বলিয়াছিলেন—হিন্দুর স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্র অসার এবং দার্শনিকগণ কেবল বিতণ্ডা করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার পঞ্জিকা দেখিয়া দিনক্ষণ নিরূপণ করিয়া যাত্রা করাকে কুসংস্কার বলিয়া বিবেচনা করিতেন—বহু দেবদেবীর অস্তিত্বে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না—ফলিত জ্যোতিষেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। অক্ষয়কুমার তাঁহার এই সমুদয় মনোভাব গোপন রাখেন নাই। তিনি চিন্তা করিয়া যাহা বুঝিয়াছিলেন, নির্ভীক ভাবে অকপটে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। এই প্রকারের নির্ভীকতা, অনুসন্ধিৎসা ও অন্ধভাবে প্রচলিত মতকে মান্য না করা, বৈজ্ঞানিকের বিশেষ লক্ষণ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকতার যুগ আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল না। নানা কারণে

আমরা দেশকে হঠাৎ ভালবাসিয়া ফেলিলাম। এই ভালবাসা সকল সময়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হয় নাই এবং ভালবাসা বা প্রেম সাধারণতঃ চক্ষুষ্মান্ নহে। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ আমাদের ইতিহাসে অযথা কলঙ্ক লেপন করিয়াছে—আর গুপ্ত মহাশয় সেই কলঙ্ক মুক্ত করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। অবশ্য যে কলঙ্ক অযথা, তাহার ক্ষালন করা উচিত। কিন্তু আমার দেশের শাস্ত্র, ধর্ম্ম বা ইতিহাসের বিরুদ্ধে যখন কিছু বলা হইয়াছে, তখন বুঝি বা না বুঝি তাহার প্রতিবাদ করিব—এই প্রকারের প্রবৃত্তি যদি কোনও লেখকের ভিতর জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য যে তিনি বৈজ্ঞানিকের ভূমি হইতে স্খলিত হইয়া ভাবুকতার পিচ্ছিলপথে নিপতিত হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ও ভাবুক—এই উভয়ের মধ্যে যেটুকু প্রভেদ তাহা মনে রাখা আবশ্যক।

প্রেম আমাদিগকে অনেক সময়েই অন্ধ করে এবং প্রেমিক হইতে গিয়া আমরা অনেক সময়ে সত্যভ্রষ্ট হই। স্বদেশপ্রেম অতীব প্রশংসার বিষয়। কিন্তু আজকাল অনেক মহাপুরুষের নিকট আমরা শুনিতেছি—স্বদেশ অপেক্ষা সত্য বড়। কিন্তু আমাদের দেশে সাহিত্যের ইতিহাস ভারতের দিক্ হইতে আলোচনা করিলে একটি স্তর দেখিতে পাওয়া যাইবে, যেস্তরে একটি কৃত্রিম বা সাময়িক উচ্ছ্বাসময় স্বদেশপ্রেম, আমাদিগকে সত্যান্বেষণে সুদৃঢ়, সবল ও অধ্যবসায়শীল হইতে বাধা দিয়াছে। এখনও আমরা প্রায়ই শুনিতে পাইতেছি যে, আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। এই প্রতিক্রিয়াই তাহার কারণ। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান—এই উভয়ের দ্বন্দ্বের অনেক ইতিহাস বাহির হইয়াছে। সেই সমুদয় পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব—বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু—এই সুপরিচিত নীতিসূত্র অবলম্বন করিয়া যাহারা প্রচলিত ধর্ম্মমত নির্ব্বিকারে প্রাণপণ শক্তিতে ধরিয়া রহিয়াছেন, যাঁহারা যাবতীয়

পরিবর্ত্তন ও অগ্রবর্ত্তিতাকে ভয়ের চক্ষে দেখেন, তাঁহাদের প্রাধান্য বৈজ্ঞানিকতা প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। অক্ষয়কুমার দত্তের সাধনা, এই এক বিঘ্নের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এই বিঘ্ন কতদিনে দূরীভূত হইবে, তাহা বলা যায় না।

পূর্ব্বে কিছু সূক্ষ্মভাবে আমরা যে প্রতিক্রিয়ার কথা বলিলাম, একটি স্থূল উদাহরণ দ্বারা তাহা বর্ণন করিতেছি। অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থরচনার দ্বারায় দেশে সুশিক্ষা বিস্তারের একটি বিশেষ সুবিধা ছিল, তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। তিনি স্কুল কলেজে বড় বড় অধ্যাপকের অধীনে বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র বিশেষরূপে পাঠ করেন নাই। অল্পদিন মাত্র মেডিকেল কলেজে বিশেষ ছাত্ররূপে উপস্থিত হইয়া কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। নিজের চেষ্টায় এবং কিছু বেশী রকম পরিশ্রম করিয়া, এই বিষয় তাঁহাকে শিখিতে হইয়াছিল। কাযেই, আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনোবৃত্তি ও চিন্তা-পদ্ধতি যেরূপ, তাহাতে তাহারা কি প্রকারে বৈজ্ঞানিক বিষয় সমূহ বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া বুঝিতে পারে, নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা অক্ষয়কুমার তাহা অতি উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞানের আলোচনায় যশোলাভ করিয়া যদি তিনি বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থগুলি আমাদের দেশের পাঠকগণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হইত কি না বিশেষ সন্দেহ।

বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যে সমুদয় বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ গ্রন্থেই অক্ষয়কুমারের ভাষা ও বর্ণনা প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা কোন কোনও গ্রন্থে একটি বিশেষ দোষ বা ত্রুটী লক্ষ্য করিয়াছি। অক্ষয়কুমারের রচনার সহিত তুলনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহার রচনায় এই দোষের লেশমাত্র নাই। বিজ্ঞানের কথা বলিতে গিয়া তাহা মনোরম করিবার জন্য আমরা এমন উৎকট কাব্য সৃষ্টি করিয়া বসি যে, সেই কাব্যের বৃাহ ভেদ করিয়া প্রকৃত বিষয়ে উপস্থিত

হইতে, পাঠককে বিশেষরূপ বেগ পাইতে হয় এবং অনেক সময়ে অসম্ভব হইয়া পড়ে। পাঠকের চিত্তবৃত্তির সহিত লেখকের পরিচয় না থাকাতেই, এই প্রকারের অযথা কাব্য-সৃষ্টি দ্বারা বৈজ্ঞানিক-রচনা অনেক সময়েই নিষ্ফল হইয়া যায়। অক্ষয়কুমারের রচনা এ বিষয়ে এখনও অন্ততঃপক্ষে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আদর্শ-রচনা। কিন্তু অক্ষয়কুমারের 'পদার্থবিদ্যা' অনেক দিন পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত ছিল না। তাহার পর যে গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক রূপে প্রচলিত হয়, সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে ১২৮৭ সালের আষাঢ় মাসের বঙ্গদর্শনে "বঙ্গ বৈজ্ঞানিক" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছিল যে, এই নূতন গ্রন্থের গ্রন্থকার, অক্ষয়কুমারের গ্রন্থখানি উত্তমরূপে পড়িলে অনেক শ্রম হইতে রক্ষা পাইতেন। অথচ, এই দ্বিতীয় পুস্তকখানি পাঠ্য পুস্তক হইয়া গেল! প্রতিক্রিয়ার ইহা একটি স্থূল উদাহরণ।

(৯)

অক্ষয়কুমার দত্ত বঙ্গীয় সাহিত্যের ও সমাজের যে স্তরের প্রতিনিধি, আমরা বহুদিন সেই স্তর অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। সেই স্তরের প্রভাব ও সাফল্য বহুল পরিমাণে লইয়া আসিয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে আমরা সে যুগ বা সে স্তর হইতে সকল বিষয়েই অনাবিল উন্নতি লাভ করিয়াছি, ইহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যে যে যুগ চলিতেছে, আসন্ন ভবিষ্যতে তাহার একটি প্রতিক্রিয়া হইবার সম্ভাবনা এবং সেই প্রতিক্রিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিবে যে, অক্ষয়কুমারের যুগে অনেক স্বাস্থ্যকর ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমরা অবহেলা করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছি।

কেবল একটী বিষয়ের দ্বারা এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করা যায়। মানবের জীবনে এবং সাহিত্যে একটা অস্পষ্টতার যুগ আছে। সেই যুগে মানুষ

বিচার পূর্ব্বক কোনও বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট বা সুনির্দ্ধারিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে না। প্রত্যেক বিষয় ও ব্যাপার, নানা প্রকারে নানা দিক্ হইতে আলোচনা করিতে পারা যায় এবং প্রতিকূলে ও অনুকূলে নানা প্রকারের কথা বলিতে পারা যায়। এই প্রকারের প্রত্যেক ব্যাপার সম্বন্ধে যত প্রকারের চিন্তা ও সিদ্ধান্ত সম্ভব, কোনও লোক যদি বসিয়া বসিয়া, তাহাই আবিষ্কার করিতে থাকে, তাহা হইলে আমরা সেই লোকের পাণ্ডিত্যের ও বহুজ্ঞতার প্রশংসা না করিয়া পারি না সত্য, কিন্তু সেই প্রকারের লোক লইয়া বাস্তব জগতের প্রয়োজন সাধন, অনেক সময়েই অসম্ভব ও কষ্টকর হইয়া পড়ে।

মানুষ মাত্রেই সামাজিক জীব। সাহিত্য ও সামাজিক প্রয়োজনকে, সে উপেক্ষা করিতে পারে না। অনেক সময়ে সমাজে এমন অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন অস্পষ্টতা অনিষ্টকর। তখন সকল বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত একান্তভাবে আবশ্যক। অক্ষয়কুমারের যুগ তাঁহার রচনাবলীর সাহায্যে এবং সেই সময়কার অন্যান্য সহিত্যিকের সাহয্যে আলোচনা করিলে মনে হয়, উহা সকল বিষয়েই একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের যুগ। এই সিদ্ধান্ত সমূহ অভ্রান্ত কিনা, তাহার আমরা আলোচনা করিতেছি না; এক যুগের যাবতীয় সিদ্ধান্ত অপর যুগে অভ্রান্ত বলিয়া কখনও গৃহীত হয় না। কিন্তু সামাজিক জীবনের এমন দিন আসে, যখন যাহা হউক একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্ম্ম আবশ্যক হইয়া পড়ে। সর্ব্ববিধ অস্পষ্টতা বিবর্জ্জিত বীরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের যুগকে, ইংরাজীতে Positivistic Age বলে—বৈজ্ঞানিকতার প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই যুগ সম্ভব হয়।

অক্ষয়কুমারের পর, বাঙ্গালা দেশে সাহিত্যে এবং জীবনে যে যুগ আসিল, সেই যুগকে আমরা দার্শনিকের সংশয়পূর্ণ অস্পষ্টতা ও কাল্পনিকতার যুগ (The Age of Metaphysical Doubts and Fancies) বলিলে

প্রমাণের অভাব হইবে না। ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ (Comte) মানবের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তিনটি স্তর বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম যুগ—অলৌকিকের দোহাই দিবার যুগ (The Theological Stage); দ্বিতীয় যুগের নাম—দার্শনিকের বাগ্বিতণ্ডার যুগ (The Metaphysical Stage), আর তৃতীয় যুগের নাম—ধ্রুবদর্শন ও সুস্পষ্ট নির্দ্ধারণের যুগ (The Positivistic Stage)। রাজা রামমোহন রায়ের সাধনায় আমরা আমাদের জীবনে, সমাজে ও সাহিত্যে এই তৃতীয় যুগের ঊষালোক দেখিতে পাই। অক্ষয়কুমারের সময়ে, এই ঊষার আলোক আরও উজ্জ্বল ও বিস্তৃত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল, সেই প্রতিক্রিয়ার ফলে, এই আলোক যে নির্ব্বাপিত হইল তাহা নহে, তবে অনেক স্থলেই অসময়ের কৃষ্ণ-মেঘ উদিত হইয়া, ঐ আলোকের স্বাস্থ্যকর ক্রিয়ার বিঘ্ন উৎপাদন করিল। বাঙ্গালার নবযুগের সাহিত্যের আলোচনায় এই একটি সিদ্ধান্ত নির্ভয়ে করা যাইতে পারে।

আমাদের বিশ্বাস, যদি কখনও বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বৈজ্ঞানিকের সত্যের আলোক ব্যক্তির জীবনে, এমন কি, ধর্ম্ম, কাব্য ও কবিতায় যদি কখনও জয়যুক্ত হয়, তাহা হইলে অক্ষয়কুমারকে আমরা আরও ভালরূপে বুঝিতে পারিব। তাঁহার অবশ্য মৌলিক দান কিছুই নাই। তিনি বিজ্ঞানরাজ্যের কোন নব-সত্যের উদ্ভাবক বা আবিষ্কর্ত্তা নহেন। কিন্তু, আজ আমাদের বাঙ্গালা দেশের যে সমুদয় বৈজ্ঞানিকের যশঃপ্রভা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তারিত হইয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিতেছে, সেই সমুদয় বৈজ্ঞানিকগণের উদ্ভব যে সম্ভব হইয়াছে তাহার মূলে অক্ষয়কুমারের সাধনা সুস্পষ্ট রূপে দেদীপ্যমান। অক্ষয়কুমারকে খর্ব্ব করিবার জন্য যাঁহারা দেখাইয়াছেন—তিনি দেবতা মানিতেন না, হাঁচি টিকৃটিকি দিক্‌শূল মানিতেন না, স্মৃতিশাস্ত্রের নিন্দা করিতেন, তাঁহারা, যে

সমুদয় বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালী বর্ত্তমান সময়ে জাতির মুখোজ্জ্বল করিতেছেন, এই সব বিষয়ে তাঁহাদের কি মত, তাহা কি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন? তাঁহারাও যদি অক্ষয়কুমারের মতাবলম্বী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের কথা শুনিতে কি অস্বীকৃত হইবেন? বিজ্ঞানালোচনার দিক্ হইতে এই কথাটি বলা অত্যন্ত আবশ্যক। যিনি বৈজ্ঞানিক নহেন,—ভাবুক ও ভক্ত—তাঁহার রাজ্য স্বতন্ত্র; তিনি অবশ্য শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হইতে হইলে, অক্ষয়কুমারের ন্যায় স্বাধীনচিত্ততা ও স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার সাহসিকতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

শ্রীশিবরতন মিত্র

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনী

বংশ-পরিচয়—পূর্ব্ব-কথা, জন্ম

বঙ্গজ কায়স্থ কুলোদ্ভব দুর্গাদাস দত্ত, দত্ত-বংশের পূর্ব্বতন পুরুষ। দুর্গাদাসের পুত্র শিবরাম; শিবরামের দুই পুত্র—রাজবল্লভ ও রমাবল্লভ। রাজবল্লভ, বর্দ্ধমানের রাজ-সরকারে কর্ম্ম করিতেন। ইনিই টাকীর নিকটবর্ত্তী গন্ধর্ব্বপুর গ্রামের পৈত্রিক বাস পরিত্যাগ করিয়া, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত, নবদ্বীপের দুই ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী চুপী গ্রামে বাসস্থাপন করেন। রাজবল্লভের চারি পুত্র—তন্মধ্যে রামশরণ কনিষ্ঠ। রামশরণ আশৈশব নিরামিষভোজী ছিলেন। রামশরণের চতুর্থ পুত্র পীতাম্বর, অল্প বেতনে খিদিরপুর টালির নালা বা আদি-গঙ্গার কুত-ঘাটের খাজাঞ্চী ও দারোগার কার্য্য করিতেন। ইনি, কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী ইট্‌নে গ্রামের রামদুলাল গুহের কন্যা দয়াময়ীর পাণিগ্রহণ করেন। এই দম্পতীর একমাত্র সন্তান অক্ষয়কুমার, ১২২৭ সাল ১লা শ্রাবণ (ইং ১৮২০ খ্রীঃ) চুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশব—শিক্ষা—বিবাহ

অক্ষয়কুমার যখন মাত্র চারি বৎসরের শিশু, তখন হইতেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। পাঁচ বৎসর বয়সে যথারীতি বিদ্যারম্ভ করিয়া এক গৃহ-শিক্ষকের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে বাল্য-শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বাল্যকাল হইতেই অক্ষয়কুমারের অনুসন্ধান-প্রবৃত্তির প্রথম উন্মেষ হয়। কাঠা-কালি কষিবার সময়, এই পৃথিবীটা কয় বিঘা ও কত বড় জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মিয়াছিল। অক্ষয়কুমার,

জনকজননীর একমাত্র আদরের তুলাল হইলেও, অতি নিরীহ ও শান্ত-স্বভাব ছিলেন।

চারি বৎসর মধ্যেই গৃহ-শিক্ষকের নিকট শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া তিনি কিছুকাল এক মুন্সীর নিকট পার্শী ভাষা শিক্ষা করেন এবং এক টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। তদনন্তর তিনি খিদিরপুরের বাসায় পিতৃব্য-পুত্র হরমোহন দত্তের নিকট আগমন করেন এবং ভবানীপুরে মিশনরীদের স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন। এখানে পড়াশুনার সুবিধা না হওয়ায় তিনি কলিকাতার গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়ান্টাল্ সেমিনরী স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তী হন। এখানে আসিয়া, আপন পিস্তুত ভাই রামধন বসুর বাসায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তুই বৎসর মধ্যেই অক্ষয়কুমার একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। পর বৎসর পিতৃবিয়োগ ঘটায় তিনি স্কুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তিনি বিদ্যানুশীলন পরিত্যাগ না করিয়া স্বাবলম্বনবলে বিজ্ঞান, পদার্থ-বিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, পুরাবৃত্ত, প্রত্নতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় নিয়মিতরূপে আলোচনা করিতে লাগিলেন। শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র সুধী আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীনাথ ঘোষ এবং অমৃতলাল মিত্র মহাশয়গণ নানাবিধ বহুসংখ্যক পুস্তক ব্যবহার করিতে দিয়া এবং অন্যবিধ উপায়েও অক্ষয়কুমারের জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছিলেন। আনন্দকৃষ্ণ বসুর বাটীতেই, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত অক্ষয়কুমারের প্রথম পরিচয় হয়। অক্ষয়কুমার জর্ম্মন্ প্রভৃতি ভাষাও শিক্ষা করেন।

অক্ষয়কুমার, কিছুদিন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ১ম বর্ষে রসায়ন এবং ২য় বর্ষে উদ্ভিদ্-বিদ্যা বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করেন।

অধ্যয়ন অবস্থায় পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের সময় অক্ষয়কুমার আগরপাড়া নিবাসী রামমোহন ঘোষের তুহিতা শ্যামমণিকে বিবাহ করেন।

কর্ম্ম-ক্ষেত্রে

অক্ষয়কুমারের পিতৃব্য-পুত্র হরমোহন দত্ত মহাশয় সুপ্রীমকোর্টে কর্ম্ম করিতেন। এই নিমিত্ত, 'প্রভাকর'-সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার কাগজের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে প্রায়ই হরমোহনের নিকট আগমন করিতেন। এই সুযোগে অক্ষয়কুমার, গুপ্ত-কবির সহিত পরিচিত হন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ই অক্ষয়কুমারকে প্রথমে পদ্য ও তৎপরে গদ্য লেখায় উৎসাহ প্রদান করেন। অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে গুপ্ত-কবি পরবর্ত্তীকালে বলিয়াছিলেন—'অগ্রে যাহাকে শিষ্যপদে অভিষিক্ত করিয়া গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি' ইত্যাদি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১২৪৬ সালে 'তত্ত্ববোধিনী'-সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই সভার সভ্য ছিলেন। গুপ্ত-কবিই অক্ষয়-কুমারকে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। ইহার অল্পদিন পরই অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী'-সভার সভ্য মনোনীত হন। পর বৎসর ১২৪৭ সালে, এই সভার যত্নে 'তত্ত্ববোধিনী'-পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইলে, অক্ষয়কুমার মাত্র আট টাকা বেতনে, এই স্কুলের পদার্থ-বিদ্যা ও ভূগোলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয়কুমারকে মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে স্কুল ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক্ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী'-সভার সহিত সংসৃষ্ট রহিলে, দেশে সুশিক্ষা-বিস্তারের প্রকৃত কার্য্য করিতে পারিবেন বলিয়া, তিনি এই উচ্চপদ গ্রহণ করেন নাই—সামান্য বেতনের শিক্ষকতা করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন।

১২৫০ সালে 'তত্ত্ববোধিনী'-পাঠশালা কলিকাতা হইতে বাঁশবেড়িয়ায় স্থানান্তরিত হইলে, অক্ষয়কুমার পদত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় অবস্থান

করিতে লাগিলেন। এই বৎসর 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়—ইহার দুই বৎসর পর, অক্ষয়কুমার এই পত্রের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। দশ বৎসরকাল কঠোর পরিশ্রমের সহিত 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'র সম্পাদকতা করিলে পর, তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। অর্শ ও উদরাময় রোগে পূর্ব্ব হইতেই কষ্ট পাইতেছিলেন—এখন ১২৬২ সালের আষাঢ় মাস হইতে মূর্চ্ছার সহিত নিদারুণ দুশ্চিকিৎস্য শিরোরোগে আক্রান্ত হইলেন। অগত্যা তাঁহাকে 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'র সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর তিনি কিছুকাল নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু পীড়া বৃদ্ধি হইতে থাকায়, তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইল। এই সময়, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একান্ত যত্ন ও চেষ্টায় 'তত্ত্ববোধিনী'-সভা হইতে অক্ষয়কুমারকে মাসিক বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হয়। তাহার পর হইতে তিনি সাংসারিক দুশ্চিন্তা হইতে কতকটা অব্যাহতিলাভ করেন।

সাহিত্য-সেবা

মাত্র চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের সময় অক্ষয়কুমার 'অনঙ্গমোহন' নামক একখানি কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন। একুশ বৎসর বয়সের সময় তিনি 'ভূগোল' রচনা করেন—এই পুস্তকখানি 'তত্ত্ববোধিনী'-সভার অর্থ-সাহায্যে প্রকাশিত হয়। ১২৪৯ সালে, টাকী-নিবাসী প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয়ের সহযোগিতায় অক্ষয়কুমার 'বিদ্যা-দর্শন' নামক একখানি মাসিক-পত্র প্রকাশিত করেন। মাত্র ছয় সংখ্যা বাহির হইবার পর, এই পত্র লুপ্ত হইয়া যায়। টাকী চৌধুরী বাবুদের বরাহনগরের বাটীতে এই সময় 'নীতি-তরঙ্গিনী' নামক সভায় সময় সময় প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে, অক্ষয়কুমার

প্রথমতঃ —'অ-কু-দ' নামের এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা বা আদ্য-অক্ষর স্বাক্ষর করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন। ১২৫২ সালে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার' সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া দশবর্ষকাল এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া অসামান্ত প্রতিভাবলে, ইউরোপীয় পদার্থ-বিদ্যা, বিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি, মনস্তত্ত্ব এবং ভারতীয় প্রত্ন-তত্ত্ব প্রভৃতি কঠিন ও জটিল বিষয় অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিয়া, 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায়' এই সকল বিষয়ের আলোচনা-মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। দীনা বঙ্গভাষা এইরূপে অক্ষয়কুমারের হস্তে বিবিধ ভূষণে ভূষিতা হইলেন। ১২৫৮ সালে জর্জ্জ কুম্ব্ রচিত Constitution of Man নামক গ্রন্থ অবলম্বনে—'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার'—প্রথম ভাগ এবং পর বৎসর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ, ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র নহে—ইহাতে অক্ষয়কুমারের মৌলিক চিন্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম ভাগে প্রধানতঃ আমিষ ভোজনের এবং দ্বিতীয় ভাগে সুরাপানের বিরুদ্ধে আলোচনা আছে। ১২৫৯ সালে 'চারুপাঠ'—প্রথম ভাগ, ১২৬১ সালে 'চারুপাঠ'—দ্বিতীয় ভাগ, এবং ১২৭১ সালে 'চারুপাঠ'—তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকগুলি প্রথম প্রকাশের সময় হইতে অদ্যাপি সমান আদরে স্কুলপাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে—এতদপেক্ষা এই গ্রন্থের সুখ্যাতির কথা আর কি হইতে পারে? এই গ্রন্থত্রয়ের প্রায় যাবতীয় প্রবন্ধগুলিই ভাবগাম্ভীর্য্য ও প্রাঞ্জলতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছে। ১২৬৩ সালে 'পদার্থ-বিদ্যা' প্রকাশিত হয়—এই গ্রন্থে, প্রাঞ্জল ভাষায় পদার্থ-বিজ্ঞানের মূল-সূত্রগুলি আলোচিত হইয়াছে। অক্ষয়কুমার, এই গ্রন্থ-রচনায় যে সকল পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। ১২৭৭ সালে অক্ষয়কুমারের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগ এবং ১২৮৯

সালে দ্বিতীয় ভাগ রচিত ও প্রকাশিত হয়। এই সুবৃহৎ গ্রন্থদ্বয়ের মূল ও উপক্রমণিকা অংশে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের নানাবিধ জটিল-তথ্যের আলোচনা ও মীমাংসা রহিয়াছে। এই গ্রন্থ রচনা করিয়া অক্ষয়কুমার অক্ষয়-যশঃ লাভ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে অমরতা লাভ করিয়াছেন। অথচ, এই গ্রন্থ (দ্বিতীয় ভাগ) যখন রচিত হয়, তখন অক্ষয়চন্দ্রের শরীর ও মনের কিরূপ দুরবস্থা তাহা—'উপাসক-সম্প্রদায়ের রচনা-কার্য্য'-নামক প্রবন্ধে তাঁহার স্বলিখিত বিবরণ হইতে পরিচয় পাইবেন। বলিতে কি, তাঁহার অদম্য জ্ঞান-লিপ্সা এবং অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়। ১২৮২ সালে 'ধর্ম্ম-নীতি' প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পর, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায়, 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র-যাত্রা ও বাণিজ্য-বিস্তার' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। অক্ষয় কুমারের অধিকাংশ গ্রন্থই প্রথমতঃ 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায়' প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শেষ-জীবন

১২৬২ সালে অক্ষয়কুমার মূর্চ্ছারোগে আক্রান্ত হন; তদবধি কোন গভীর বিষয় অধিকক্ষণ অনন্যমনে চিন্তা করিতে অসমর্থ হন। কিন্তু এমন অবস্থাতেও তিনি উপাসক-সম্প্রদায়-দ্বিতীয় ভাগ রচনা করিয়াছিলেন। দারুণ শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ একত্রিশ বৎসর কাল উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন; এই শিরোরোগের প্রকোপে অক্ষয়কুমারের একটি চক্ষু ছোট হইয়া যায়। শেষাবস্থায় অক্ষয়কুমার, কলিকাতার সন্নিকট বালিগ্রামে, স্বকীয় 'শোভনোদ্যান' নামক উদ্যান-বাটিকায় নির্জ্জনে বাস করিতেন। এই উদ্যান-বাটিকাটি তিনি নিজের মনোমত করিয়া গঠিত ও সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। প্রস্তরীভূত জীব জন্তু,

শঙ্খ শম্বুক, প্রবাল, স্ফটিক, অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি বিবিধ যন্ত্র, বিচিত্র গুল্মলতা প্রভৃতি এই গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিত।

অক্ষয়কুমার আমিষ ভক্ষণ করিতেন না—তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

১২৯৩ সাল ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮৮৬, ২০ শে মে) বৃহস্পতিবার রাত্রি ৩-১৫ সময়, অক্ষয়কুমার ৬৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

অক্ষয়-সুধা

প্রথম খণ্ড

সাহিত্য

অক্ষয়-সুধা

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্য

জন্মভূমি

প্রত্যেক ব্যক্তির গৃহ যেমন তাঁহার স্বকীয় বাসস্থান, সেইরূপ স্বদেশ আমাদের সকলের একত্রীভূত আবাস স্বরূপ। স্ব স্ব পরিবারের কল্যাণ চিন্তা করা যেমন প্রত্যেকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সেইরূপ স্বপরিবার-স্বরূপ স্বদেশীয় লোকের শুভানুসন্ধান করাও প্রত্যেকের পক্ষেই বিধেয়। যেরূপ প্রতিদিন কিঞ্চিৎ সময় ক্ষেপণ করিয়া, গৃহকার্য্য সম্পাদন করা উচিত, সেইরূপ, আমাদের সকলের সাধারণের গৃহ-স্বরূপ ভারতবর্ষের সুখ-বর্দ্ধনার্থ অহরহঃ যত্ন ও পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য।

স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা

জন্মস্থান স্নেহের আস্পদ। যে স্বদেশানুরাগী চির-প্রবাসী ব্যক্তি, ভূস্বর্গ-স্বরূপ স্বদেশের কোন নদী বা সরোবর, প্রাচীর, বৃক্ষ বা প্রসিদ্ধ উৎসব-ভূমি প্রিয় বন্ধুর আবাস বা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম স্বীয় বাটী, প্রণয়-পবিত্র মিত্র-মণ্ডল বা নিজ নিকেতনস্থ মূর্ত্তিমতী প্রীতিস্বরূপ মনোহর

মুখমণ্ডল সকল সহসা স্মরণ করিয়া, তাহাদিগকে নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, তিনিই জানেন, স্বদেশ কিরূপ প্রীতি-ভাজন। স্বদেশীয় বস্তুর কেমন প্রেমময় ভাব! যে দেশ-পর্যটক বহুদিবসের পরে কোন বিদেশীয় পান্থশালা স্থিত কোন অপরিচিত পথিকের প্রমুখাৎ স্বকীয় জন্মভূমির প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক, অবিরল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তিনিই জানেন, জন্মভূমি কি পরম মনোরম প্রীতিকর পদার্থ! "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—এই সুধাময় শ্লোকার্দ্ধ যে মহাত্মা প্রথম উচ্চারণ করিয়াছেন, তিনিই সুখময় স্বদেশের সুরম্য ভাব অবগত ছিলেন। যে সমস্ত স্বদেশানুরাগী বীর পুরুষ দুরন্ত শত্রুর কঠিন হস্ত হইতে জননী-স্বরূপা জন্মভূমির পরিত্রাণ-সাধনের নিমিত্ত অম্লান-বদনে, অকুতোভয়ে উৎসাহিত-হৃদয়ে আপন জীবন সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতেন, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জন্মভূমির সমীপে জীবন কি তুচ্ছ পদার্থ! যে স্থানে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক লালিত ও প্রতিপালিত হইয়া, কৌমার, কৈশোর ও যৌবনকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থান পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, সুহৃদ্, বান্ধব প্রভৃতি প্রিয়জনবর্গের আধার-ভূমি, যে স্থানের নামোচ্চারণ করিবামাত্র প্রেম-সিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠে, ধরাতলে তাহার তুল্য প্রেমাস্পদ আর কি আছে?

জন্মভূমির স্বরূপ

এতাদৃশ স্নেহ-ভাজন জন্মভূমিকে দুঃখভারাক্রান্ত ও বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া, যাহার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ না হয়, সে মানব বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। দুঃখের কঠোর হস্ত হইতে জন্ম-ভূমির পরিত্রাণ-সাধনার্থ যত্নবান্ না হইয়া, যে ব্যক্তি নিশ্চিন্তমনে কালহরণ করিতে পারে, তাহার অন্তঃকরণ যে পাষাণময়, ইহাতে সন্দেহ নাই; তাহার অসার জীবন জীবনই নহে।

স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন

একত্র সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা যেমন মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম, এমন আর কোন জন্তুর নয়। যদিও অন্যান্য প্রাণীরও এরূপ স্বভাব দৃষ্টি করা যায় যে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থান ও একত্র গমনাগমন করিতে ভালবাসে, কিন্তু মনুষ্য যেরূপ সকল বিষয়েই পরস্পর-সাপেক্ষ, অন্য কোন প্রাণী সেরূপ নয়। আমাদিগকে সকল বিষয়েই অন্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের আবশ্যক, তাহাই অন্যের যত্ন-সাধ্য ও অন্যের সাহায্য-সাপেক্ষ। এমন কি, যে দেশে বা যে জনপদে বাস করা যায়, তত্রত্য লোকে যে পরিমাণে কর্ম্মদক্ষ, জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মশীল হয়, সেই পরিমাণে আমাদেরও সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। কৃষকেরা কৃষি-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উত্তমরূপ শস্য, ফল, মূলাদি উৎপাদন করিতে না পারিলে, আমরা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি না। শিল্পকারেরা শিল্প-কার্য্যে সুদক্ষ হইয়া সুখ-সম্ভোগের উপযোগী উত্তমোত্তম সামগ্রী প্রস্তুত করিতে না পারিলে, এবং নাবিক ও বণিক্‌গণ স্ব স্ব ব্যবসায়ে পারদর্শী হইয়া, নানাদেশীয় দ্রব্যজাত আনয়ন করিতে পারগ না হইলে, আমরা সে সমস্ত সম্ভোগ করিতে সমর্থ হই না। স্বদেশে উত্তমোত্তম বিদ্যালয় সংস্থাপিত ও উত্তমোত্তম গ্রন্থ প্রচলিত না থাকিলে, উৎকৃষ্টরূপ বিদ্যাশিক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। স্বদেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকে নানাপ্রকার কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ থাকিলে, তাহাদের সহবাসে থাকিয়া যথার্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করা দুরূহ হইয়া উঠে। যদি কোনও জ্ঞানাপন্ন ধর্ম্মশীল ব্যক্তি অধার্ম্মিক মূর্খ লোকের সহিত নিরন্তর একত্র বাস করেন, তাহা হইলে, কোন ক্রমেই সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারেন না। তিনি আত্মসদৃশ সদ্‌বিদ্যাশালী, ধার্ম্মিক লোকের

মনুষ্য সর্ব্ববিষয়েই পরস্পর-সাপেক্ষ

প্রতিবাসী হইলে, যে প্রকার পরম সুখে কালযাপন করিতে পারেন, অজ্ঞান অধার্ম্মিক লোকে পরিবেষ্টিত থাকিলে, কোন মতেই সেরূপ সুখ-সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন না।

অতএব জনসমাজে অবস্থিতিপূর্ব্বক অপর সাধারণের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে উন্নতিসাধনার্থ চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্য কর্ত্তব্য

ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল নিজের ও নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকা মনুষ্যের কর্ম্ম নয়। প্রতিদিবস আপন নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ কাল যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহাতে স্বদেশের লোকের জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ ও স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পায়, কুরীতি সকল রহিত হইয়া সুরীতি সমুদায় সংস্থাপিত হয়, এবং রাজ-নিয়ম সংশোধিত ও সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তদর্থে সচেষ্ট হওয়া উচিত। স্বীয় পরিবার প্রতিপালনের ন্যায় স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থ যত্ন, পরিশ্রম ও বুদ্ধি পরিচালন করাও যে মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা অনেকেই বিবেচনা করেন না। তাঁহারা ইতর প্রাণীর ন্যায় কেবল লোভ-কামাদি রিপু-সমুদায়কে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই সর্ব্বদা ব্যস্ত। পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বর ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য সমস্ত জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যকে বিশিষ্টরূপ শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন; তাহার মত কি কার্য্য করিতোছি, ইহা সকলেরই এক একবার চিন্তা করা উচিত। ক্রমে ক্রমে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলোন্নতি হয়, ইহাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, এবং ইহাই তাঁহার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। এই পরম মনোহর উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, কার্য্য করা সকলের পক্ষে বিধেয়। আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় চিন্তা করা যেমন আবশ্যক, সময়ে সময়ে একত্র সমাগত হইয়া স্বদেশের দুঃখ বিমোচন ও সুখ-সম্পাদনার্থে যত্ন ও চেষ্টা করাও সেইরূপ আবশ্যক।

সন্তোষ

কেহ কেহ এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষ যে, কিছুতেই তৃপ্ত নহে। তাহাদের যত অর্থলাভ ও যত পদবৃদ্ধি হইতে থাকে, লালসারূপ অগ্নি-শিখা ততই প্রজ্বলিত হইয়া তাহাদিগকে অশেষ-প্রকার উৎপাতে পাতিত করে। তাহারা প্রচুর ধনশালী হইয়াও, সতত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিতচিত্তে দিন-যাপন করে। সন্তোষ যে এরূপ অনর্থক উদ্বেগের মহৌষধ, ইহা তাহারা অবগত নয়। সন্তোষ যেমন সুখজনক, অসন্তোষ তেমনি দুঃখজনক।

মনুষ্যেরা সকল অবস্থাতেই সন্তোষরূপ স্পর্শমণি দ্বারা সুখ-স্বরূপ স্বর্ণলাভে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু অতিশয় অপকৃষ্ট অবস্থাতে অবস্থিত হইলেও যে দুঃখশান্তির চেষ্টা না করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে চিরকাল কষ্ট স্বীকার করিবে, এমন নয়। যে অবস্থায় থাকিলে, অন্নবস্ত্রের ক্লেশবশতঃ শরীর শীর্ণ হয়, অপরিষ্কৃত, অপরিশুষ্ক, সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করাতে শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম হয়, এবং পরিবারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে, সঙ্গতির অভাবে রীতিমত চিকিৎসা করাইতে ও পুত্র-কন্যাদিগকে উত্তমরূপে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে অসমর্থ হইতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া, এই সমস্ত কষ্ট নিবারণার্থ যত্ন না করা, কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়। যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে, নানা-মতে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত নয়। সন্তোষের যথার্থ লক্ষণ এরূপ নহে। আপন আপন উপায় ও ক্ষমতানুসারে ন্যায়ানুগত চেষ্টা দ্বারা যতদূর উৎকৃষ্ট অবস্থা হইতে পারে, তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া, এবং যে সকল অনিষ্ট ঘটনা নিবারণ করিবার শক্তি নাই, তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক স্থিরভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই যথার্থ সন্তোষের লক্ষণ। এরূপ সন্তোষ সুখের আলয়।

তামসিক সন্তোষ অমার্জ্জনীয়

———

আত্ম-প্রসাদ ও আত্ম-গ্লানি

নিষ্পাপ থাকিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, অন্তঃকরণে যে অসঙ্কোচ-সংবলিত অনির্ব্বচনীয় সন্তোষের উদ্রেক হয়, তাহাকেই আত্ম-প্রসাদ বলে।

আত্ম-প্রসাদ ও ইহার প্রভাব

আত্ম-প্রসাদ অমূল্য ধন; যিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে কহিতে পারেন, আমি নিরপরাধ নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া, পরমেশ্বরের নিয়ম-সমুদায় প্রতিপালন করিতেছি, যথাসাধ্য পরোপকার-ব্রত পালন করিতেছি, সকল লোকেরই প্রতি অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ন্যায়যুক্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, প্রগাঢ় ভক্তি ও সাতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া রহিয়াছি; তিনি অপ্রাকৃত মনুষ্য। তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত, অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধ সুখের নিকেতন। তিনি আপনার নির্ম্মল জলতুল্য পবিত্র চরিত্র পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। যদি তাঁহার সাধু ব্যবহার যাবতীয় মনুষ্যের অগোচর থাকে, সুতরাং একবারমাত্রও লোকমুখে স্বীয় সুখ্যাতি শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, তথাপি তিনি আপনাকে ধর্ম্মরূপ ব্রত-পালনে কৃতকার্য্য জানিয়া অনুপম সুখসম্ভোগ করেন। দুঃখীর দুঃখ-মোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, জ্ঞানান্ধকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান ইত্যাদি কোন স্বানুষ্ঠিত একটি সৎক্রিয়া একবারমাত্রও স্মরণ করিলে যেরূপ বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, অখণ্ড ভূমণ্ডলের আধিপত্যরূপ প্রচুর মূল্য প্রাপ্ত হইলেও, তাহা বিক্রয় করা যায় না। সকলের শুভ-সাধন করাই দীন-দয়াল ধর্ম্মশীল ব্যক্তির সঙ্কল্প; অতএব তিনি সকলের প্রিয় হইতে পারেন। আর যদি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ় লোকে তাঁহার কর্ম্মের মর্ম্ম বোধে অসমর্থ হইয়া, দ্বেষ প্রকাশ ও অনিষ্ট-চেষ্টা করে, তথাপি তাঁহার কি করিতে পারে? গত-সর্ব্বস্ব হইলেও তিনি অধীর

হন না। তিনি আপনার হৃদয়রূপ ভাণ্ডারে যে অমূল্য সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কাহারও স্পর্শ করিবার সামর্থ্য নাই।

আত্ম-প্রসাদ যেমন পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার, আত্ম-গ্লানি ও গতানুশোচনা সেইরূপ পাপানুষ্ঠানের গুরুতর প্রতিফল যখন কোন দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-সমুদায়ের অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করিয়া পাপ-পিঞ্জরে বদ্ধ হই। তৎকালে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-সমুদায় উচ্চৈঃস্বরে নিবারণ করিলেও, আমরা তাহাতে শ্রুতিপাত করি না। কিন্তু রিপুসকল চরিতার্থ হইয়া অবিলম্বে নিরস্ত হয় এবং তখন গতানুশোচনারূপ অন্তর্দ্দাহের উদ্রেক হইতে থাকে। তখন আপনার আত্মাই আপনাকে গুরুতররূপে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হয়। যিনি আপনার কুব্যবহার দ্বারা কাহারও সুখ-রত্ন হরণ করিয়াছেন, অথবা বলে ও কৌশলে কাহারও ধর্ম্মরূপ বিশুদ্ধ ভূষণ ভ্রষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার চিত্ত-ভূমিতে তাহার মলিন মূর্ত্তি স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া, তাহাকে ব্যাকুল করিতে থাকে। আমার দ্বারা অমুকের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, বা অমুকের পরিবার দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, অথবা সংসারের দুঃখস্রোত এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে, আমি জন্মগ্রহণ না করিলে, ভূমণ্ডলের পাপ-প্রবাহ এক্ষণকার অপেক্ষায় অবশ্য কিছু না কিছু মন্দীভূত থাকিত—এরূপ স্মরণ ও চিন্তন করা দুঃসহ যাতনার বিষয়। যে ব্যক্তি এরূপ আলোচনা করিয়া অন্তঃকরণ স্থির রাখিতে পারে, তাহার হৃদয় পাষাণময়, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি কোন দারুণ দুষ্প্রবৃত্তি-বশতঃ স্বকীয় নিষ্কলঙ্ক সুচারু চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক কোন নির্ধন সামান্য ব্যক্তিকে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার আন্তরিক গ্লানি ও অনুতাপ-জনিত বিষম যন্ত্রণা চিন্তা করিলে, সেই প্রতারিত দুঃখী ব্যক্তিরও

আত্ম-গ্লানি ও ইহার ক্রিয়া

দয়া উপস্থিত হয়। নিদ্রা যেমন পরিশ্রান্ত ক্লান্ত ব্যক্তির অবসন্ন-শরীরে ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হইয়া, তাহার অজ্ঞাতসারে অল্পে অল্পে নেত্র-যুগল ভারাক্রান্ত ও নিমীলিত করে, সেই প্রকার পাপরূপ পিশাচ নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারণপূর্ব্বক অল্পে অল্পে অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিয়া, অবশেষে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া লয়। আমোদ যে সমস্ত পাপের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহারও প্রথম অনুষ্ঠানে ঐ আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি শ্রদ্ধা ও যত্ন-সহকারে কিয়ৎকাল অবাধে ধর্ম্মরূপ পবিত্র ব্রত পালন পূর্ব্বক, পরিশেষে রিপুবিশেষের বশীভূত হইয়া পাপ-পথে পদচালনা করেন, তিনিই জানেন অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আমাদের স্বীয় অন্তঃকরণ আমাদিগকে অধর্ম্ম পথে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে তিরস্কার করিতে থাকে; কিন্তু আমরা সে উপদেশ অবহেলনপূর্ব্বক যত অত্যাচার করি, আমাদের পাপাচরণ ততই অভ্যাস পায় এবং অভ্যাস পাইলে, ক্রমে ক্রমে গ্লানি ও অনুতাপ-জনিত যাতনার হ্রাস হইয়া আইসে। কারণ, কোন প্রস্তরের উপর পুনঃ পুনঃ খড়্গাঘাত করিলে, যেমন খড়্গের ধার ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হয়, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-সকল প্রবল হইলে, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল দুর্ব্বল হয়, সুতরাং তাহাদের তিরস্কার করণের শক্তি ন্যূন হইয়া, মনুষ্যকে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন করিয়া ফেলে। মনুষ্য হইয়া রিপু-সেবায় অনুরক্ত এবং পুণ্যজনিত পবিত্র সুখে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে?

মিত্রতা

সঙ্গলাভের বাসনা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ এবং সমস্ত সদ্‌গুণ আমাদের আদরণীয়। কাহারও কোন সদ্‌গুণ সন্দর্শন করিলে, তাহার প্রতি অনুরাগ-সঞ্চার হয়, এবং অনুরাগ-সঞ্চার হইলেই, তাহার সহিত সহবাস করিবার বাসনা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে একজনের প্রতি অন্য জনের শ্রদ্ধা ও প্রীতি উদ্রেক হইতে পারে; কিন্তু উভয়ের সমান ভাব না হইলে, প্রকৃতরূপ বন্ধুত্ব-ভাবের উৎপত্তি হয় না। সমান ভাব ও সমান অবস্থা সদ্ভাব-সঞ্চারের মূলীভূত। এই হেতু বালকের সহিত বালকের, যুবার সহিত যুবার এবং প্রাচীনের সহিত প্রাচীন ব্যক্তির সৌহৃদ্য-ভাব সহজে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই হেতু পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিত লোকের, অজ্ঞের সহিত অজ্ঞ লোকের, সাধুর সহিত সাধু লোকের এবং অসাধুর সহিত অসাধু লোকের মিত্রতা-ভাব অক্লেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই হেতু ধনার সহিত ধনী লোকের, দুঃখীর সহিত দুঃখী লোকের এবং মধ্য-বিত্তের সহিত মধ্য-বিত্ত লোকের অপেক্ষাকৃত অধিক সৌহৃদ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মানসিক প্রকৃতির সাম্যভাবই বন্ধুত্ব-গুণোৎপত্তির প্রধান কারণ। যে সমস্ত সুচরিত্র ব্যক্তির মনোবৃত্তি একরূপ হয়, সুতরাং এক বিষয়ে প্রবৃত্তি ও এক কার্য্যে অনুরক্তি জন্মে, তাঁহাদেরই পরস্পর প্রকৃতরূপ মিত্রতা লাভের সম্ভাবনা।

সদ্ভাব-সঞ্চারের হেতু

কিন্তু মেদিনী-মণ্ডলে দুই ব্যক্তির সর্ব্ববিষয়ে সমান হওয়া সম্ভব নয়। যাহাদের জ্ঞান সমান, তাহাদের অবস্থা সমান নয়। যাহাদের অবস্থা সমান, তাহাদের ধর্ম্ম সমান নয়। যাহাদের ধর্ম্ম সমান তাহাদের প্রবৃত্তি সমান নয়। যাহাদের প্রবৃত্তি সমান, তাহাদের সম্পত্তি সমান নহে। অনৈক্য ঘটনার এইরূপ অশেষবিধ

পূর্ণাঙ্গ ঐক্য দুর্ল্লভ

হেতু বিদ্যমান থাকাতে, এক ব্যক্তির সহিত অন্য ব্যক্তির সমস্ত বিষয়ে মিলন হয় না ; সুতরাং সম্পূর্ণরূপে সৌহৃদ্য-ভাবও উৎপন্ন হয় না। যে বিষয়ে যাহাদের অন্তঃকরণের ঐক্য হয়, তাহাদের সেই বিষয় অবলম্বন করিয়া সদ্ভাব হইতে পারে, এবং যে পর্য্যন্ত অন্য বিষয়ে বৈষম্যভাব উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই সদ্ভাব স্থায়ী হইতে পারে। যাঁহার সহিত কিয়ৎ বিষয়ে ঐক্য হয়, আমরা এ সংসারে তাঁহাকেই বন্ধুত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মনের ক্ষোভ নিবারণ করি। এরূপ বন্ধুও অতি দুর্লভ।

আমরা যাদৃশ বন্ধু-লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হই, যদিও তাদৃশ বন্ধু ধরণী-মণ্ডলে নিতান্ত দুর্লভ, তথাচ বন্ধু-ব্যতিরেকে জীবিত থাকা দুঃসহ ক্লেশের বিষয়। কোন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি (বেকন) উল্লেখ করিয়াছেন,—বন্ধু ব্যতিরেকে সংসার একটী অরণ্য মাত্র। অপর এক মহাত্মা (সিসিরো) নির্দ্দেশ করিয়াছেন,- বন্ধুহীন জীবন আর সূর্য্য-হীন জগৎ উভয়েই তুল্য। তৃতীয় ব্যক্তি (হিতোপদেশ-কর্ত্তা) লিখিয়া গিয়াছেন,—সংসার-রূপ বিষবৃক্ষে দুইটী সরস ফল বিদ্যমান আছে, কাব্যরূপ অমৃত-রসের আস্বাদন ও সজ্জনের সহিত সমাগম। যিনি দুঃখের হস্তে পতিত হইয়াও বন্ধুজনের দর্শন পান, দুঃখ কি কঠোর পদার্থ, তিনি তাহা অবগত নহেন। যিনি বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সম্পৎ-সুখ সম্ভোগ করেন, বন্ধু-ব্যতিরেকে বিষয়-সম্পত্তি কেমন অকিঞ্চিৎকর, তাহাও তাঁহার প্রতীত হয় নাই। বন্ধু শব্দ যেমন সুমধুর, বন্ধুর রূপ তেমনি মনোহর। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাপিত চিত্ত শীতল হয়, এবং বিষণ্ণ বদন প্রসন্ন হয়। প্রণয়-পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া যেমন পরিতোষ জন্মে, তেমন আর কিছুতেই জন্মে না। তাঁহার সহিত সহসা সাক্ষাৎকার হইলে, কি জানি কি নিমিত্ত শোক-সন্তপ্ত সুদুঃখিত ব্যক্তিরও অধরযুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়। দীর্ঘকাল অনশনের

বন্ধু-মাহাত্ম্য

পর অন্নভোজন করিলে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া সুশীতল জল পান করিলে যেরূপ সুখানুভব হয়, এবং তপন-তাপে তাপিত হইয়া, সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে, অঙ্গ-সন্তাপ দূরীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদ-লাভ হয়, সেইরূপ প্রিয় বন্ধুর সুমধুর সান্ত্বনা-বাক্য দ্বারা দুঃখিত জনের মনের সন্তাপ অন্তরিত হইয়া, সন্তোষসহ প্রবোধ-সুধার সঞ্চার হয়।

প্রবন্ধের বিষয়-নির্দ্দেশ

বন্ধুত্ব-গুণের প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। উহা এমন মনোহর বিষয় যে, শত শত গ্রন্থকার উহার মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই। ফলতঃ এ স্থলে আমাদের মিত্রতা-ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ করা যত আবশ্যক, মিত্রতার গুণ বর্ণন করা তত আবশ্যক নয়। কাহারও সহিত মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ হইবার সময়ে কিরূপ অনুষ্ঠান করা উচিত; তৎপরে যত কাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে, ততকাল কিরূপ আচরণ করা বিধেয়; পরিশেষে যদি বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলেই বা কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য—এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

মিত্রতা সংঘটিত কর্ত্তব্য—
(১) মিত্রনির্ব্বাচন

প্রথমতঃ। জ্ঞানবান্ সচ্চরিত্র ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য নয়। সাধু-সঙ্গ যেমন গুণকারী, অসাধু-সঙ্গ তেমনি অগুণ-কারী—ইহা প্রসিদ্ধই আছে। বন্ধুর দোষে আমাদের চরিত্র দূষিত হয়। আমরা যে ব্যক্তিকে একান্ত ভালবাসি ও যাঁহার সহিত সর্ব্বদা সহবাস করি, তাঁহার দোষ-সমুদায়কে দোষ বলিয়া বিবেচনা করি না; প্রত্যুত, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া, তদনুরূপ অসদাচরণ করিতেই প্রবৃত্ত হই। তাঁহার দোষ-সমুদায় আমাদিগের এমন অক্লেশে অভ্যাস পায় যে জানিতে পারিলেও পারি না, কিরূপে অভ্যাস হইল। অতএব যখন আমাদের গুণাগুণ ও সুখ-দুঃখ

মিত্রের গুণাগুণের এত সাপেক্ষ, তখন যে ব্যক্তিকে সচ্চরিত্র ও সদ্বিবেচক বলিয়া নিশ্চয় না জানা যায়, তাঁহার সহিত মিত্রতা করা কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়। যাঁহার বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উভয়ই বলবতী, তাঁহারই সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য।

মিত্রের দোষে চিরজীবন দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা এবং মিত্রের গুণে চিরজীবন সুখী হইবার সম্ভাবনা। যে দুষ্কর্ম্মশালী দুঃশীল ব্যক্তির সহিত কিছুদিন মিত্রতা থাকিয়া বিচ্ছেদ হইয়া যায়, তাহারও সেই অল্প কালের সংসর্গ দোষে আমাদের চরিত্র এমন দূষিত হইতে পারে যে, জন্মের মত দোষী থাকিয়া, অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া কালহরণ করিতে হয়। যদি কিয়ৎক্ষণ হাস্য-কৌতুক ও প্রমোদ-সম্ভোগ মাত্র বন্ধুত্ব-করণের উদ্দেশ্য হইত, তবে, কেবল পরিহাস-পটু সুরসিক ব্যক্তি দেখিয়া, তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি কাহারও নিকট কিছু সাংসারিক উপকার-প্রাপ্তির উদ্দেশে শিষ্টতা ও সৌজন্য-প্রকাশ মাত্র বন্ধুত্ব-করণের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে, কেবল উদার স্বভাব ঐশ্বর্য্যশালী অথবা ক্ষমতাপন্ন পদস্থ ব্যক্তি দেখিয়া তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি লোক-সমাজে মান্য লোকের মিত্র বলিয়া গণ্য হওয়া বন্ধুত্ব-করণের অভিসন্ধি হইত, তাহা হইলে, কোন লোক-মান্য বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য, অথবা কথঞ্চিৎ লোকের নিকট তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইবার নিমিত্ত অশেষমত চেষ্টা পাইতাম। কিন্তু যদি মিত্রের সহিত মিত্রের মনোমিলনের নাম মিত্রতা হয়, যদি মিত্রের ক্লেশে ও মিত্রের বিপদে বিপন্ন হওয়া বিধেয় হয়, যদি মিত্রের দোষ গোপন করিয়া সুস্পষ্ট পক্ষপাত-দোষে দূষিত হওয়া আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়. যদি পাপিষ্ঠ মিত্রের সংসর্গ-বশতঃ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অনুরক্তি হওয়া সম্ভাবিত হয়, যদি বন্ধুজনের কদাচার-জনিত কলঙ্ক শুনিয়া লজ্জিত ও সন্তপ্ত হওয়া অকপট-হৃদয়

সুহৃদ্‌বর্গের প্রকৃতি-সিদ্ধ হয়, তবে কাহারও সহিত মিত্রতা-গুণে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার গুণ ও চরিত্র যত্নপূর্ব্বক নিরূপণ করা কর্ত্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি তোমার সহিত আত্মীয়তা করিবার বাসনা করেন, তিনি আপনি আপনার আত্মীয় কি না, বিচার করিয়া দেখ।

ধরণী-মণ্ডলে ধর্ম্ম-ব্যতিরেকে আর কিছুই স্থায়ী নহে। ধর্ম্ম যে মিত্রতার মূলীভূত নয়, তাহা কদাচ স্থায়ী হয় না। বন্ধু যেমন বিশ্বাস-স্থল, এমন আর কেহই নয়। কিন্তু অপাত্রে বিশ্বাস করিলে, অবিলম্বেই প্রতিফল পাইতে হয়। যে ব্যক্তি স্বার্থ-লাভ-প্রত্যাশায় কাহারও সহিত মিলন করে, যদি বন্ধুজন-সম্পর্কীয় কোন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিলে স্বার্থলাভ হয়, তবে সে কথা কেন না প্রকাশ করিবে? যে ব্যক্তি অধর্ম্মাচরণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে বন্ধুজন-সমীপেই বা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে কেন কুণ্ঠিত হইবে? যে ব্যক্তি আমাদের আকস্মিক দারিদ্র্য-দশা উপস্থিত দেখিয়া, আমাদের নিকট উপকার-প্রত্যাশা-রহিত বলিয়া, চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হয়, সে ব্যক্তি আমাদের দুঃখানলে সান্ত্বনা-সলিল সেচন করিতে কেন ব্যগ্র হইবে? এমন ব্যক্তি যদি আমাদের অপযশ ঘোষণা করিয়া, স্বার্থলাভ করিতে পারে, তবে আমাদিগের চরিত্রে অসত্য কলঙ্ক আরোপণ-পূর্ব্বক সুখ্যাতি লোপ করিতেই বা কেন পরাঙ্মুখ হইবে? অনেক ব্যক্তি বিশ্বাস-ঘাতক বন্ধুর বিষম অত্যাচার-জনিত দুঃসহ ক্লেশে কাতর হইয়া থাকেন, এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু ঐ ক্লেশ কেবল সেই বন্ধুর দোষে নয়, নিজ দোষেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপাত্রে বিশ্বাস-স্থাপন করাতেই তাঁহাকে ঐ প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। বন্ধুত্ব-ঘটনার প্রারম্ভ-সময়ে যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত, তাহা না করাতেই, উক্তরূপ ক্লেশ-পরম্পরা ভোগ করিতে হয়। অতএব, অসাধু লোকের সহিত বন্ধুতা

মিত্রতায় অসাধু-বর্জ্জন

করা কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়। সদ্‌বিদ্যাশালী সচ্চরিত্র দেখিয়া বন্ধু করিবে।

দ্বিতীয়তঃ। যে সময়ে কোন ব্যক্তিকে মিত্র বলিয়া অবধারণ করা যায়, সেই সময় অবধি তৎসংক্রান্ত কতকগুলি অতি মনোহর অভিনব ব্রতে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হয়। সেই সমুদায় পবিত্র ব্রতই বা কি, এবং কিরূপেই বা পালন করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে। যত কাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে, তাবৎ তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার সম্পাদন করিতে হয়, তাহা অগ্রে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তাঁহার বিচ্ছেদ বা প্রাণত্যাগ-জনিত সুদারুণ শোক-সন্তাপ যদি আমাদের ভাগ্যে ঘটে, তাহা হইলে, তৎপরে যাবৎ-কাল জীবিত থাকিতে হয়, তাবৎকাল তদীয় সদ্ভাব-সংক্রান্ত যে যে নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

(২)
মিত্রের প্রতি আচরণ

আমরা যাঁহার সহিত যথানিয়মে বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হই, তাঁহাকে অসঙ্কুচিত-চিত্তে অব্যাহতভাবে বিশ্বাস করা প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যখন আমরা তাঁহাকে নিতান্ত বিশ্বাসভাজন বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য-রূপ বিশুদ্ধ ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তখন তাঁহার নিকট অকপটহৃদয়ে হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটন করা,সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রোমক-দেশীয় কোন নীতি-প্রদর্শক (সেনেকা) নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"তুমি যাঁহাকে আত্মবৎ বিশ্বাস না কর, তাঁহাকে যদি বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক, তবে তুমি বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত প্রভাব প্রতীতি করিতে সমর্থ হও নাই; তুমি যাঁহার প্রতি অনুরক্ত হও, তিনি তোমার হৃদয়-নিলয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত কি না, দীর্ঘকাল বিবেচনা করিবে। কিন্তু যখন বিচার করিয়া, তাঁহাকে যথার্থরূপ উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিবে, তখন তাঁহাকে অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে স্থান প্রদান করিবে।" বাস্তবিক

মিত্রে বিশ্বাস

মিত্র সদৃশ প্রত্যয়-স্থল আর কেহই নাই। প্রকৃত মিত্রের অকপট হৃদয় বিশ্বাস-রূপ পরম পদার্থের জন্ম ভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। তাঁহার হস্তে ধন-প্রাণাদি সমুদায়ই বিশ্বাস করিয়া অর্পণ করা যায়। কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার বিষয় নয়। যে বিষয় পিতার নিকট ব্যক্ত করিতে শঙ্কা উপস্থিত হয়, ভ্রাতার নিকট প্রকাশ করিতে সংশয় জন্মে, এবং ভার্য্যা-সমীপেও সময় বিশেষে গোপন রাখিতে হয়, মিত্র-সন্নিধানে তাহা অসঙ্কুচিত-চিত্তে অক্লেশে ব্যক্ত করা যায়।

মিত্রের কল্যাণ ও উপকার সাধন

যে ব্যক্তি একান্ত প্রীতি-ভাজন ও নিতান্ত বিশ্বাস-পাত্র, তাঁহার কল্যাণ-সাধন বিষয়ে সহজেই অনুরাগ হইয়া থাকে, এবং বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তদর্থে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়; তাঁহার যদি কোন বিষয়ের অপ্রতুল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, সে অপ্রতুলপরিহারার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি তিনি শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হন, তাহা হইলে, প্রীতি-বচন ও স্নেহ-বিতরণ দ্বারা সেই সন্তাপের শান্তি করিতে সযত্ন হওয়া উচিত। যদিও আমরা তাঁহার শোক-দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে সমর্থ না হই, তথাচ কিছু না কিছু শমতা করিতে পারি, তাহার সন্দেহ নাই। কখন কখন প্রণয়-পবিত্র প্রবোধ-বচন দ্বারা তাঁহার দুঃখের উপর সুখের ছায়া পাতিত করিয়া, শোকের বিষয় কিয়ৎক্ষণ বিস্মৃত রাখিতে পারি। যদি তিনি নিরপরাধে লোকের নিকট নিন্দিত হন, তাহা হইলে, আমরা তাঁহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া প্রবোধ দিতে ও তাঁহার মিথ্যাপবাদ-জনিত মানসিক গ্লানির শমতা করিতে সমর্থ হই এবং জন-সন্নিধানে তদীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইতে পারি। তাঁহার উল্লিখিতরূপ অশেষ প্রকার উপকার সম্পাদন করা আমাদের উচিত কর্ম্ম। তাঁহার

উপকার-সাধনে সযত্ন ও সমর্থ হওয়া, আমাদের সুখের কার্য্য ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

বন্ধুর পাপাঙ্কুর উৎপাটন করা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা তাঁহার যত প্রকার উপকার-সাধন করিতে পারি, তন্মধ্যে কোন প্রকারই উহার তুল্য কল্যাণকর নয়। মনুষ্যের পক্ষে কোন পদার্থ ধর্ম্ম অপেক্ষায় হিতকারী নহে; অতএব হৃদয়াধিক প্রিয়তম সুহৃজ্জনের হৃত-প্রায় ধর্ম্মরত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া অপেক্ষা অন্য কোন প্রকারে তাঁহার অধিকতর উপকার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না।

মিত্রের দোষ সংশোধন

যে সময় যাঁহাকে বন্ধুত্ব-পদে বরণ করা যায়, সেই সময়ে তিনি যথার্থ সচ্চরিত্র থাকিলেও, পরে অসচ্চরিত্র হওয়া অসম্ভব নহে। মনুষ্যের মন নিরন্তর একরূপ থাকা সহজ নয়; পুণ্য-পদবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে, দৈবাৎ পদ-স্খলন হইয়া, বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা আছে। বন্ধুজনের এতাদৃশ অকল্যাণকর বিড়ম্বনা ঘটিলে, তাঁহাকে পুণ্য-পথে পুনরানয়ন করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য। পাপাসক্ত ব্যক্তিকে হিত-বাক্য কহিলে, কি জানি সে বিপরীত ভাবিয়া রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়, এই বিবেচনায় অনেকে মিত্রগণের দোষ সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হন না; কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার উচিত ব্যবহার নয়। পীড়িত ব্যক্তি কটু ও তিক্ত ঔষধ ভক্ষণ করিতে সম্মত না হইলেও, তাহাকে ঐ সমুদায় রোগনাশক সামগ্রী সেবন করান যেমন অবশ্যই কর্ত্তব্য, অধর্ম্ম-স্বরূপ মানসিক রোগে রুগ্ন ব্যক্তিকেও উপদেশ-ঔষধ সেবন করান, সেইরূপ অবশ্যই কর্ত্তব্য ও পুণ্য কর্ম্ম। সে বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইলে, বন্ধুত্ব-ব্রত লঙ্ঘন করা হয়। তাঁহার সন্তোষসাধন ও রোগোৎপত্তি নিবারণ-উদ্দেশে মৃদুবচনে সুমধুরভাবে উপদেশ দেওয়া বিধেয়। যদি তিনি বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে ও আমাদের উপদেশ-বাক্যের অভিসন্ধি

বুঝিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে, তিনি আপনার অবলম্বিত অধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইবেন ও আমাদের প্রতি রুষ্ট না হইয়া, সমধিক সন্তুষ্টই হইবেন। আমরা তাঁহার ধর্ম্ম-রূপ অমূল্য রত্ন উদ্ধারার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তিনি আমাদের প্রতি অধিকতর অনুরাগ প্রকাশ করিবেন, এবং প্রণয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা-রস মিলিত করিয়া, অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-ভাব প্রদর্শন করিবেন।

প্রকৃত বন্ধু

যাঁহারা সরলান্তঃকরণে প্রিয়-বচনে মিত্র-গণের দোষোল্লেখ করিয়া, সদুপদেশ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারা প্রকৃত মিত্র-পদের বাচ্য নহেন। যাঁহারা কোন মিত্রের কুপ্রবৃত্তি সমুদায় বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া, তাঁহার রোষোৎপত্তির আশঙ্কায় বাক্যমাত্র ব্যয় করেন না, স্পষ্টবাদী শত্রুসকল তাঁহাদের অপেক্ষা হিতকারী সুহৃদ্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। রোমক-রাজ্যের এক পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন,—"অনেক ব্যক্তি প্রিয়ংবদ মিত্র অপেক্ষায় বদ্ধবৈর শত্রু-সমীপে অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।" কারণ, তাঁহারা উক্তরূপ শত্রুর নিকট সরল যথার্থ কথা শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু উক্তরূপ মিত্রগণের নিকট কস্মিন্‌কালে শুনেন নাই। তাঁহাদের বিরাগ ও অনুরাগ উভয়ই বিপরীত; কেন না, তাঁহারা অধর্ম্মে অনুরক্তি ও সদুপদেশ-গ্রহণে বিরক্তি প্রকাশ করেন। ধনাঢ্যদিগের মধ্যে অনেকেই, অথবা প্রায় সকলেই উক্তরূপ মিত্র-মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকেন। তাঁহারা আপনার তুষ্টিকর ভিন্ন অন্য বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন না এবং তাঁহারা যে সমস্ত পদানত বন্ধুকে বন্ধু-সম্বোধন করেন, তাহারাও তাঁহাদের তোষ-জনক ব্যতীত অন্য বাক্য উল্লেখ করিতে সাহসী হয় না। ধনী মহাশয়েরা চতুর্দ্দিক হইতে আপন ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতেই ভালবাসেন এবং তদীয় আজ্ঞাবহ মিত্র মহাশয়েরা প্রতি বাক্যেতেই তাঁহাদের সে বাসনা সুসিদ্ধ করিতে থাকেন।

পূজ্য ও পূজক উভয় বন্ধুর মধ্যে এক জন পরিচারণা ও অন্য জন অর্থলাভ-মাত্র অভিলাষ করেন। তাঁহারা যদি পরস্পর মিত্রশব্দের বাচ্য হইতে পারেন, তবে ক্রীত দাস ও ক্রেতা স্বামীই বা সেই শব্দের প্রতিপাদ্য কেন না হইবে? অকপট-হৃদয়ে অকুণ্ঠিত-ভাবে সদুপদেশ প্রদান করা এবং সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক সেই উপদেশ গ্রহণ করা, বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত লক্ষণ। সে স্থলে যদি চাটুকারিতা দোষ উপস্থিত হয়, তবে সে চাটুকারিতা যেমন অনিষ্টকর হইয়া উঠে, বিদ্বেষীদিগের সুস্পষ্ট বিদ্বেষ-বচন কদাচ সেরূপ অনিষ্টকর নয়।

(৩) মিত্র-বিচ্ছেদে কর্ত্তব্য

তৃতীয়তঃ। কাহারও সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হইতে হইলে, সে সময়ে কিরূপ আচরণ করিতে হয় এবং বদ্ধ হইবার পরেই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এই দুই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল। এক্ষণে বন্ধুত্ব-ঘটিত চরম ক্রিয়ার বিষয় অতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

বন্ধু-বিচ্ছেদের হেতু

সৎপাত্রে প্রণয় সংস্থাপন করিলে, কস্মিন্ কালে সে প্রণয়ের বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নয়। যাঁহারা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পবিত্র নিয়মানুসারে পরস্পর বন্ধুত্ব-ব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের অন্তিম দশা উপস্থিত না হইলে, তদীয় বন্ধুত্বেরও অন্তিম দশা উপস্থিত হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মিত্র-পরিগ্রহ-সময়ে যিনি যত বিবেচনা করুন না কেন ও যত সাবধান হউন্ না কেন, লক্ষণাক্রান্ত সুজন মিত্র নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া সুকঠিন কর্ম্ম। অবনী-মণ্ডলে জ্ঞান-পবিত্র সুচরিত্র মিত্র-সদৃশ সুদুর্লভ পদার্থ আর কিছুই নাই। আমরা এক সময়ে যাঁহাকে নিতান্ত নিষ্কলঙ্ক জানিয়া, সুহৃদ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, অন্য সময়ে তাঁহার এমন কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য রাখিবার আর পথ থাকে না।

যদিও তিনি কোন গুরুতর দৃষ্টদোষে দূষিত না হন, তথাচ এরূপ সন্দিগ্ধ, সারল্য-হীন ও কোপন-স্বভাব হইতে পারেন যে, তাঁহার প্রণয়-পাত্র ও বিশ্বাস-ভাজন হওয়া একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব যাঁহারা পরস্পরের গুণাগুণ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হন, কোন না কোন কালে তাঁহাদের সেই বন্ধন একেবারে ছিন্ন হওয়া সম্ভব। যদি ভাগ্য-দোষ-বশতঃ এতাদৃশ নিদারুণ ঘটনা নিতান্তই ঘটিয়া উঠে, তথাচ তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব-ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের সমাপ্তি হয় না। আমরা জন্মাবধি কস্মিন্ কালে যাহার মুখাবলোকন করি নাই, আর যাহার সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া, পুলকিত-চিত্তে কিয়ৎকাল অতিপাত করিয়াছি, সেই উভয়ই আমাদের সমান যত্নের পাত্র বা সমান অবজ্ঞার বিষয় বলিয়া কথনই গণ্য হইতে পারে না। যদিও ঐ শেষোক্ত সুহৃদ্ মহাশয় আমাদের সহিত নিতান্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া, আমাদের অনুরাগ-লাভের একান্তই অযোগ্য হন, তথাচ তিনি সদ্ভাবের সময়ে বিশ্বাস করিয়া আমাদিগকে যে কোন গোপনীয় বিষয় অবগত করিয়াছিলেন, সেই সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও, তাহা কদাচ ব্যক্ত করা উচিত নয়। যে সময়ে কাহারও সহিত সৌহৃদ্য থাকে, সে সময়ে তিনি আপনার মনের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া, আমাদের নিকট এতাদৃশ গুহ্যবিষয় প্রকাশ করিতে পারেন যে, তাহা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি তাঁহার উক্ত-রূপ অনর্থের অথবা কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা নাও থাকে, তথাচ যখন আমরা তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছি- অমুক বিষয় অপ্রকাশ রাখিব, তখন তাহা প্রাণসত্ত্বে প্রকাশ করা বিধেয় নয়। যদি তাঁহার সমীপে উক্তরূপ বাচনিক অঙ্গীকার নাই করিয়া থাকি, তথাচ যাঁহার সহিত প্রণয়-পাশে বদ্ধ থাকিতে হয়, তাঁহার নিকট উক্তরূপ

বিচ্ছেদকালে গুহ্যবিষয় প্রকাশ নিষিদ্ধ

অঙ্গীকার করা, প্রথমাবধিই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বন্ধুজনের গুহ্যবিষয় ব্যক্ত করা বিহিত নয়, ইহা বন্ধুত্ব-বিষয়ক এক প্রধান নিয়ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব তিনি সদ্ভাব সত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া, সংগোপনে যে বিষয় আমাদিগকে অবগত করিয়াছেন, সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও, তাহা চির-কালই হৃদয়মধ্যে যত্নপূর্ব্বক নিহিত রাখা বিধেয়।

প্রায় সকল বিধিরই স্থল-বিশেষে সঙ্কোচ করিতে হয়। সৌহৃদ্যের বিভেদ হইলেও, সুহৃজ্জনের গুহ্য বিষয় প্রকাশ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি স্থলে উহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। যদি তিনি দ্বেষ-পরবশ হইয়া, মিথ্যাপবাদ দিয়া, আমাদের নির্দ্দোষ চরিত্রকে দূষিত বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, আর তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত কোন গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত না করিলে, সে দোষে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে, সে বিষয় প্রকাশ করা কদাচ অবৈধ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। তিনি যখন অনর্থক অপবাদ দিয়া, আমাদের অকলঙ্কিত চরিত্রকে কলঙ্কিতবৎ প্রতীয়মান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বলিতে হইবে, আমরা যে তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিব, তিনি আর এরূপ প্রত্যাশা করেন না।

—ইহার ব্যতিক্রম

এতাদৃশ সুহৃদ্ভেদ সমধিক যন্ত্রণার বিষয়। কিন্তু অনেকের বন্ধুত্ব ইহা অপেক্ষাও স্থায়ী ও সুখকর হইয়া থাকে। জীবনান্ত-ব্যতিরেকে তাঁহাদের সৌহৃদ্য-ভাবের অন্ত হয় না। সুহৃদ্ভাগ্যশালী উভয় মিত্রের মধ্যে একজন যদি দুর্ব্বিপাকবশতঃ প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে, অন্য জন তখনও একেবারে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না, এবং নিষ্কৃতি পাইতে বাসনাও করেন না। তিনি মিত্রের শোকে বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রু-জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিলেও,

সুহৃদ্ভেদ সমধিক যন্ত্রণাদায়ক

সে জলে তাঁহার হৃদয়-স্থিত প্রীতির চিহ্ন প্রক্ষালিত হয় না। তিনি বন্ধুর দেহ দীপ্ত চিতায় দগ্ধ হইতে দেখিলেও, সে বন্ধুর কথনোন্মুখ মনোহর মূর্ত্তি তাঁহার চিত্তপথ হইতে অপনীত হয় না। তিনি অতি দুঃসহ শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হইলেও, তাঁহার অন্তঃকরণের প্রেমের অঙ্কুর কদাচ দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয় না। বন্ধুর মান, বন্ধুর যশ ও বন্ধুর পরিজন, তখন তাঁহার প্রীতি ও স্নেহ অধিকার করিয়া থাকে। তিনি মৃত বন্ধুর পরিবার ও দেশান্তরনিবাসী অজ্ঞাত-কুল-শীল ব্যক্তির পরিবার, এই উভয়ের প্রতি কদাচ সমান ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। তিনি অপরিচিত ব্যক্তির দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া যেমন উদাসীন থাকেন, মৃত বন্ধুর সন্তানের বিপৎ-পতনের সমাচার শুনিয়া, সেরূপ উদাসীন থাকিতে কদাচ সমর্থ হন না। মৃত বন্ধুকে স্মরণ রাখা, তাঁহার সদ্‌গুণ-সমূহ কীর্ত্তন করিয়া তদীয় যশঃ-শশধর বিমল রাখিতে চেষ্টা পাওয়া এবং তাঁহার পরিজনবর্গের প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া, তাহাদের প্রতি সৌজন্য ও করুণাভাব প্রকাশ করা, সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

কু-সংসর্গ

অধর্ম্মের প্রতি সচ্চরিত্র সাধুব্যক্তিদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ ঘৃণা ও দ্বেষ আছে, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ। অসৎ-সংসর্গ এ দোষের এক প্রবল কারণ। অধার্ম্মিকদিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস করিতে যাহাদের প্রবৃত্তি হয়, অধর্ম্মেতে যেরূপ ঘৃণা থাকা উচিত, তাহা তাহাদের কখনই থাকে না। স্বভাব সর্ব্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাসও সামান্য প্রবল নয়। যে পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্যবান্ ব্যক্তি পাপের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া, অসৎ-সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ

অসৎ-সংসর্গ

করেন, পরে নানা কারণে কুলোকের সহিত সহবাস করা তাঁহারও অভ্যাস হইতে পারে ও তদ্দ্বারা অধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া, ক্রমশঃ নানাপ্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধু-সঙ্গ অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

সাধু-সঙ্গ

সাধু-সঙ্গের গুণ অতি আশ্চর্য্য। যেমন পরম শোভাকর পূর্ণ-চন্দ্র সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া, ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুকে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত করে, সেইরূপ পরমেশ্বর-পরায়ণ পুণ্যাত্মারা সদালাপ ও সদুপদেশ প্রদান করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী পুণ্যার্থীদিগের অন্তঃকরণ পরম রমণীয় ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত করিতে থাকেন। তাঁহাদের সহিত সহবাসে যে ব্যক্তির অত্যন্ত অনুরাগ ও পরিতোষ জন্মে এবং আপন অন্তঃকরণ, প্রসন্ন ও পবিত্র রাখিবার নিমিত্ত একান্ত যত্ন ও প্রতিজ্ঞা থাকে, সেই ব্যক্তিই অধর্ম্মকে দুর্গন্ধবৎ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ সুখ-সম্ভোগে অধিকারী হইতে পারে। পরম মনোহর পুষ্পোদ্যান-স্থিত বিশুদ্ধ-বায়ু-সেবিত অট্টালিকাতে অবস্থিতি করা যাঁহার সতত অভ্যাস, দুর্গন্ধবিশিষ্ট ন্যক্কারজনক অপরিচ্ছন্ন স্থানে বাস করিতে অবশ্যই তাঁহার ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মে। সেইরূপ, যে ব্যক্তি আত্মপ্রসাদ ও সাধুসঙ্গকে অমূল্য সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া, তাহার লাভার্থে সতত যত্নবান্ থাকেন, এবং তাহা লাভ করিতে পারিলে, পরম পবিত্র আনন্দরসে অভিষিক্ত হন, সেই ব্যক্তি যাবতীয় কুকর্ম্ম দুর্গন্ধবৎ অশ্রদ্ধেয় ও পরিত্যাজ্য বিবেচনা করিয়া, উপস্থিত দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিক সমর্থ, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব অধর্ম্মের আক্রমণ নিবারণ-পুরঃসর ধর্ম্মব্রত পরিপালনার্থ অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধু-সঙ্গ লাভে নিয়ত যত্নবান্ থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পরিশ্রম

মনুষ্যেরা পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর ন্যায় অযত্ন-সম্ভূত অন্নাচ্ছাদন ও স্বভাবজাত বাসস্থান প্রাপ্ত হন নাই; তাঁহাদিগকে নিজ-যত্নে ঐ সমুদায় উৎপাদন ও নির্ম্মাণ করিতে হয়। জগদীশ্বর যেমন ঐ সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করা মনুষ্যের পক্ষে আবশ্যক করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তদুপযোগী শরীর ও মন প্রদান করিয়া এবং বাহ্য বস্তু সমুদায় তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া সঙ্কেতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, মনুষ্য আপনার শরীর ও মন পরিচালন-পূর্ব্বক জীবিকা-নির্ব্বাহ ও সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ করিবেন। তিনি এই অশেষ কল্যাণকর অনুমতি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন; তাহা পালন করিলেই সুখ, লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ।

পরমেশ্বরের অভিপ্রায়

অনেকে পরিশ্রম কেবল ক্লেশের বিষয় বোধ করেন; কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা কেবল ভ্রান্তির কর্ম্ম। কেবল কল্যাণই পরিশ্রমের চরম ফল। পরম শোভাকর প্রশস্ত অট্টালিকা, বিকসিত পুষ্প-পরিপূর্ণ মনোহর পুষ্পোদ্যান, সুচিক্কণ চিত্ত-রঞ্জন পণ্য-পরিপূর্ণ আপণশ্রেণী, তড়িত-সম বেগবিশিষ্ট বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ, ধর্ম্ম শাসন-সংস্থাপক পবিত্র বিচারস্থান, জ্ঞানরূপ মহারত্নের আকর-স্বরূপ বিদ্যা-মন্দির, পৃথিবীস্থ জ্ঞানিগণের জ্ঞান সমষ্টিস্বরূপ পুস্তকালয়—ইত্যাকার সমুদায় শুভকর বস্তুই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের অসীম মহিমা পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে।

পরিশ্রমের মহিমা

পরিশ্রম যে পরিণামে সুখোৎপাদন করে, ইহা বিবেচক লোকেরা সহজে স্বীকার করিয়া থাকেন। অনেক দেশের অনেক গ্রন্থকার আলস্যের ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরিশ্রম যে কেবল পরিণামেই

সুখোৎপাদক, এমন নহে ; কর্ম্ম করিবার সময়েও বিশুদ্ধ সুখ সমুদ্ভাবন করে। অঙ্গ-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে স্ফূর্ত্তিলাভ ও হর্ষোদয় হইয়া থাকে।

শারীরিক শ্রমে সত্তসুখ

শরীর চালনায় যে কিরূপ দুর্লভ সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা শিশুগণ বিশিষ্টরূপে অনুভব করিয়া থাকে। তাহারা মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির থাকিতে ভালবাসে না ; গমন, ধাবন, কুর্দ্দন করিতে পারিলেই, তাহারা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়। যাঁহারা প্রতি দিবস ৭।৮ সাত আট ঘণ্টা নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, বিনা পরিশ্রমে এক দিবস ক্ষেপণ করাও তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন বোধ হয়। শরীর সঞ্চালন না করিলে, পীড়িত হইয়া, ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা এরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন যে, তাহাতে অঙ্গ-সঞ্চালনের আবশ্যকতা নাই, সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা তাঁহাদিগকে ব্যায়াম অথবা অন্যবিধ অঙ্গচালন করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন।

শরীরের ন্যায় মনেরও চালনা করা আবশ্যক ; নতুবা মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইতে থাকে ; সুতরাং তেজস্বিনী মনোবৃত্তি-পরিচালন

মানসিক শ্রমের আবশ্যকতা

দ্বারা যে প্রকার প্রগাঢ় সুখের উৎপত্তি হয়, তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়। আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক মনোবৃত্তি সুখ-সলিলের একএকটি পবিত্র প্রস্রবণ স্বরূপ। তাহাদিগকে যথাবিধানে চালন করিয়া যত সতেজ করা যায় ততই প্রবল সুখধারা উৎপাদিত হইতে থাকে। অতএব পরিশ্রম যে আবশ্যক ও বিধেয়, তাহা আমাদের প্রকৃতি-পটে সুস্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে।

কেহ কেহ শারীরিক কর্ম্মকে নিন্দনীয় কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করেন। লোকের কেমন বিপরীত বুদ্ধি, তাঁহারা লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী আবশ্যক হিতকারী কর্ম্মকে ক্লেশকর অপকৃষ্ট কর্ম্ম বিবেচনা করেন, আর

অনাবশ্যক অলীক কার্য্য-সমুদায় ভদ্রলোকের অনুষ্ঠান-যোগ্য সুখদায়ক ব্যাপার বোধ করিয়া থাকেন; তাঁহারা কৃষি ও শিল্পকর্ম্ম ইতর বলিয়া ঘৃণা করেন, কিন্তু মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পশুবধ করা, সদ্বংশ-জাত সম্ভ্রান্ত লোকের অযোগ্য বিবেচনা করেন না। "ভদ্র" এই আখ্যাধারী মহাশয়েরা যৎসামান্য জলাশয়-তটে উপবিষ্ট ও মার্ত্তণ্ড তাপে তাপিত হইয়া এবং দুঃসহ চাকচিক্যময় জলপুঞ্জোপরি প্লবমান শ্বেতবর্ণ তরঙ্গের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া, অশেষবিধ নিষ্ঠুরাচরণ সহকারে প্রাণিহিংসা করাকে আপনাদের উপযুক্ত কর্ম্ম বোধ করেন; কিন্তু জনসমাজের উপকারী অত্যাবশ্যক কর্ম্ম-সমুদায় কেবল কষ্টদায়ক নীচবৃত্তি বিবেচনা করিয়া থাকেন।

শারীরিক শ্রম নিন্দনীয় নহে

যে সময়ে মনুষ্যের বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, তখন তাঁহাকে উচিত-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, মনুষ্যনামের গৌরবরক্ষা করিতে দৃষ্টি করা যায়; আর যখন তাঁহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া উঠে, তখন পশুবৎ নিকৃষ্টব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া, নিকৃষ্ট জীবের ভাবগ্রহণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু অবিবেচক অদূরদর্শী মনুষ্যদিগের এই সমস্ত অনিষ্টকর কুসংস্কার, করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মের অনুগত নহে। যখন আমাদের লোকযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী যাবতীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া, তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তখন তাহা কোন ক্রমেই ঘৃণার বিষয় নয়। যাহা তাঁহার নিয়মের প্রতিকূল, তাহাই নিন্দনীয়; তাঁহার নিয়মের অনুকূল ব্যবসায় আদরণীয় ব্যতিরেকে কদাচ নিন্দনীয় হইতে পারে না।

নিয়মানুকূল ব্যবসায় নিন্দনীয় নহে

যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালিত হয়, এবং অন্যের উপাসনা তুচ্ছ করিয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা নিন্দনীয় বৃত্তি হওয়া

দূরে থাকুক, অতি প্রশংসনীয় পরম-পবিত্র ধর্ম্ম। স্বহস্তে হল-চালনা করা দূষ্য নহে, করপত্র ব্যবহার করাও নিন্দনীয় নহে। এতদ্দেশীয় বিষয়ী লোক, যে সমস্ত ঔপাধিক-লাভ-দায়িকা অর্থকরী বৃত্তিকে প্রধান বৃত্তি বলিয়া জানেন, সে সমুদায়ই দূষ্য ও নিন্দনীয়। ন্যায়-পথাশ্রয়ী সরল স্বভাব কৃষক অন্যায়োপজীবী লক্ষপতি অপেক্ষা সহস্রগুণে আদরণীয় ও পূজনীয়। এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ কৃষকের বলীবর্দ্দ বিশিষ্ট পবিত্র পর্ণকুটীরের নিকট অধর্ম্মোপজীবী লক্ষপতির অশ্বরথ-শোভিনী চিত্তচমৎকারিণী প্রাসাদ-শ্রেণী মলিন বোধ হয়। এরূপ ঋজু-স্বভাব বুভুক্ষু কৃষকের কদলীপত্রস্থিত নিরুপকরণ তণ্ডুলগ্রাস, পরধনাপহারী বিভবশালী ধনাঢ্যদিগের স্বর্ণপাত্রারূঢ় সৌগন্ধ-পরিপূর্ণ সুস্নিগ্ধ ভোগ অপেক্ষা সহস্রগুণে বিশুদ্ধ ও তৃপ্তিকর।

—পরন্তু অতি প্রশংসনীয় ও পবিত্র

বহুকালাবধি এদেশীয় লোকের কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে, তাঁহারা ন্যায়-বিরুদ্ধ কুৎসিত কৌশলে অর্থোপার্জ্জন করিবেন, পরোপজীব্য অবলম্বন করিয়া তৃণ অপেক্ষাও লঘু হইবেন, অনাহারে শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করিবেন, তথাচ ঈশ্বরানুমত, ধর্ম্মানুগত শিল্পকর্ম্ম করিতে সম্মত হইবেন না।

ন্যায় পথাশ্রয়ীর শ্রেষ্ঠতা

নিয়মিত পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়োজনক ও সুখজনক বটে, কিন্তু উহার আতিশয্য অত্যন্ত অনিষ্টকর। বাস্তবিক লোকে নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহাদের উহা কষ্টদায়ক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। জনসমাজে এ বিষয়ে অতিশয় অব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা প্রতিদিবস ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ দণ্ড কর্ম্ম করিয়া, কষ্টে-সৃষ্টে দিনপাত করিতেছে, কেহ বা চারি দণ্ড কালও নিয়মিত পরিশ্রম করিতে স্বীকৃত নহে। কিন্তু এ উভয়ই অনিষ্টকর। পূর্ব্বেই লিখিত

নিয়মিত শ্রম—অনিয়মিতের অপকারিতা

হইয়াছে, সম্ভবমত পরিশ্রম যেমন আবশ্যক, অতিরিক্ত পরিশ্রম তেমনি গর্হিত। তাহাতে শরীর দুর্ব্বল হয়, অন্তঃকরণ নিস্তেজ হয়, সুতরাং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলও তেজোহীন হইতে থাকে। মনুষ্য কেবল এরূপ করিয়া আয়ুক্ষয় করিবেন, ইহা কদাচ পরমপিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নয়। তিনি আমাদিগকে নানাপ্রকার শুভকরী শক্তি প্রদান করিয়াছেন; অতএব প্রতিদিবস তৎসমুদায় সঞ্চালন করিয়া, শরীর ও মন সুস্থ ও সতেজ করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিবসই জীবিকা-নির্ব্বাহে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করিয়া অবশিষ্ট কাল জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পবিত্র প্রমোদ-সম্ভোগে যাপন করা বিধেয়।

সামাজিক ব্যবস্থা-প্রণালীর দোষ

যে জনসমাজে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ভোগ-বিলাসী ব্যক্তিরা সংসারে কোন প্রকার উপকার না করিয়া, স্তূপাকার ভোজ্য-ভোগ্য সামগ্রী ভোগ করিতেছেন এবং নির্ধন লোক তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-সেব্য সমাধার্থে প্রতিদিন ত্রিশ চল্লিশ দণ্ড পরিশ্রম করিয়া শরীরপাত করিতেছে, তাহার ব্যবস্থা-প্রণালীর কোন না কোন স্থানে কোন প্রকার দোষ অবশ্যই প্রবিষ্ট আছে, তাহার সন্দেহ নাই। তাহারা পর্য্যায়ক্রমে ক্লেশ ও নিদ্রা এই দুই বিষয়ের সেবা করে। তাহাদের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি চির-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে। অন্য অন্য শিল্পযন্ত্রের ন্যায় তাহাদিগকেও এক একটী যন্ত্র বলিলে বলা যায়। যদি জ্ঞান-বৃদ্ধি ও ধর্ম্মোন্নতি করাই মনুষ্যের প্রধান কল্প হয়, তাহা হইলে জনসমাজে এতাদৃশ বিশৃঙ্খলা অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

আহার-পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন কিঞ্চিৎকাল কর্ম্ম করা আবশ্যক বটে, কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মানুসারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন থাকিয়া শরীর সুস্থ রাখিবার

নিমিত্ত যে প্রমাণ ভোজ্য-ভোগ্য সামগ্রী প্রয়োজনীয়, তাহা উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিতে অধিক পরিশ্রম আবশ্যক করে না। মনুষ্যেরা আপনাদের অতি প্রবল ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ অনাবশ্যক দ্রব্যও আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে। সেই সমুদায় আহরণার্থ ভোগাভিলাষীদিগকেও অধিক অর্থব্যয় করিতে হয় এবং যাহারা উৎপন্ন ও প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। যদি লোকে ঐ সমস্ত নিষ্প্রয়োজন দ্রব্য লাভের অভিলাষ পরিত্যাগ করে এবং সকলে প্রতিদিবস ন্যূনাধিক এক প্রহর কাল পরিশ্রম করে, তাহা হইলে সুখ-স্বচ্ছন্দে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইবার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

সর্ব্ববিধ লোকের পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য

সকলের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে সাধ্যানুসারে কর্ম্ম করা উচিত এবং যে সমস্ত জীব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের স্বীয় সমাজের কোন না কোন প্রকার হিতকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকা বিধেয়—এই কল্যাণকর নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখা যায়। জগৎপিতা জগদীশ্বর যাবতীয় জন্তুকে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী সামর্থ্য দিয়াছেন। সকল সিংহই আপন আহার অন্বেষণ করে, এবং প্রত্যেক বীবরই নিজ নিকেতন-নির্ম্মাণ-বিষয়ে সহায়তা করে। যে সকল জীব শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া এক এক শ্রেণী এক এক কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাদের মধ্যে একটিও বিনা পরিশ্রমে কালহরণ করে না; সুতরাং অন্যদীয় আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না। মধুমক্ষিকাদির মধ্যে কতকগুলি মধূত্থ আহরণ করে, অপর কতকগুলি মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, অবশিষ্ট কতকগুলি মধু সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত থাকে। কি দুঃখের বিষয়! মনুষ্যেরা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ব্যাপার দেখিয়াও, পরমেশ্বরের স্পষ্টাভিপ্রায় অবগত হন না এবং

পরিশ্রম সাহচর্য্যের আবশ্যকতা ও উদাহরণ

আপন প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়াও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করেন না।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয়, উল্লিখিত ভোগাভিলাষী মহাশয়দিগের এবং পরোপজীবী নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিদিগের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে, তাহাদের পোষণার্থ অপর ব্যক্তিদিগকে তত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুরূপ কর্ম্ম করিলে সকলের ভারের লাঘব হয়। কিন্তু কেবল স্বহস্তে হল-চালন ও খনিত্র ব্যবহার না করিলে যে সংসারের উপকার করা হয় না, এমত নয়। ধনশালী মহাশয়েরা আপনাদের অর্থব্যয় ও বুদ্ধি পরিচালন করিয়া, সহস্র প্রকারে লোকের উপকার করিতে পারেন। তাঁহাদের এই উভয় উপায় দ্বারা জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক।

প্রকারভেদে পরিশ্রম আচরণীয়

কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম, উভয়ই হিতকারী। যাঁহারা বুদ্ধিবলে নূতন শিল্পযন্ত্র প্রস্তুত ও তৎসম্বন্ধীয় কোন অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারের মহোপকারী মহাশয় মনুষ্য। যাঁহারা বাচনিক উপদেশ দিয়া অথবা গ্রন্থ রচনা করিয়া, লোকের ভ্রম নিবারণ, চরিত্র-সংশোধন ও জ্ঞানোন্নতি সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহারা ভূলোকের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। যেমন উষাকালে সুকুমার অরুণ-প্রভা পূর্ব্বদেশে প্রকাশিত হইয়া, উত্তরোত্তর পশ্চিম প্রদেশে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ ঐ সমস্ত মহানুভব মনুষ্যের জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রভাব ক্রমে ক্রমে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইতে থাকে।

কায়িক ও মানসিক শ্রম সমভাবে উপকারী

ধনশালী মহাশয়েরা যে, স্বীয় ভোগাভিলাষ খর্ব্ব করিয়া জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনার্থে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করেন না, এটি তাঁহাদের

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-সমূহের অতিমাত্র উত্তেজনারই কার্য্য। ইহাকে তাঁহাদের অত্যন্ত অযশস্কর অধর্ম্মের মধ্যে গণিত করিতে হয়। তাঁহাদের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায় প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির নিকটে পরাভূত হইয়া রহিয়াছে। এদেশীয় ধনবান্ ব্যক্তিরা অনেকেই যাদৃশ অলীক ব্যাপারে অর্থব্যয় করেন, এবং যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সমধিক সময় নষ্ট করিয়া থাকেন, তাহা স্মরণ হইলে, দুঃসহ দুঃখতাপে তাপিত হইতে হয় এবং একেবারে স্বদেশের প্রতি বিরক্ত হইয়া স্বজাতীয় লোককে ধিক্কার দিতে হয়।

ধনশালীর শ্রম-বিমুখতা—ইহার কুফল

বিদ্যা-শিক্ষা

বিদ্যা অমূল্য ধন। বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া আপনার ও অন্যের দুঃখ-হ্রাস ও সুখবৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন, কি বালক, কি বৃদ্ধ—সকলেরই বিদ্যানুশীলন করা উচিত। পর্ব্বতনিবাসী অসভ্য লোকদিগের ও সর্ব্বদেশীয় ইতর লোকদিগের অবস্থা যে এত মন্দ, বিদ্যাশিক্ষা না করাই তাহার প্রধান কারণ। কিরূপে শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা যায়, কিরূপে পরিবার প্রতিপালন ও সন্তানগণকে শিক্ষা দান করিতে হয়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি স্বজনবর্গের প্রতি এবং আত্মীয়, বন্ধু ও অপর সাধারণ সকলের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে কৃষি ও বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ

পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার আদর্শ

করিতে হয়, কিরূপেই বা রাজ্য-পালন ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হয়, এই সমস্ত বিষয় বিদ্যানুশীলন ব্যতিরেকে সুচারুরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। দেখ, ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় সুসভ্য জাতীয়েরা বিদ্যাবলে আপনাদের অবস্থা কত উন্নত করিয়াছেন। তাঁহারা বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান ও বাষ্পীয়-পোত প্রস্তুত করিয়া ভূমণ্ডলের সকল ভাগেই গমনাগমনপূর্ব্বক বাণিজ্য করিতেছেন; দ্রুতগামী বাষ্পীয় রথ নির্ম্মাণ করিয়া, তদ্দ্বারা এক মাসের পথ এক দিবসে ভ্রমণ করিতেছেন; ব্যোমযান অর্থাৎ বেলুন-যন্ত্রে আরোহণ করিয়া, আকাশ মার্গে উড্ডীয়মান হইতেছেন; দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি দৃষ্টি করিয়া, তাহাদের আকারাদি নিরূপণ করিতেছেন; নানাপ্রকার শিল্পযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও অন্য অন্য উত্তম সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছেন, এবং প্রশস্ত পরিষ্কৃত রাজ-পথ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া, আপনাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহারা নদীর উপরিভাগে সেতু ও তাহার নিম্নভাগে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া এবং নদী প্রবাহের উপরিস্থিত সেতু সমূহের উপর দিয়া, নদীর জল চালিত করিয়া কি আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্যই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বুদ্ধিবলে পৃথ্বীতল দ্বিভাগ করিয়া সাগরে সংযোগ করিয়া দিয়াছেন এবং পর্ব্বতশ্রেণীর নিম্নদেশ দিয়া সুবিস্তৃত রাজপথ খনন ও তাহাতে বাষ্পীয় রথ চালন করিয়া, শিল্প-কৌশলের অদ্ভুত মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রতীচ্যের আদর্শ গ্রহণ

বিদ্যা-শিক্ষায় সুখও বিস্তর। বিদ্যা-বলে যে সমস্ত আশ্চর্য্য বিষয় নিরূপিত ও অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে, পুলকিত হইতে হয়। পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে একখানি রূপার থালার ন্যায় দেখায়; কিন্তু বাস্তবিক উহা পৃথিবীর তুল্য এক প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড। উহাতে

অনেক বৃহৎ পর্ব্বত আছে। সূর্য্যকে এখান হইতে এত ছোট দেখায় বটে, কিন্তু উহা পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দ লক্ষ সাত হাজার এক শত চব্বিশ গুণ বড়। নক্ষত্র সকল দেখিতে অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু উহারা এক এক প্রকাণ্ড সূর্য্যস্বরূপ; গগনমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও এক এক অদ্ভুত জড়ময় বস্তু, অন্তরীক্ষে অতি দ্রুতবেগে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে; যখন আমাদের নিকটবর্ত্তী হয়, তখনই আমরা দেখিতে পাই। এই সমস্ত আশ্চর্য্য বিষয় অধ্যয়ন করিতে করিতে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইতে থাকে।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠতা ও আবশ্যকতা—জ্যোতির্ব্বিদ্যা

পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি প্রাণীদিগের বৃত্তান্ত অবগত হওয়াও অতুল আনন্দের বিষয়। পুরুভুজ-নামে এক প্রকার কীট আছে, তাহার শরীর কর্ত্তন করিয়া যত খণ্ড খণ্ড করা যায়, তাহার এক এক খণ্ড এক একটি পুরুভুজ হইয়া উঠে; শীত-প্রধান উত্তর-সমুদ্রের তীরে শুক্লভল্লুক নামে এক প্রকার ভল্লুক আছে, তাহাদিগকে সতত বরফের উপর থাকিতে হয়, এই নিমিত্ত করুণাময় পরমেশ্বর তাহাদিগের পদ-তলে কতকগুলি লোম প্রদান করিয়াছেন। বীবর নামে এক প্রকার পশু আছে, তাহারা গৃহ-নির্ম্মাণ ও সেতুবন্ধন-বিষয়ে অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। বাবুই পক্ষীর কুলায় ও মধুমক্ষিকার মধুক্রম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, চমৎকৃত হইতে হয়।

প্রাণী-বিদ্যা

বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্-বিষয়ক বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, কত কত অদ্ভুত ব্যাপার অবগত হইয়া পুলকিত হইতে হয়। মরুভূমি বিশেষে পান্থ-পাদপ নামে একরূপ বৃক্ষ হয়, তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিলে, অতীব নির্ম্মল জল নিঃসৃত হইয়া থাকে। তৃষ্ণাতুর পথিকেরা সেই জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। আমেরিকার

উদ্ভিদ-বিদ্যা

দক্ষিণ খণ্ডে গো-পাদপ নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহার স্কন্ধ হইতে সুস্বাদু সুগন্ধ পুষ্টিকর দুগ্ধ নির্গত হয়। তথাকার অনেক লোক তাহা পান করে ও তাহাতে অন্য অন্য খাদ্য-দ্রব্য সিক্ত করিয়া ভক্ষণ করে। আফ্রিকা-খণ্ডে মেদবৃক্ষ নামে আর এক প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে অত্যুত্তম নবনীত প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাতে ভক্ষ্য-দ্রব্য পাক করিলে, অতিশয় সুস্বাদু হয়। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে পেরুদেশের অন্তর্গত ময়োবম্বা নগরের নিকট বর্ষণ-বৃক্ষ নামে একরূপ বৃক্ষ আছে, তাহা হইতে অপর্য্যাপ্ত জল-বর্ষণ হয়। এই সকল প্রীতিকর বিষয় পাঠ করিলে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ প্রফুল্ল না হয়!

পৃথিবীস্থ নির্জীব জড় পদার্থের গুণ ও সজীব পদার্থের সহিত তাহাদের সম্বন্ধের বিষয় অনুশীলন করিলেই বা কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় জানিতে পারা যায়। হীরক ও কয়লা আপাততঃ এত ভিন্ন বোধ হয়; কিন্তু এই দুইই এক পদার্থ। একস্থানের একরূপ মৃত্তিকা হইতে কত প্রকার লতা ও গুল্ম উৎপন্ন হইতেছে; শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি কত বর্ণের কত প্রকার মনোহর পুষ্প উদ্ভূত হইতেছে এবং অম্ল, মধুরাদি নানা রস সংযুক্ত কত প্রকার ফল মূল ও শস্য সমুৎপন্ন হইতেছে। শরীরের সমুদয় শোণিতই একরূপ, কিন্তু কেমন আশ্চর্য্য নিয়মানুসারে মেদ, মাংস, অস্থি, মস্তিষ্ক প্রভৃতি শরীরস্থ সমস্ত বস্তুই সেই একরূপ শোণিত হইতে উৎপাদিত ও তাহাতেই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই সমস্ত অসামান্য বিষয়ের এবং মেঘ ও বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত, শিলা ও বরফ, শীত ও গ্রীষ্মাদি ঋতু সমুদায়ের পরিবর্ত্তন ইত্যাদি প্রত্যক্ষ-গোচর বিবিধ বস্তু ও বিবিধ বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়া, অনুপম আনন্দের বিষয়। সে আনন্দের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-সুখ তুচ্ছ বোধ হয়।

জড়-বিজ্ঞান প্রভৃতি

জগৎপাতা জগদীশ্বরের এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, অপরিসীম জ্ঞান ও অপার মহিমার সহস্র সহস্র সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রতীত হয় ও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও পবিত্র প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া, ভক্তজনের অন্তঃকরণ পরম পরিশুদ্ধ আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইয়া থাকে।

সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সুখের তারতম্য

জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি! বিদ্যাহীন মনুষ্য, মনুষ্যই নয়। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানব-জাতি পশু-জাতি অপেক্ষায় যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞান-জনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়-জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষা তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্লযামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট সুখে ও নিকৃষ্ট কার্য্যে নিবৃত থাকিয়া, নিকৃষ্ট-সুখাধিকারী নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে গণনীয় হয়, সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞান-জনিত ও ধর্ম্মোৎপাদ্য পরিশুদ্ধ সুখ-সম্ভোগ করিয়া, আপনাকে ভূ-লোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিতে থাকেন। এই উভয়ের মনের অবস্থা ও সুখের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উভয়কে এক জাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া সুকঠিন।

জ্ঞানের মহিমা

অশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ আবাল-বার্দ্ধক্য প্রায় অধম কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। তাহাকে উদরান্ন আহরণার্থ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরিচালন-পূর্ব্বক শারীরিক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হয়; কিন্তু তাহার প্রধান মনোবৃত্তি-সমুদায় চির-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া অথবা অযথাবিধানে পরিচালিত হইয়া, অকর্ম্মণ্য ও দোষান্বিত হইতে থাকে। জীবিকা-সংক্রান্ত কার্য্যই তাহার পক্ষে প্রধান কার্য্য, এবং প্রায়ই বর্ত্তমান কাল ও সন্নিহিত বিষয় মাত্র তাহার আলোচনার বিষয়। এরূপ ব্যক্তি স্বদেশ ব্যতিরিক্ত সর্ব্বদেশের সকল বিষয়েই প্রায় অনভিজ্ঞ। হয়ত, অবনিমণ্ডলকেই অসীম বলিয়া বিশ্বাস করে। পৃথিবীর আকৃতি কি প্রকার ও আয়তন বা কত, তাহার জল-স্থলের অবস্থাই বা কীদৃশ, তাহার অন্তঃপাতী কোন্ দেশের কিরূপ শোভা, কোন্ দেশে কিরূপ লোকের অধিবাস, তাহাদিগের আচার-ব্যবহার এবং ধর্ম্ম ও রাজনীতিই বা কি প্রকার, নদ, হ্রদ, সমুদ্র, সরোবর, দ্বীপ, প্রায়োদ্বীপাদিই বা কিরূপ ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপিত, এবং কিয়দ্-গুণাবলম্বী কত প্রকার ভূ-চর, খেচর ও জলচর প্রাণীতেই বা পরিপূর্ণ—এ সকল বিষয়ে সে ব্যক্তি, বন-চারী সিংহ ও শাখারূঢ় বিহঙ্গ অপেক্ষায় অধিক অভিজ্ঞ নয়। মানব-সমাজ কীদৃশ সামাজিক নিয়মে নিয়মিত হইতেছে, পূর্ব্বাবধি পৃথিবীতে সংগ্রাম-সঙ্ঘটন, ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন, রাজ বিপ্লব-সংঘটন প্রভৃতি কত কত মহানর্থকর ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়া আসিয়াছে, এবং মানব-জাতি বিজ্ঞানের কিরূপ প্রভাব ও শিল্পকার্য্যের কিরূপ উন্নতি-সম্পাদন করিয়া, উত্তরোত্তর অলক্ষিত-পূর্ব্ব অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি-সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাহার কিছুই অবগত নয়। সে স্বকীয় নিবাস-ভূমি ভূমণ্ডলের বিষয়ে যেমন অজ্ঞ, অপরিসীম গগন-মণ্ডলের বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক। পৃথিবীর অপেক্ষায় বহু সহস্র ও

অশিক্ষিতের অজ্ঞতা

বহু লক্ষ গুণ বৃহত্তর যে সমস্ত জ্যোতিষ্মান্ মণ্ডল নভোমণ্ডলে প্রচণ্ড-বেগে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহার বিষয় কিছুই জ্ঞাত নয়। তৎসমুদায় জানিবার নিমিত্ত তাহার অন্তঃকরণে একবারমাত্রও কৌতূহল-শিখা উদ্দীপ্ত হয় না। দীপশিখা-সদৃশ প্রতীয়মান নক্ষত্র-সমুদায় ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎ হউক, দূরস্থ হউক আর সমীপস্থ হউক, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা তাহার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। এ সকল বিষয়ে তাহার ভ্রূ-ক্ষেপও নাই। বিশ্বপতির বিশ্ব-রচনা-সংক্রান্ত যে সমস্ত পরম আশ্চর্য্য বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, যে সমস্ত পরম কল্যাণকর প্রাকৃতিক নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং যাবতীয় প্রাকৃতিক বিস্তার যাদৃশ শ্রী-বৃদ্ধি হইয়াছে, ও কি ভৌতিক, কি শারীরিক, কি মানসিক, সর্ব্বশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত অভিনব তত্ত্ব দিন দিন উদ্ভাবিত হইয়া, বিশ্ববিধাতার যশঃসৌরভ বিস্তার করিতেছে, সে সমুদায় সে ব্যক্তির গোচর ও হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক নিয়মের অনুশীলনে যে কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য আনন্দের অনুভব হয়, সে জন্মাবচ্ছিন্নে তাহার স্বাদগ্রহণ-করণে সমর্থ হয় না।

সুশিক্ষিত ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করিয়া, পরম পবিত্র সুখার্দ্র-হৃদয়ে যেরূপ পরমাদ্ভুত পরিশুদ্ধ জ্ঞানারণ্যে বিচরণ করেন, অশিক্ষিত ব্যক্তি স্বপ্নেও একবার তথায় পদার্পণ করিতে পারগ হয় না।

অশিক্ষিতের জ্ঞানের প্রসার

সে ব্যক্তি বিদ্যা-মন্দিরের দ্বারস্বরূপ ব্যাকরণ-বিদ্যাকেই যথার্থ বিদ্যা বোধ করে; জন্মপত্রিকা রচনা ও শুভাশুভ দিনক্ষণ-গণনাকেই প্রকৃত জ্যোতির্ব্বিদ্যা বলিয়া প্রত্যয় করে; অশৌচ ব্যবস্থা ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধানকেই বাস্তবিক ধর্ম্মোপদেশ বলিয়া বিবেচনা করে এবং মনঃকল্পিত পৌরাণিক ইতিহাসকেই ভূলোকের যথার্থ ইতিহাস বলিয়া প্রত্যয় করে। স্বদেশীয় শাস্ত্রে যে বিষয়ে যেরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং স্বদেশ-মধ্যে যে কার্য্যে যেরূপ রীতি প্রচলিত আছে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট

বলিয়া বিশ্বাস করে। পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষেরা যে প্রাচীন পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাহাই সেই ব্যক্তির মতে সর্ব্বোত্তম। তাহা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ ও একান্ত অসঙ্গত হইলেও, তাহার অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন-সহ নয়। স্বজাতির দোষ দর্শন ও অপর জাতির গুণাবলোকন-বিষয়ে তাহার নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত হইবার নয়। তাহার মতানুসারে আমাদের বুদ্ধিরও আর উন্নতি হইবে না, বিদ্যারও আর উন্নতি হইবে না, ধর্ম্মেরও আর উন্নতি হইবে না, সুখেরও আর উন্নতি হইবে না। তাহার অভিপ্রায় এই, আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, অতএব উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকিব।

অশিক্ষিতের কু-সংস্কার

করুণাময় পরমেশ্বর বিশ্বরাজ্য-পরিপালনার্থ যে সমস্ত মঙ্গলময় নিয়ম সংস্থাপন করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, অশিক্ষিত ব্যক্তি সে সমুদায় অবগত নয়। তাহার অজ্ঞানাবৃত অন্তঃকরণ সর্ব্বস্থানেই নানা বিভীষিকা কল্পনা করে। ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি অবাস্তবিক পদার্থ তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রে নিরন্তর বিচরণ করে। সে ব্যক্তি সদাই শঙ্কিত, নিয়তই উৎকণ্ঠিত এবং কত প্রকার কুসংস্কারপাশে বদ্ধ হইয়া থাকে। শুভাশুভ দিন-ক্ষণ তাহার কতই আশঙ্কা ও কতই উদ্বেগ উৎপাদন করে। বিহঙ্গ-বিশেষের স্বর-বিশেষই বা কত ত্রাস ও কত উৎকণ্ঠা উপস্থিত করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত অসত্য বিষয়ে তাহার যেরূপ বিশ্বাস আছে, তাহা কদাচ বিচলিত হইবার নয়; কিন্তু বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা যে সমস্ত যথার্থ বিষয় নিরূপিত হইয়াছে ও যে সকল অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার প্রত্যয় জন্মান সুকঠিন কর্ম্ম। লঙ্কাদ্বীপ মনুষ্যের নিবাস-ভূমি ও সকলেরই গম্য স্থান, ভূ-মণ্ডলের যে ভাগে আমাদিগের বাস, তাহার বিপরীত ভাগেও অন্য লোকের বসতি আছে, অবনি-মণ্ডল শূন্যেতেই অবস্থিত, জন্তু-

বিশেষ বা বস্তুবিশেষের উপর অধিষ্ঠিত নয়, পৃথিবীর স্থলভাগ জলময় সমুদ্রে পরিবেষ্টিত বটে, কিন্তু ক্ষীর-সমুদ্র, সুরা-সমুদ্র, ইক্ষু-সমুদ্র প্রভৃতি পুরাণোক্ত সপ্তসমুদ্রের অস্তিত্ব-ঘটিত যত উপাখ্যান প্রচলিত আছে, সর্ব্বৈব মিথ্যা ; চন্দ্র সজীব পদার্থ নয়, এবং নিজে তেজোময় নয়, উহার উপর সূর্য্যের আলোক পতিত হয় বলিয়া, তেজোময় বোধ হয় ; চন্দ্রমণ্ডলের যে সমস্ত কলঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হরিণ-শিশু নয়, অত্যন্ত গভীর গহ্বর ; সেই সকল গহ্বরে সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না ; সূর্য্যমণ্ডল ভূ-মণ্ডল অপেক্ষা চৌদ্দ লক্ষ গুণ বৃহৎ, রথোপরি স্থাপিত নয়, অশ্বকর্তৃকও আকৃষ্ট হয় না ; সূর্য্যকে যে প্রতিদিন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে দেখা যায়, তাহা বাস্তবিক সূর্য্যের গতি নয়, পৃথিবী নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে, এই নিমিত্ত সূর্য্যের ঐরূপ গতি প্রতীয়মান হয় ; সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না, পৃথিবী প্রতিঘণ্টায় প্রায় ত্রিশ সহস্র ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া এক বৎসরে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে,—ইত্যাদি অবধারিত তত্ত্ব-সমুদায় অশিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসাধ্য বোধ হয়। এই সমস্ত বিষয় অবাস্তবিক উপন্যাস অপেক্ষাও তাহার অসম্ভব বোধ হয়। যাহার অন্তঃকরণ ঘোরতর অজ্ঞান-তিমিরে এরূপ আচ্ছন্ন রহিয়াছে, জ্ঞানোৎপাদ্য পরমাদ্ভুত বিশুদ্ধ সুখসম্ভোগে তাহার অধিকার হইবার বিষয় কি ? বিশ্বপতির বিশ্বরচনামধ্যে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, আশ্চর্য্য কৌশল, অপার মহিমা ও অত্যন্ত করুণার অসংখ্য নিদর্শন দর্শন করিয়া, পরমেশ্বর-পরায়ণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির হৃদয়মধ্যে যেরূপ চমৎকার-সংবলিত আনন্দ-রসের সঞ্চার হয়, অশিক্ষিত অজ্ঞানাবৃত ব্যক্তির সে রসের স্বাদ-গ্রহে সমর্থ হইবার সম্ভাবনা কি ?

কিন্তু সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ব্যক্তির প্রশস্ত হৃদয়, পরম পরিশুদ্ধ বিদ্যালোক লাভ করিয়া কি অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত হইয়া থাকে ! তাঁহার অন্তঃকরণ অকারণে সঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইবার নয় ; তিনি বিশ্বপতির

বিশ্ব-রাজ্যের কৌশল-চক্রের মর্ম্মাবধারণ করিয়া তদীয় কার্য্য প্রণালী অসংশয়িত চিত্তে সুস্পষ্ট দেখিতে পান। তিনি ভৌতিক, শারীরিক, মানসিক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়মের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া, যে কার্য্যের যে কারণ, তাহা সুন্দররূপে অবগত হইয়া অকুণ্ঠিতহৃদয়ে সুখে কালহরণ করেন। তিনি আর দেব-বিশেষকে রোগবিশেষের অধিপতি বলিয়া প্রত্যয় করেন না, মানব দেহকে প্রেতবিশেষের আশ্রয় বলিয়া বিশ্বাস করেন না, ব্যক্তি-বিশেষের অভিসম্পাতকে অপর ব্যক্তির অনিষ্টপাতের হেতু বলিয়া স্বীকার করেন না, এবং অগ্নি-দীপন, বারি-বর্ষণ ও বায়ু-সঞ্চারণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিষ্ঠাত্রীও কল্পনা করেন না। ঐ সমস্ত কার্য্য পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকার নিয়মানুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং সেই সকল নিয়ম জগতের কল্যাণ-মাত্র সাধনার্থেই তাহাকর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহা দেদীপ্যমান দেখিয়া অসঙ্কুচিত-চিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অকারণ উৎকণ্ঠা, অমূলক আশঙ্কা, তাঁহার অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারে না। প্রসাদরূপ পবিত্র সমীরণ, তাঁহার চিত্তে সতত সঞ্চরণ করিতে থাকে।

সুশিক্ষিতের হৃদয় ও মনের প্রাসধ্য

এতাদৃশ বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসংখ্য বিষয়ের অসংখ্য ভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় ও মনোহর ব্যাপার তাঁহার বোধ-নেত্রের গোচর থাকে, তাহা জানিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি নর-লোক-নিবাসী হইয়াও, কোন চমৎকার-ময় সুচারু স্বর্গ-লোকে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নয়। তিনি আপনার মানস-ক্ষেত্রে এককালে সমগ্র ভূ-মণ্ডল পর্য্যবলোকন করিতে পারেন। মহার্ণব-পরিবৃত স্থলভাগ, সমুদ্রস্থিত দ্বীপপুঞ্জ, চতুর্দ্দিগ্‌বাহিনী

তাঁহার হৃদয়ে অসংখ্য ভাবের বিকাশ

নদী ও উপনদী, স্থানে স্থানে নীরদ-ধারিণী পর্ব্বত-শ্রেণী, কন্দর ও ভৃগুদেশ, শৃঙ্গ ও প্রস্রবণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জল-প্রপাত, উষ্ণ প্রস্রবণ, তুষার-শৈল, তুষার-দ্বীপ, গন্ধক-দ্বীপ, প্রবাল-দ্বীপ ইত্যাদি ভূ-তলস্থ সমস্ত পদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতে পারেন। তিনি কল্পনা-পথ অবলম্বন করিয়া, অগ্নিময় আগ্নেয় গিরির শৃঙ্গ-দেশে আরোহণ করিতে পারেন, তৎসংক্রান্ত ভূগর্ভ-বিনির্গত গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিতে পারেন এবং তদীয় শিখর-দেশ হইতে অগ্নিময়ী নদীস্বরূপ ধাতু-নিঃস্রব নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন; তিনি মানস-পথে-পর্য্যটনপূর্ব্বক হিমগিরি-শিখরে উত্থিত হইয়া, নতনয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, আপনার চরণতলে বিদ্যুল্লতা জ্বলিত হইতেছে, মেঘাবলি ধ্বনিত হইতেছে, জলপ্রপাত ত্বরিত হইতেছে এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হইয়া, অরণ্য সমুদায় উৎপাটন করিতেছে ও সমুদ্র-সলিলে করালতম কল্লোল কোলাহল উৎপাদিত করিয়া, ত্রাস ও সঙ্কট উপস্থিত করিতেছে। সর্ব্বকালের সমস্ত ঘটনাই তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। তিনি মনে মনে কত রাজ্য ও রাজার সংসার দেখেন, কত বীর ও বিগ্রহের বিষয় বর্ণন করেন এবং কত স্থানের কত প্রকার রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিয়া সুখী থাকেন। যে সময়ে তিনি মিত্রগণের সহিত সহবাস ও সদালাপ করেন, তখন দেশ-বিদেশের জল, বায়ু শীত, গ্রীষ্ম, গ্রাম, নগর, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, শাসন, বিদ্যা, ব্যবসায়, সুখ, সভ্যতা, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ্, ধাতু প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, পুলকে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। যে সময়ে তিনি গ্রাম ও গহন ভ্রমণ করেন, তখন বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির কেবল পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাহাদের মূল, স্কন্ধ, শাখা, পত্র,

—নৈসর্গিক বিষয়ে

—ইতি-কথায়

—বিবিধ বিদ্যা বিষয়ে

পুষ্প, ফলাদির অভ্যন্তরে কীদৃশ কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে ও কতপ্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়াই বা নির্ব্বাহিত হইতেছে, এবং কোন্ জাতি দ্বারা কিরূপ উপকারই বা উৎপন্ন হইতে পারে, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া চমৎকার-সংবলিত সুখামৃতরসে অভিষিক্ত হন, এবং প্রত্যেক বিষয়ের অনুশীলন করিবার সময়ে করুণাময় পরমেশ্বরের পরমাদ্ভুত কৌশল প্রতীতি করিয়া, কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে মনের সহিত ধন্যবাদ করেন। যে তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথ-সময়ে অজ্ঞ লোকেরা অশেষবিধ বিভীষিকা ভাবনা করিয়া ভীত হইতে থাকে, সে সময়ে তিনি নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক গগন-মণ্ডলে নয়নদ্বয় নিয়োজন করিয়া, অসীম বিশ্ব-ব্যাপারের অনুশীলনে অনুরক্ত হইতে পারেন। আমরা যে প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডের উপর অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, তাহা, গিরি, কানন, পশু, পক্ষী, মেঘ ও বায়ু-সংবলিত অপরিসীম আকাশ-মার্গে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া, অন্তঃকরণ বিকসিত করিতে পারেন। তিনি বাসনা-বর্ত্মে চন্দ্র-মণ্ডলে উপনীত হইয়া, উচ্চ পর্ব্বত, গভীর গহ্বর, উন্নত শিখর, গিরিচ্ছায়া, বন্ধুর ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন। ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া চন্দ্র-চতুষ্টয়-পরিবৃত বৃহস্পতি, বৃহত্তর চন্দ্রাষ্টক ও বিশাল-বলয়-ত্রয়-পরিবেষ্টিত শনৈশ্চর, ছয় চন্দ্র-সহকৃত হর্শেল গ্রহ এবং চন্দ্রদ্বয়-সংবলিত নেপচ্যুন নামক অপূর্ব্ব ভুবন দর্শন করিয়া পরম পুলকিত-চিত্তে বিচরণ করিতে পারেন। পরে গ্রহ-মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত প্রচণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল পশ্চাদ্ভাগে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সহস্র সহস্র কোটি কোটি নক্ষত্র-লোক অবলোকন করতঃ অশৃঙ্খল-বদ্ধ ও অক্লিষ্ট-পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় অসীম আকাশ-মণ্ডল পর্য্যটন করিতে পারেন। গগন-মণ্ডলের যাবতীয় ভাগ দূরবীক্ষণ-সহকারে মানব-জাতির নেত্র-গোচর হইয়াছে, তদূর্দ্ধ সমস্ত নভঃপ্রদেশ সংখ্যাতিরিক্ত পরমাদ্ভুত জীবলোকে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারেন, এবং অপার মহিমার্ণব মহেশ্বরের

—জ্যোতির্বিদ্যায়

অখণ্ড রাজত্ব সর্ব্বত্র প্রচারিত দেখিয়া, ভক্তি-রসাভিষিক্ত-পুলকিত-হৃদয়ে অর্চ্চনা করিতে পারেন।

তিনি কখনও বা গগন-মণ্ডলস্থ ভূরিসংখ্য বৃহদাকার পদার্থ দর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া, সূক্ষ্ম পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ-বাসনায় ধরাতলে অবতীর্ণ হইতে পারেন, এবং অণুবীক্ষণ-প্রদর্শিত অশেষবিধ অতি সূক্ষ্ম বস্তুর অশেষবিধ শোভা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতে পারেন। এরূপ সৌভাগ্যশালী বিদ্বান্ ব্যক্তি, জীবের শরীরে ও বৃক্ষের পল্লবে যেরূপ শোভা, যেরূপ শিল্প ও যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করেন, অণুবীক্ষণের সৃষ্টি না হইলে, তাহা মানবজাতির দৃষ্টি-পথে কদাচ আবির্ভূত হইত না। যে ব্যক্তি উক্ত যন্ত্র-সহকারে সে সমুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়া তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্ভাবনা নাই। বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক এক জলবিন্দুতে কোটি কোটি জীবের অবস্থান ও সঞ্চরণ দেখিয়া পুলকিত হইতে থাকেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যে স্থানে কিঞ্চিৎ কলঙ্ক-যুক্ত চিহ্নমাত্র বোধ হয়, তিনি সে স্থানে বৃহৎ অরণ্য দর্শন করেন। ইতর ব্যক্তিরা প্রজাপতির পক্ষ-সমূহে যে সমস্ত ক্ষুদ্ররেণু দৃষ্টি করে, তিনি তাহা বিহঙ্গগণের পক্ষ-সদৃশ সুরাগ-রঞ্জিত, সুচারু পক্ষসমূহ জানিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া থাকেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি রাজ্য-বিশেষের রাজধানী-বিশেষ যেরূপ জনাকীর্ণ বোধ করে, তিনি কণা-প্রমাণ স্থান তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক জীবে পরিপূর্ণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন। অশিক্ষিত ব্যক্তি যে স্থান জীব-শূন্য অকর্ম্মণ্য বোধ করে, তিনি সে স্থান জ্ঞান ও ক্রীড়া, রাগ ও বাসনা, সুখ ও সন্তোষের আধার বলিয়া প্রতীতি করেন, এবং প্রত্যেক অণু-প্রমাণ স্থান পরমেশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় অভাবনীয় কীর্ত্তিতে পরিপূরিত দেখিয়া, ভক্তি-সহকৃত পরমানন্দ-রসে অভিষিক্ত হইতে থাকেন।

শিক্ষিতের সূক্ষ্ম-দৃষ্টি

যে মহাত্মার অন্তঃকরণ, এতাদৃশ অতি মনোহর সুখরাজ্যে বিচরণ করিতে পারে, তাঁহার অনুভূত সুখ অজ্ঞানাবৃত অশিক্ষিত ব্যক্তির সুখাপেক্ষা অশেষগুণে উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। যদি মার্জ্জিত-বুদ্ধি-পরিচালনে সুখোদয় হয়, যদি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এবং সুন্দর ও মহৎ অশেষবিধ পদার্থ-চিন্তনে সুখ-সঞ্চার হয় এবং যদি মহিমার্ণব পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির ও অপার মহিমার অসংখ্য নিদর্শন-দর্শনে প্রগাঢ় সুখের উদ্ভব হয়, তবে জ্ঞানালোক-সম্পন্ন বিশুদ্ধচিত্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তির পরমোৎকৃষ্ট নিরুপম সুখের উপমা দিবার আর স্থল নাই, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

শিক্ষিতের সুখ নিরুপম

দয়া

পরের দুঃখ-মোচনে প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত জগদীশ্বর আমাদিগকে দয়া দিয়াছেন। দয়া অতি প্রধান ধর্ম্ম। যিনি কাহারও উপকার করেন, তিনি মনে মনে অতি পবিত্র অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, এবং যিনি উপকৃত হন, তিনি আসন্ন বিপদ্ বা উপস্থিত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

দরিদ্রদিগকে অর্থ দান করিলেই যে দয়া প্রকাশ হয়, অন্য প্রকারে হয় না, এমন নহে। প্রত্যুত দয়ালু ব্যক্তি সহস্র প্রকারে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অপর সাধারণের দুঃখ দূর করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন; পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির যত দূর সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, তাহার উপায় করা উচিত। জ্ঞানোপদেশ, ধর্ম্মোপদেশ, সদালাপ, সৎপরামর্শ

দান ইত্যাদি শুভ কর্ম্ম দ্বারা সকলকে সুখী করিবার চেষ্টা করা উচিত; কর্কশ বাক্য ও কর্কশ ব্যবহার দ্বারা অন্য লোককে নিরর্থক দুঃখিত করিতে না হয়, এ নিমিত্ত ক্রোধ সংবরণ এবং বিনয় ও শিষ্টাচার অভ্যাস করা উচিত। লোকের যথার্থ দোষ উল্লেখ করিবার সময়েও, রসনা হইতে নীরস শব্দ নিঃসরণ না করিয়া, দয়া ও বাৎসল্য-ভাবে প্রকাশ করা উচিত। পীড়িত লোকের নিকেতনে ও দরিদ্রদিগের কুটীরে উপস্থিত হইয়া, সাধ্যানুসারে তাহাদের ক্লেশ নিবারণ করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত। জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রচার করিবার নিমিত্ত একান্ত-মনে চেষ্টা করা, এবং সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকা উচিত।

দয়া ও দানের অভিনব প্রণালী

যিনি এইরূপ আচরণ করিয়া কাল হরণ করিতে পারেন তিনি ধন্য! তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হন; তিনি অনাথদিগের আশীর্ব্বাদ ও পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করেন; তাঁহার মানব জন্ম গ্রহণ করা সার্থক।

স্বপ্নদর্শন—বিদ্যাবিষয়ক

পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনা দর্শনার্থে পরম কৌতূহলী হইয়া, আমি কিয়ৎকালাবধি দেশ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং নানা স্থান পর্য্যটন-পূর্ব্বক এখন মথুরা-সন্নিধানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি। এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয়-প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশন-পূর্ব্বক সুললিত লহরী-লীলা অবলোকন করিতেছিলাম। তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরক-খণ্ড গগন-মণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে

লাগিল এবং তন্মধ্যে দিব্য-লাবণ্য-পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া, কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বিকিরণপূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া, স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ-বিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে ঊষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিল-তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল, কখনও গগনালম্বিত মেঘবিম্ব দ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া, অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া, স্ব স্ব স্থানে বিলীন হইল, এবং সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া, সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল।

এইরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া, আকাশ-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে, জগতের আদি অন্ত, কার্য্য কারণ, সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদায় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জল-কল্লোলের কলকল-ধ্বনি, বৃক্ষ-পত্রের শরশর-শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোল দ্বারা আমার পরম সুখানুভব হইয়া, মনোবৃত্তি-সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়ন-দ্বয় নিমীলিত করিয়া আমাকে অভিভূত করিল। আমার বোধ হইল, যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি! তন্মধ্যে কোন স্থানে কেবল নবীনদুর্ব্বাদল-পরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষসমূহ, কোথাও নদী বা নির্ঝর-তীরস্থ মনোহর কুসুমোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম। কৌতূহল-রূপ দীপ্ত হুতাশন ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; এবং তদনুসারে দিগ্‌বিদিক্ বিবেচনা না করিয়া যতদূর দৃষ্ট হইল, তত দূরই মহোৎসাহে ও পরমসুখে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম।

অবশেষে এক সরোবর-তীরস্থ অতি নিবিড় নির্জ্জন নিস্তব্ধ বন-খণ্ডে, এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রসন্ন বদন ও অলৌকিক শান্ত স্বভাব অবলোকনে, তাঁহাকে বন-দেবতা জ্ঞান করিয়া, বিহিত-বিধানে নমস্কার করিলাম ও তাঁহার পুনঃ পুনঃ দর্শন-লাভ দ্বারা নয়ন-যুগল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান থাকিলাম। দেখিলাম, তিনি আপনার কপোল-প্রদেশে হস্তার্পণ করিয়া, গগন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসার মানস করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার বাক্য-স্ফুরণ না হইতেই, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া, সাতিশয় আগ্রহ-প্রকাশ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"আমি তোমার মানস জানিয়াছি; আমার নাম,—বিদ্যা; তুমি যে স্থানে যাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহার এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। যাঁহারা এই রম্য কানন ভ্রমণ করিতে আইসেন, আমিই তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করি; চল, তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাই।"

আমি তাঁহার এই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, হৃষ্টমনে তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। উভয়-পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্যদেশ দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে, অরণ্যের শৈত্য, শোভা ও পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া, অতুলানন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"দেবি! এ স্থানের নাম কি এবং এখানে কি কি অপূর্ব্ব ব্যাপারই বা সম্পন্ন হইয়া থাকে?" তাহাতে তিনি সত্বর হইয়া উত্তর করিলেন,—"এ বিদ্যারণ্য, অরণ্যে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ আছে, অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই এখানে আগমন করেন; কিন্তু ইহার ফল ভোগ করা অতিশয় আয়াস-সাধ্য, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেহ কেহ দূর হইতে কোন বৃক্ষের উচ্চতা দর্শনমাত্রে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতিগমন করেন, কেহ কেহ বা ফল আহরণের প্রত্যাশায় কতক দূর

বৃক্ষারূঢ় হইয়াও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার এই রমণীয় কাননের ফল ভোগ করিয়াছেন, তিনি আর কদাপি তাহার আস্বাদন বিস্মৃত হইতে পারেন না। আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে সমুদায় দর্শাইতেছি, চল। ঐ যে সুদৃশ্য মনোহর বৃক্ষ সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছ, যাহার সতেজ শাখা-সমুদায় সুমধুর-রসস্ফীত-ফল-ভরে অবনত হইয়াছে. যাহার স্কন্ধ হইতে সুধাময় মধু-ধারা সকল অনবরতই ক্ষরিতেছে ও সুকুমার-মতি তরুণ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে, উহার নাম—'কাব্য-তরু'। দেখিয়াছ, অলঙ্কৃতি-রূপা কি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রমণীয় লতা তাহাকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বৃক্ষ হইতে কিছু দূরে, যে প্রকাণ্ড তেজস্বী বৃক্ষ দেখিতেছ, সুধীর প্রবীণ ব্যক্তিরা যাহার সেবা করিতেছেন, তাহার নাম—'জ্যোতিষ'।" ইহা কহিয়া বিদ্যাদেবী ঐ বৃক্ষের অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বাক্যাবসান হইলে আমি জ্যোতিষ-তরুর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত-সমুদায় এক এক বার প্রগাঢ়রূপ মনোনিবেশ-পূর্ব্বক ধ্যান-পরায়ণ হইতেছেন, আর বার প্রসন্ন-বদনে হাস্য করিয়া, অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। পরন্তু আর এক অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ঐ বৃক্ষের মূল মৃত্তিকা-সংযুক্ত নহে; আর এক প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই শেষোক্ত তরুর ন্যায় সারবান্ বৃক্ষ আর একটিও দৃষ্টি করি নাই। তাহার কোন স্থানের কণামাত্রও ক্ষয় নাই ও কুত্রাপি একটিমাত্র ছিদ্র কিংবা চিহ্ন নাই। আমি এই অদ্ভুত তরুর বিষয় সবিশেষ জানিবার জন্য পরম কৌতূহলী হইয়া, বিদ্যাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন,—"এই সারবান্ অক্ষয় বৃক্ষের নাম—'গণিত'। তুমি কেবল সম্মুখবর্ত্তী জ্যোতিষ-তরুর

মূল ইহাতে সংবদ্ধ দেখিতেছ, প্রদক্ষিণ করিয়া দেখ, অন্যান্য কত আশ্চর্য্য বৃক্ষ ও লতা ইহার স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া, তদুপরি প্রতিষ্ঠিত আছে।” বস্তুতঃ আমি বেষ্টন করিয়া দেখিলাম, তাঁহার কথা প্রামাণিক বটে; শাখা, প্রশাখা ও বৃক্ষরুহ সংবলিত এক গণিত-বৃক্ষ অর্দ্ধ কানন ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

তথা হইতে প্রস্থানানন্তর আমার সমভিব্যাহারিণী পথ-প্রদর্শিকা বনদেবী সানুগ্রহ-বচনে বলিলেন,—“সর্ব্বদেশীয় বৃক্ষ-লতাদি আনয়ন করিয়া এ কাননে রোপণ করা গিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতের কয়েকটা কলম তোমাদিগের দেশ হইতেও আহরণ করা গিয়াছে। দেখ, ভিন্নজাতীয় লোকে এই কাননে অবস্থিতি করিয়া, উৎসাহ ও যত্ন-সহকারে তাহার কেমন পারিপাট্য ও উন্নতি-সাধন করিয়াছে! আর তোমার স্বদেশীয় লোকদিগকে ধিক্কার করিতে হয়; কারণ, যতগুলি বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাঁহাদিগের উপর সমর্পিত আছে, প্রায় তাহার সমুদায়ই ভগ্ন ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ-দিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ, সমস্তই এক-জাতীয়; তাহার নাম—‘স্মৃতি’; আর বাম-দিকে যত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম—‘দর্শন’।” আমি ঐ উভয়জাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলাম। ঐ সমস্ত সহজেই অসার, রন্ধ্র-পরিপূর্ণ, কোনটা বা নিতান্ত শূন্যগর্ভ, তাহাতে আবার সমুচিত যত্ন-সহকারে পরিপালিত না হওয়াতে, অতিশয় দুরবস্থ হইয়া রহিয়াছে। দেখিলাম, দক্ষিণদিকে সমুদায় বৃক্ষ যদিও সম্যক্‌রূপে নষ্ট হয় নাই, কতকগুলি শুষ্ক ও ভগ্ন-শাখ হইয়াছে, কিন্তু পারিপাট্য নাই; বোধ হইল, যেন প্রবল ঝঞ্ঝাবাত দ্বারা সমুদায় বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বামদিকের কোন বৃক্ষের কেবল স্কন্ধমাত্র আছে, কোনটির বা সমুদায় গিয়া এক দিকের একমাত্র শাখা আছে, তদ্ভিন্ন কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। এই দুঃসহ

দুঃখের সময়ে এক পরম কৌতুক দেখিলাম, কতকগুলি অভিমানী মনুষ্য উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, অত্যন্ত দম্ভ ও ব্যাপকতা-সহকারে মহাকোলাহল ও বিষম কলহ আরম্ভ করিয়াছে।

এইরূপ শারীরস্থান, রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয় পরম রমণীয় তরু-সমূহ দর্শন করিয়া, সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম এবং অতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া পথিমধ্যে পরমারাধ্যা বিদ্যাদেবীকে কহিলাম,—"দেবি! আমি তোমার প্রসাদে অদ্য অনুপম সুখ লাভ করিলাম। ভূ-মণ্ডলে এত নির্ম্মল সুখ-ধাম আর কোথাও নাই। আমার বোধ হয়, এ স্থানে বিশুদ্ধ-চিত্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তিরাই আগমন করেন, অপর লোকের এখানে আসিবার অধিকার নাই।" এই কথা শ্রবণমাত্র তিনি বিষণ্ণ-বদনে কহিলেন,—"তুমি যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ, এ স্থান ধর্ম্মশীল সাধু ব্যক্তিদিগেরই যোগ্য বটে এবং পূর্ব্বে ইহা তাদৃশই ছিল। তখন কেবল পরোপকারী, তত্ত্ব-পরায়ণ, পুণ্যাত্মা আচার্য্য সকলেই এই পরম পবিত্র কাননে উপবেশন করিয়া, অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু এক্ষণে এ বনে নানা বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে; পাপ-রূপ পিশাচের উপদ্রবে ইহা অতি সঙ্কট স্থান হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, বিজাতীয়-বেশ ধারী 'অভিমান' স্বমস্তক উন্নত ও গ্রীবা-দেশ বক্র করিয়া, অত্যন্ত উগ্রভাবে সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে ও স্বকীয় পুত্র দম্ভকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মহাশ্লাঘা প্রকাশ পূর্ব্বক সগর্ব্ব পদবিক্ষেপ করিতেছে। উহাদের অঙ্গ-ভঙ্গী দেখিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে না যে, উহারা মনে মনে বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ ভাবিতেছে। তৎপার্শ্বে দৃষ্টি কর, 'ক্রোধ' নিজ কান্তা 'হিংসা'কে সঙ্গে লইয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। উনি 'অভিমানের' অত্যন্ত অনুগত। যদি কেহ অভিমানকে স্পর্শমাত্র করে, 'ক্রোধ' তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া, তাহার বৈরনির্য্যাতন করিতে উদ্যত হয়। এদিকে অবলোকন কর,

একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস দেখিতে দেখিতে আপনার শরীর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিল। এক্ষণে ও যেরূপ স্থূলকায় হইয়া উঠিল, আমার বোধ হইতেছে, বিশ্ব-সংসার ভোজন করিলেও, উহার উদর পূর্ণ হয় না। উহার নাম কি জান ?—'লোভ'। বিশেষতঃ কাব্য-তরুতলে যে দুই প্রচণ্ড পিশাচ দণ্ডায়মান দেখিতেছ, উহাদের অত্যাচারে এ স্থানের অতিশয় অপযশ ঘোষণা হইয়াছে ; উহাদের নাম—'কাম' ও 'পান-দোষ'। এককালে এই অপূর্ব্ব আনন্দ-কাননে নিষ্কলঙ্ক দম্পতী-প্রেমেরই প্রাদুর্ভাব ছিল ; তৎকালে অনেকানেক প্রধান ধর্ম্ম তাঁহার সহচর ছিল, কোন দুষ্ক্রিয়া এস্থানে প্রবেশ করিতেও সমর্থ হইত না। এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। দম্পতী-প্রেম ও তাঁহার সহচরদিগের দৈন্য-দশা উপস্থিত হইয়া পরানুরাগী কামরূপ পিশাচেরই আধিপত্য বৃদ্ধি হইতেছে। অবলোকন কর, পান-দোষ আপনার দল-বল-সহকারে কি অহিত আচরণ করিতেছে! কি বীভৎস বেশ ধারণ করিয়াছে! দেখ দেখ, তাহার ভয়ে ধর্ম্ম সকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। পশ্চাৎ হইতে আর কতকগুলি দুর্দ্দান্ত পিশাচ পিশাচী আসিয়া, তাহার সহিত বিকট হাস্য করিয়া নৃত্য করিতেছে। হে প্রিয়তম! এমত পরিশুদ্ধ পুণ্যধামে, এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা এই সমস্ত রাক্ষস পিশাচকে আশ্রয় দেয়, তাহারা তদ্দ্বারা আমাকেই প্রহার করে ; আমি এ অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া, স্বয়ং এরূপ ভূরি ভূরি অপ্রিয় ব্যাপার আর কত দেখাইব ? ঐ ঘন-পল্লবাবৃত নিবিড় বৃক্ষের অন্তরালে যে এক পরমাসুন্দরী রমণীকে দৃষ্টি করিতেছ, উহার পর কুৎসিত স্ত্রী আর দ্বিতীয় নাই। উহার গাত্রে যে কত ব্রণ, কত ক্ষত ও কত কলঙ্ক আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেবল কতকগুলি বেশভূষা-কল্পনা দ্বারা তৎসমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, আপনাকে সজ্জীভূত করিয়া দেখাইতেছে, উহার নাম—'কপটতা'।"

সমুদায় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আমি বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, এবং মনে মনে চিন্তা করিলাম,—এ অসার সংসার স্বভাবতঃ শোকদুঃখেতেই পরিপূর্ণ; যদিও দুই একটি সুখময় পুণ্যধাম ছিল, তাহাতে এত বিঘ্ন ঘটিয়াছে। যাহা হউক, আপনার কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া, সর্ব্বদুঃখ-নিবারিণী সন্তাপ-নাশিনী বিদ্যাদেবীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমনানন্তর একবার পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া দেখি, যে সকল রাক্ষস পিশাচের অহিত আচার দৃষ্টি করিয়া আসিলাম, তাহারাই আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে! বিশেষতঃ, 'কাম' ও 'পানদোষ'—এই দুই জন নানাবিধ সুমধুর প্ররোচনা-বাক্য বলিয়া, আমাকে তৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহাদিগের অতিকুৎসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম. এখন দেখি, তাহারা পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। কি জানি, তাহারা কি কুমন্ত্রণা দেয়, এই আশঙ্কায় পরম-হিতৈষিণী বিদ্যাদেবীর সমীপবর্ত্তী হইয়া, সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে অভয় দিয়া, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত প্রহরীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"তোমরা দুই পার্শ্বে থাক, কোন শত্রু যেন ইহার নিকটস্থ হইতে না পারে।"

এইরূপে আমরা বনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। তখন বিদ্যা অতি প্রসন্ন-বদনে সুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন,—"এইক্ষুদ্র প্রান্তরের শেষে যে মনোহর গিরি দর্শন করিতেছ, ঐ তোমার লক্ষিত স্থান; ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তুমি চরিতার্থ হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি পরম-পুলকিত-চিত্তে অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, চিরাকাঙ্ক্ষিত ফল-প্রত্যাশায় মহোৎসাহ-সহকারে দ্রুতবেগে পদবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং অবিলম্বে পর্ব্বত-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া,

তথায় আরোহণ করিবার এক পথ প্রাপ্ত হইলাম। ঐ পথের এক পার্শ্বে এক দৃঢ়ব্রতা সুশীলা স্ত্রী এবং অন্য পার্শ্বে এক বহু-পরিশ্রমী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ পুরুষ দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহারা যাত্রীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম —স্ত্রীর নাম 'শ্রদ্ধা', আর পুরুষের নাম 'যত্ন'।

ঐ পর্ব্বত আরোহণ করা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হইল। অতি কষ্টে কিছু দূর গমন করিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলাম, সম্প্রতি এই স্থানে অবস্থিতি করি। বিদ্যাদেবী স্বকীয়া মহীয়সী শক্তিদ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন,– "হে প্রিয়তম! এ পর্ব্বতের পার্শ্ব-দেশে কোন স্থানে স্থির থাকিবার সম্ভাবনা নাই, যদি আর উপরে না উঠ, তবে অবশ্যই অধোগমন করিতে হইবে, অতএব সাবধান,– সাবধান।" আমি তাঁহার এই সদুপদেশ শুনিয়া, চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম। পরন্তু সুখের বিষয় এই যে, যতই আরোহণ করিতে লাগিলাম, ততই ক্লেশের লাঘব হইয়া সুখের বৃদ্ধি হইয়া আসিল।

অবশেষে যখন পর্ব্বতোপরি উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভবই হইল! তথাকার সুশীতল মারুত-হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তথায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসংবাদ, চৌর্য্য, অত্যাচার,—এ সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। বোধ হইল, বিশ্ব-সংসারে এমন রম্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই। কিছুকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর দূর হইতে এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিতে পাইলাম এবং তদ্দর্শনার্থে আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি, কতকগুলি পরমপবিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা সরোবর-তটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অসামান্য রূপ-লাবণ্য

প্রফুল্ল পবিত্র মুখশ্রী এবং সারল্য ও বাৎসল্যস্বভাব অবলোকন করিয়া, অপরিমেয় প্রীতি লাভ করিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে। বোধ হইল যেন, আনন্দ-প্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম, ইঁহারা দেব-কন্যা হইবেন, তাহার সংশয় নাই। তখন বিদ্যাদেবী সাতিশয় অনুকম্পা-পুরঃসর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ; ইঁহারা দেব-কন্যাই বটেন এবং এই ধর্ম্মাচল ইঁহাদের বাসভূমি। ইঁহাদের কাহারও নাম 'দয়া', কাহারও নাম 'ভক্তি', কাহারও নাম 'ক্ষমা', কাহারও নাম 'অহিংসা', কাহারও নাম 'মৈত্রী' ইত্যাদি। সকলের নিজ নিজ গুণানুসারে নাম-করণ হইয়াছে। ইঁহাদের রূপ ভুবনবিখ্যাত। ইঁহারা যে পর্য্যন্ত সুশীল, তাহা কি বলিব। বিদ্যারণ্য-যাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা এই ধর্ম্মাচল আরোহণ করেন, তাঁহাদিগেরই শ্রম সফল ও জন্ম সার্থক। তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও জীবন পবিত্র কর।"

বিদ্যাদেবীর উপদেশানুসারে আমি উল্লিখিত শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া, অভূত-পূর্ব্ব অতি নির্ম্মল আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখি, সেই সুন্দর মারুত-সেবিত যমুনা-কূলেই শায়িত রহিয়াছি!

———

স্বপ্নদর্শন—কীর্ত্তি-বিষয়ক

আহা কি দেখিলাম। এমত অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। এমত কলরব-পরিপূর্ণ লোকাকীর্ণ স্থানও কোথাও দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে এক পরম শোভাকর অপূর্ব্ব পর্ব্বত দর্শন করিলাম। সে পর্ব্বত এত উচ্চ যে, তাহার শিখর নভোমণ্ডলস্থ মেঘসমুদায় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার পার্শ্ব-দেশ অত্যন্ত বন্ধুর ও দুরবরোহ; মনুষ্য-ব্যতিরেকে আর কোন জন্তুর তথায় আরোহণ করিবার সামর্থ্য নাই। আমি অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, কখন উর্দ্ধ-নয়নে পর্ব্বতের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, কখনও বা লোক-সমারোহ এবং তাহাদের বিবিধ-বিষয়ক যত্ন, চেষ্টা. ঔৎসুক্যাদি নিরীক্ষণ ও পর্য্যালোচন করত ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিলাম।

এই আশ্চর্য্য অদ্ভুত ব্যাপারের আদ্যন্ত কিছুই অনুভব করিতে না পারিয়া, ম্রিয়মাণ হইতেছিলাম; এমতকালে এক পরম-সুন্দরী বিদ্যাধরী আমার ললাটদেশ বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ আমার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, কহিতে লাগিলেন,—"তুমি কি চিন্তা করিতেছ? এই প্রশস্ত ক্ষেত্রের নাম—'কর্ম্মক্ষেত্র', ঐ মহাশৈলের নাম—'কীর্ত্তিশৈল', উহার শিখর-দেশে কীর্ত্তি-সেবকেরা তাঁহার সেবার্থে তৎসন্নিধানে গমন করিতেছে।" বিদ্যাধরী-সমীপে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, আমি অপার আনন্দ অনুভব করিলাম, এবং কহিলাম,—"দেবি! তোমার অসম্ভাবিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া, আমি কৃতার্থ হইলাম; এক্ষণে যদি অভয় দান কর, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি; তুমি কে, আমাকে বিশেষ করিয়া বল।" তিনি কহিলেন—"আমি বিদ্যাধরী, আমার নাম প্রজ্ঞা; তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখিয়া, এখানে আবির্ভূত হইয়াছি। যদি

কীর্ত্তিদেবীর মূর্ত্তি ও কীর্ত্তি-সেবকদিগের কৌতুক দর্শন করিবার বাসনা থাকে, আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর, সমস্ত দর্শন করাইব।”

আমি বিদ্যাধরীর এই আশ্বাস-বাক্য বিশ্বাস করিয়া, পরম পুলকিত-চিত্তে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবামাত্র পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে ঘন ঘন বংশী-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। আহা! সেই সুধাময় মধুর রব যাহাদের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল, তাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহাদের চিত্ত-ভূমিতে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-নীর নিঃসৃত ও আশ্চর্য্য উৎসাহ-তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের মুখমণ্ডল এমন প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে, বোধ হইল, যেন তাহারা মরণ-ধর্ম্মশীল মানব-স্বভাব অতিক্রম করিয়া, অমর ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে স্থানে যে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকেই সে সুধা-সিক্ত বংশীরব শ্রবণ করে নাই, আর কতকগুলি লোক অল্প অল্প শ্রবণ করিয়াও তাহার সুমধুর রসাস্বাদ-পুরঃসর সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, পরমারাধ্যা বিদ্যাধরীকে এ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি কহিলেন,—“ঐ বৃহৎ পর্ব্বতের পূর্ব্ব-পার্শ্বে যে তিন প্রত্যন্ত-পর্ব্বত দৃষ্টি করিতেছ, তাহার এক এক পর্ব্বতে এক একটা যক্ষ বাস করে। তাহারা দেবতুল্য বেশ-ভূষা করিয়া, এক এক নিবিড় কুঞ্জে অবস্থিতি-পূর্ব্বক লোকের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করে। সেই তিনটা যক্ষ যাহাদের অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ নয়। তাহাদের নাম কি জান?—‘অজ্ঞান’, ‘আলস্য’ ও ‘আমোদ’।” বিদ্যাধরী যাহা বলিলেন, বাস্তবিকও তাহাই প্রত্যক্ষ হইল। সকল-জাতীয় যাবতীয় হীন-বুদ্ধি অকর্ম্মণ্য সামান্য মনুষ্য তদ্গত-চিত্তে সেই কুটিল-স্বভাব বিশ্ব-বঞ্চক যক্ষদিগের কুমন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া, তাহাদের

প্ররোচন-বাক্যে মুগ্ধ হইয়া থাকিল। কেবল উন্নত বুদ্ধি তেজীয়ান্ পুরুষেরা কীর্ত্তিদেবীর বংশীরব শ্রবণমাত্র মহোৎসাহ-প্রকাশ পুরঃসর মহাশৈল আরোহণার্থ উত্থত হইলেন। সেই সুধাময় মধুর শব্দ তাঁহাদের কর্ণকুহরে যতই প্রবিষ্ট হইল, ততই মিষ্ট বোধ হইয়া, তাঁহাদের উৎসাহ-শিখা প্রজ্বলিত করিতে লাগিল।

দেখিলাম, তাঁহারা অত্যন্ত ঔৎসুক্য-সহকারে উল্লিখিত পর্ব্বতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে যে বস্তু সমভিব্যাহারে লইলে, সে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার কোন না কোন বস্তু সঙ্গে করিয়া চলিলেন। কেহ একখানি শাণিত প্রখর তরবার, কেহ কোন পরিপাটী পুস্তক, কেহ একটি সুন্দর দূরবীক্ষণ, কেহ বা এক গোলযন্ত্র ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যক্তি এক এক সামগ্রী সঙ্গে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন; ইহাতে দেখি, মনুষ্য-বিরচিত সমস্ত প্রধান বস্তু তথায় সংগৃহীত হইয়াছে। যাত্রীরা সকলে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া, নানা পথে আরোহণ করিতে লাগিল; অনেকে এরূপ সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া চলিল যে, তদ্দ্বারা শিখর পর্য্যন্ত আরোহণ করিবার সম্ভাবনা নাই, কিয়দ্দূর উঠিয়াই স্থগিত হইতে হয়। ভূ-মণ্ডলস্থ শিল্পকর ও গ্রন্থকারদিগের মধ্যে বহুতর ব্যক্তি এই সকল সঙ্কীর্ণ পথের পথিক হইয়াছিলেন।

আমাদের বামপার্শ্বে অন্য এক সম্প্রদায় দর্শন করিলাম। তাঁহারা অতি কুটিল বন্ধুর পথ অবলম্বন করাতে, সর্ব্বদা দিগ্‌ভ্রম হইয়া বিপথগামী হইতেছিলেন। তাঁহারা পরিশ্রম ও কর্ম্ম-দক্ষতা বিষয়ে অন্য কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা ন্যূন না হইয়াও, অধিক দূর আরোহণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কেহ কেহ অনবরত এক প্রহর কাল ক্লেশ করিয়া যত দূর উত্থিত হইয়াছিলেন, সহসা একবার পদস্খলন হইয়া, নিমেষ মাত্রে

তাহার দ্বিগুণ পথ অধোগমন করিলেন। দেখি, রাজ-নিয়ম-ব্যবসায়ী কত কত সুবিখ্যাত ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মানস, জ্ঞানের সিংহাসন হরণ করিয়া, চতুরতা ও ধূর্ত্ততাকে প্রদান করেন।

এই সমস্ত অদ্ভুত-ব্যাপার দর্শন করিতে করিতে, অনেক দূর আরোহণ করিলাম। আরোহণ করিয়া দেখি, পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী অন্য অন্য যত পথ দৃষ্টি করিয়াছিলাম, সমুদায় আসিয়া, দুই প্রশস্ত পথে মিলিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সমস্ত পথের সমুদায় যাত্রী এই দুই বৃহৎ পথে প্রবেশ করিয়া, দুই সম্প্রদায় হইল।

এই দুই প্রশস্ত পথের প্রবেশ-দ্বারের অনতিদূরে এক এক ভীষণাকার যক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। তাহার এক জন ধূম্রবর্ণ, দীর্ঘ-দন্ত ও কুটিল-নেত্র; চর্ম্ম-পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক প্রকাণ্ড লৌহ-দণ্ড হস্তে করিয়া অবস্থান করিতেছিল। যাহারা তাহার সমীপস্থ পথে গমন করিতেছিল, তাহাদের সকলেরই সম্মুখভাগে সেই দণ্ড ঘন ঘন চালনা করিতে লাগিল। লোকে তাহা দেখিবামাত্র ভয়ে কম্পমান হইয়া পশ্চাদ্ভাগে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক 'মৃত্যু' 'মৃত্যু' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আর যে যক্ষ দ্বিতীয় পথের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহার নাম 'দ্বেষ'। তাহার হস্তে যমদণ্ডের ন্যায় কোন সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র ছিল না বটে, কিন্তু সে যে একপ্রকার বিকট ও উৎকট মুখভঙ্গি প্রকাশ করিয়া বিষপূরিত মৃদুস্বরে পর পরীবাদ আরম্ভ করিল এবং অতি কুৎসিত ভ্রূভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া, সকলের প্রতি যেরূপ বিষদৃষ্টি করিতে লাগিল, তাহাতে মৃত্যু অপেক্ষাও তাহাকে ভয়ানক জ্ঞান হইল। এমন কি, আমাদের সমভিব্যাহারী শত শত যাত্রী তাহার আকার দর্শনে ও বাক্য শ্রবণে ভগ্নোৎসাহ হইয়া, শৈলারোহণে নিবৃত্ত হইল। এই দুই রুক্ষ-স্বভাব যক্ষ দৃষ্টি করিয়া আমার যেরূপ হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, তাহা বলিবার নয়। কিন্তু পূর্ব্ব-কথিত বংশীধ্বনি পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর

হওয়াতে, অভিনব উৎসাহ-সঞ্চার ও সাহস-বৃদ্ধি হইল, এবং তদ্দ্বারা হৃদয়-ভূমি ভীরুতারূপ কুজ্ঝটিকা হইতে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মুক্ত হইতে লাগিল। যাহাদের হস্তে প্রখর তরবার ছিল, তাহারা স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক দর্প করিয়া, প্রথমোক্ত পথে প্রস্থান করিল। অবশিষ্ট সদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তি সকল দ্বিতীয়পথ অবলম্বন করিয়া, অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে গমন করিতে লাগিলেন। প্রথমে উভয় পথই কিঞ্চিৎ কষ্ট-দায়ক বোধ হইল, পরে যখন উল্লিখিত যক্ষদ্বয় আমাদের দৃষ্টি-পথের বহির্ভূত হইল, তখন উভয় পথই তত্তৎ-পথের পথিকদিগের সাতিশয় সুখ-দায়ক বোধ হইতে লাগিল। যদিও আমি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু দূর হইতে প্রথম পথের ভাব ও তদীয় যাত্রীদিগের ব্যবহার এক এক বার অবলোকন করিলাম। বলিতে কি, তাহা কোন মতেই আমার মনঃপূত ও পরিশুদ্ধ বোধ হইল না।

তদনন্তর আমরা পরম প্রফুল্ল-চিত্তে সুমধুর বংশী-স্বর শ্রবণ-পুরঃসর অতিশয় উৎসাহ-সংকারে সুচারু কীর্ত্তিশৈল আরোহণ করিতে লাগিলাম। পথি-মধ্যে প্রায় সকলেই দুই একবার বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, এবং ক্রমে ক্রমে কৃত-কার্য্য হইয়া, শিখর-দেশে উপনীত হইলেন। আহা! সে স্থানের কি অপূর্ব্ব শোভা! কি মনোহর ভাব! তাহার শোভা এখনও আমার চিত্ত-পটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। সে স্থানের সুন্দর সুস্নিগ্ধ সমীরণ কি নিরুপম-সুখদায়ক! তাহার প্রত্যেক হিল্লোলে সর্ব্বাঙ্গে সুবিমল সুখ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। আমাদের বোধ হইল, যেন কি অনির্ব্বচনীয় অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইতেছি। তৎপ্রদেশের আর এক অপূর্ব্ব গুণ আছে, শুনিলে সকলে চমৎকৃত হইবেন। তথায় দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব পূর্ব্ব-কৃত্য সমস্ত যতই স্মরণ করা যায়, ততই অন্তঃকরণ আনন্দনীরে

নিমগ্ন হইতে থাকে। আমরা ইতস্ততঃ পদচারণা-পূর্ব্বক মধ্যদেশে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা অবলোকন করিয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলাম। তাহার বহির্দ্বারোপরি "কীর্ত্তি-নিকেতন"—এই কথাটি বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাহার চারিদিকে চারি রৌপ্যময় শুভ্রবর্ণ কবাট-সংযুক্ত প্রশস্ত দ্বার আছে এবং তাহার অভ্যন্তরে কীর্ত্তিদেবী এক সুচারু সুবর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, অনবরত বংশী-বাদন করিতেছেন। যাত্রিগণ শ্রবণ করিয়া, হর্ষসাগরে অবগাহন করিলেন, এবং বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, আনন্দ-মনে উৎসাহ-সহকারে কীর্ত্তি-নিকেতনে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিদ্বারে পুরাবৃত্তবিৎ নামে কতকগুলি পণ্ডিত অবস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অনেক ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে করিয়া, অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাদের সহায়তা-ব্যতিরেকে তথায় প্রবেশ করিতে কদাচ সমর্থ হইতেন না। ভূ-মণ্ডলের চারি খণ্ডের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক চারি দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন; আমিও পরম কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, কীর্ত্তি-নিকেতনে প্রবেশে পুরঃসর সমস্ত সন্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; দেখিলাম,—কীর্ত্তি-দেবী স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, সকলকে যথাসম্ভব সংবর্দ্ধনা-পূর্ব্বক সুমধুর-স্বরে এক এক আসন গ্রহণ করিতে কহিলেন। তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে এক এক আসনে উপবেশন করিলেন। কীর্ত্তি-দেবীর পরম পবিত্র সুরম্য শোভা দর্শনে, তাঁহার পুষ্পালঙ্কারের সুচারু সুদূর-গামী সৌরভ গ্রহণ এবং তাঁহার সুধাসিক্ত সুমধুর বংশীরব শ্রবণ করিয়া, সকলে এক-কালে মোহিত হইয়া গেল; তাঁহার শরীরের সৌগন্ধে সে স্থান অনবরত আমোদিত ছিল। আমি ইতস্ততঃ পদ-চারণ-পূর্ব্বক এক এক দিকের এক এক প্রকার মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া, পুলকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলাম। দেবীর

বামপার্শ্বে কতিপয় দীর্ঘকায়, বৃষ-স্কন্ধ, মহাবল-পরাক্রান্ত বীর-পদবী-বিশিষ্ট মনুষ্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, অকুতোভয়ে উপবিষ্ট আছেন ; তাঁহাদের মুখ-শ্রীতে সাহস ও উৎসাহের সমুদায় লক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমি কোন কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ-পূর্ব্বক অতিশয় ঔৎসুক্য-সহকারে একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতেছি দেখিয়া, আমার সমভি-ব্যাহারিণী বিদ্যাধরী কহিলেন—"জান না? ইহারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া, অত্যুৎকট দুরূহ ব্যাপার সমুদায় সাধন করিয়াছেন। অবনীমণ্ডলে ইহাদের—'পাণ্ডব' ও 'কৌরব'-পদবী প্রচারিত আছে।" কিন্তু প্রবল-প্রতাপান্বিত, প্রভূত-বলবিশিষ্ট, কতিপয় বিদেশীয় ব্যক্তিই সেই শ্রেণীর প্রধান আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। বিদ্যাধরী তাঁহাদের নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিলেন ; বিদেশীয় লোকের নাম উত্তমরূপে স্মরণ থাকে না। একজনের নাম বুঝি আলেক্‌জাণ্ডার, একজনের নাম সীজর, আর এক জনের নাম হানিবল ইত্যাদি। যে সমস্ত পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতেরা এই সকল যাত্রীকে সমভিব্যাহারে করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এক এক যাত্রীর পার্শ্ব-দেশে অবস্থান-পূর্ব্বক কীর্ত্তিদেবীর সমীপে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সেই সুযোগে আপনারাও পরিচিত ও তাঁহার অনুগৃহীত হইলেন।

কীর্ত্তি-দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বের ভাব আর এক প্রকার। তথায় যে সমুদায় মহানুভব মনুষ্য বিরাজিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অবলোকন করিলে, শোকাচ্ছন্ন বিষণ্ণ জনেরও অন্তঃকরণ একবার প্রফুল্ল হইতে পারে। তাঁহাদের সহাস্য বদন, সুধাময় মধুর বচন এবং আনন্দোৎফুল্ল চঞ্চল লোচন প্রত্যক্ষ করিয়া, আমি প্রীতিরূপ অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইলাম। তাঁহারা কীর্ত্তি-দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন এবং কয়েকটি পরম সুন্দরী প্রিয়বাদিনী রমণী চিত্র-বিচিত্র অপূর্ব্ব

পরিচ্ছদ ও পরম-শোভাকর মনোহর অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের সহযোগিনী-স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের কবি-পদবী সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং তাঁহাদের সহযোগিনী রমণীরা 'রাগিণী' বলিয়া সর্ব্বস্থানে বিখ্যাত। পূর্ব্বোক্ত বীরগণ যেমন এক এক পুরাবৃত্তবিদ্ পণ্ডিতের সমভি-ব্যাহারে তথায় প্রবেশ করিয়াছেন, কবিদিগের সেরূপ কাহারও আনুকূল্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই; বরং তাঁহারাই অনেকানেক বীর্য্যবান্ ও গুণবান্ ব্যক্তির কীর্ত্তি-নিকেতন-প্রবেশ-বিষয়ের সহায়তা করিলেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান; তাঁহাদের করস্থিত পুস্তকের কোন মনোহারিণী শক্তি আছে, দ্বারবানেরা তাহা দেখিবামাত্র তাঁহাদিগকে যত্নসহকারে পথ প্রদান করিল। দুই শ্মশ্রু-ধারী সহাস্য-বদন প্রাচীন পুরুষ এই শ্রেণীর মধ্যস্থল-বর্ত্তী অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রাচীনের মধ্যে এমন সুন্দর পুরুষ আর দৃষ্টি করি নাই। বিদ্যাধরী কহিলেন,—"এক জনের নাম—বাল্মীকি, আর একজনের নাম—হোমর।" দক্ষিণ ভাগে হোমর এবং তাঁহার বামভাগে বাল্মীকি, এক এক খানি পরম রমণীয় পুস্তক হস্তে করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাল্মীকির বাম পার্শ্বে এক পরম রূপবান্ যুবা পুরুষ চিত্রিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, বিবিধ বর্ণ-বিভূষিত কুসুমাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ আসনের সৌরভে সর্ব্বস্থান আমোদিত হইতেছিল। তিনি না কি উজ্জয়িনী নিবাসী নৃপতি-বিশেষের সভাসদ থাকিয়া, নৃপতি অপেক্ষা শতগুণে কীর্ত্তি-দেবীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার বামপার্শ্বে—মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র, প্রভৃতি, স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে যথাক্রমে এক এক অশেষ শোভাকর উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাল্মীকির যেরূপ স্বভাব-সিদ্ধ সরল ভাব ও অকৃত্রিম অনুপম শোভা, তাঁহাদের কাহারও সেরূপ নহে। তাঁহাদের উত্তম শোভা আছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেকের শরীরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষায় বস্ত্রালঙ্কারের

শোভা অধিক। কেহ কেহ আপন পরিচ্ছদ এ প্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন যে, বহু যত্নে ও অনেক কষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া না দেখিলে, তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, তাহাও দৃষ্টি-গোচর হয় না। ও দিকে হোমরের পার্শ্বে বর্জ্জিল, ডান্টে, মিল্টন, সেক্সপিয়র, বায়রণ প্রভৃতি শত শত রসার্দ্র-চিত্ত সুপ্রসিদ্ধ কবি যথাযোগ্য স্থানে অবস্থিত ছিলেন। সহৃদয় সেক্সপিয়র যে রত্নময় সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, তাহা এই শ্রেণীর সকল আসন হইতে উন্নত ও জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এই শ্রেণীর অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া, আমার অন্তঃকরণ একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

ইঁহারা সকলে বিচিত্র কথা-প্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছিলেন; তন্মধ্যে বাল্মীকি ও কালিদাসের একটি কথা শ্রবণ করিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তাঁহারা কহিলেন,—"আমাদের স্বজাতীয় নব্য সম্প্রদায়ী যুবক-দিগের মধ্যে অনেকে আমাদিগকে যথোচিত আদর অপেক্ষা না করিয়া, ভিন্নজাতীয় কবিদিগের অশেষ উপচারে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তবে সুখের বিষয় এই যে, ভিন্নজাতীয় পণ্ডিতেরা আমাদের প্রকৃত মর্য্যাদা জানিতে পারিয়া, বিশিষ্টরূপ শ্রদ্ধা-সহকারে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। দেখ, তাঁহারা আমাদিগকে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন, আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও সেরূপ পরিধেয় পরিধান করি নাই। এখন তদ্দৃষ্টে স্বজাতীয় নব্য ব্যক্তিরাও কেহ কেহ আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিতেছেন।"

অতঃপর যাঁহারা কীর্ত্তিদেবীর সম্মুখস্থিত সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় বর্ণন করি। তাঁহারা সকলেই প্রায় ধ্যান-মগ্ন এবং সকলেরই ললাট-দেশ প্রশস্ত। পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি-ভাজন বলিয়া বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের সকলকেই সেই স্থানে দৃষ্টি করিয়া আপনাকে কৃতার্থ

বোধ করিলাম। যাঁহারা ভূ-মণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বিদ্যা-বিষয়ে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তথায় তাঁহাদের সকলেরই সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। তথায় আমার সাতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ আর্য্যভট্ট, বরাহ-মিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য অম্লান-ভাবে প্রসন্ন-মনে বিরাজ করিতেছিলেন। প্রথমে মহাত্মা আর্য্যভট্টকে কিছু ম্লান ও বিষন্ন দেখিয়াছিলাম; পরে অকস্মাৎ তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল ও প্রদীপ্ত হইতে দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহার কোন প্রিয়তর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। বাস্তবিকও তিনি কয়েকটি অসামান্য ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহানুভব মনুষ্যের প্রতি কটাক্ষপাত ও অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"পূর্ব্বে কেহই আমার যথার্থ মর্য্যাদা অবগত হইতে পারেন নাই; সুতরাং আমার কথায় আস্থা করা দূরে থাকুক, অত্যন্ত অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরন্তু, এই সমস্ত বিদেশীয় বন্ধু আমার অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়া, আমার শ্রম সার্থক ও মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।" তিনি যে সমুদায় বিদেশীয় ব্যক্তিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আমি তাঁহাদের পরিচয়-লাভার্থ পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, আমার সমভি-ব্যাহারিণী বিদ্যাধরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন,—"একজনের নাম কোপর্নিকস, একজনের নাম গালিলিয়, একজনের নাম নিউটন্ ইত্যাদি।" এই শেষোক্ত নাম শ্রবণমাত্র, আমার অন্তঃকরণ পুলকিত ও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে ইঁহাকে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য অপেক্ষা গরিষ্ঠ বলিয়া বোধ ছিল, এখানেও দেখিলাম, ইনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছেন। বেদব্যাস ও শঙ্করাচার্য্য এবং প্লেটো ও পিথা-গোরস্‌কেও দর্শন করিলাম। প্রথমে তাঁহারা সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পরে ভূ-মণ্ডলের পশ্চিম-খণ্ড-নিবাসী কতকগুলি নব্য গ্রন্থকারের প্রখর মুখ জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া, এক পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন।

এইরূপ কত দেশের কত গুণবান্ ও বিদ্যাবান্ ব্যক্তিকে একত্র দৃষ্টি করিলাম, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। সকলের আপন গুণ ও মর্য্যাদানুসারে আসন-গ্রহণ সম্পন্ন হইলে, তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে একে একে কীর্ত্তি-দেবীর স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কহিলেন,—"দেবি! আমি লোক-দিগকে শিক্ষাদানার্থে মানসিক ও কায়িক ক্লেশ করিয়া শরীর ক্লিষ্ট এবং অন্তঃকরণ নির্বীর্য্য করিয়াছি। কিন্তু অনেকেই তদর্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন না, এবং কেহই তাহার পুরস্কার প্রদান করেন না। অতএব, মাতঃ! তোমার শরণাপন্ন হইয়া নিবেদন করিতেছি, তোমার সানুগ্রহ কটাক্ষপাত-ব্যতিরেকে ভূ-মণ্ডলে আমার আর কোন পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।" কেহ কহিলেন,—"দেবি! আমি কেবল তোমার প্রসাদ-লাভ-প্রত্যাশায় এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি; এবং অর্দ্ধরাত্র জাগরণ-পূর্ব্বক মনোহর কাব্য প্রস্তুত করিয়াছি; অতএব জননি! আমার প্রতি সকরুণ-নেত্রে কটাক্ষপাত কর।" যে সমস্ত মহাবীর দেবীর বাম ভাগে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়া, এইরূপ স্তব আরম্ভ করিলেন,—"দেবি! আমরা কেবল তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর সঙ্কট-সমুদায়ে পতিত হইয়াছি। তোমার নিমিত্ত কত শত নগর শোণিত-প্রবাহে প্লাবিত করিয়াছি, কত শত গ্রাম অগ্নি-সংযুক্ত করিয়া দগ্ধ করিয়াছি এবং কত শত জাতির স্বাধীনতা-রত্ন হরণ করিয়াছি। অতএব, দেবি! অতঃপর তোমার পাদ-পদ্মে স্থান দান কর।" আমি শেষোক্ত লোকদিগের স্তোত্র-সমুদায় শ্রবণ-পূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম। কি! ইঁহাদের মধ্যে অনেকে কীর্ত্তি-দেবীর সেবার্থে সর্ব্ব-সেবনীয় পরম পূজনীয় দেব-দেব ধর্ম্মকে অবহেলন ও কীর্ত্তি-শৈলে আরোহণার্থ পরম পবিত্র ধর্ম্মাচল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে আমার সমভিব্যাহারিণী হিতকারিণী বিদ্যাধরী কহিলেন,—

"তুমিও কেন এই নিকেতনের এক আসন গ্রহণ করিয়া উপবেশন কর না।"

আমি কহিলাম—'বিদ্যাধরি! তুমি অনুকূল হইয়া আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা শিরোধার্য্য। কিছুমাত্র যশঃস্পৃহা না থাকিলেই বা কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, এস্থানে উপস্থিত হইব? কিন্তু যে সুখ্যাতি-প্রচার পরের বাগিন্দ্রিয়-পরিচালনার উপর নির্ভর করে, তাহার নিমিত্তে কোন স্থায়ী ধন বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নহে। আমি কীর্ত্তি-দেবীকে কোন ক্রমে অশ্রদ্ধা করিনা এবং তাঁহার প্রসাদ লাভার্থে ব্যাকুলও নহি। আমি যে দেবতার যতদূর সেবা করা উচিত, তাহা করিব এবং দেবাধিপতি ধর্ম্মের আরাধনায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিব; ইহাতে কীর্ত্তিদেবী আমার প্রতি অনুকূল হইয়া, কৃপাকটাক্ষ করেন, আমি অতিশয় আগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে হৃদয় ধামে স্থান দান করিব। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া, যদি যাবতীয় লোকের অজ্ঞাত থাকি, সেও ভাল, পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া, কীর্ত্তিলাভের অভিলাষী নহি'।

এইরূপ চিন্তার বেগ প্রবল হওয়াতে, আমি সহসা জাগরিত হইয়া উঠিলাম। এখন নেত্র-উন্মীলন করিয়া দেখিতেছি, কোথায় বা কীর্ত্তি-শৈল, কোথায় বা কীর্ত্তি-নিকেতন! আমি যে সমস্ত অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, তাঁহারাই বা কোথায়? পূর্ব্বনিশায় যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, তাহাতেই পতিত রহিয়াছি। প্রভাত সময়ের সুকোমল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গের আবরণ-বস্ত্র কম্পিত করিতেছে ও সর্ব্বশরীর শীতল করিতেছে।

অক্ষয়-সুধা

দ্বিতীয় খণ্ড

নীতি ও ধর্ম্ম

অক্ষয়-সুধা

দ্বিতীয় অধ্যায়

নীতি ও ধর্ম্ম

স্বপ্নদর্শন—ন্যায়-বিষয়ক

আমি বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কনখল প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় বহুতর স্থান পর্য্যটন করিয়া, শীত-ঋতুর উপক্রমেই বিন্ধ্যাচলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এ প্রদেশে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। প্রাতঃকালে চতুর্দ্দিক্ মেঘাবৃতবৎ ঘনতর কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন থাকে; অতি শীতল পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইয়া, কলেবর কম্পমান করে ও বৃক্ষপত্রের শিশির-বিন্দু-সমুদায় ঝর্‌ঝর্ শব্দে পতিত হইয়া, তলস্থ ভূমিকে অল্প অল্প আর্দ্র করিতে থাকে। সূর্য্য-বিম্ব সর্ব্বদা ম্লানমূর্ত্তি; গগন-মণ্ডলে বহু দূর উত্থিত হইলেও নীহার-প্রভাবে চন্দ্র-বিম্বের ন্যায় অতি মৃদু ভাবে প্রকাশ পায়, এবং মধ্যাহ্ন কালেও তদীয় কিরণ-জাল পরম-সুখ-সেব্য বলিয়া অনুভূত হয়। সায়ংকালে ও রজনীতে গৃহের বহির্ভূত হওয়া, অত্যন্ত দুষ্কর; তৎকালে দ্বাররোধ করিয়া অগ্নিসেবন

করাই পরম প্রীতিকর বোধ হয়। গত দিবস যামিনী যোগে যোগমায়ার মন্দিরের সমীপবর্ত্তী গৃহে কতকগুলি উদাসীনের সহিত একত্র উপবেশন-পূর্ব্বক অগ্নি-সেবন ও পরস্পর কথোপকথনে মহাসুখে কালযাপন করিতেছিলাম। আমার বামপার্শ্বে এক বিমর্ষ-যুক্ত মৃদু-ভাষী তরুণ-বয়স্ক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন; কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া অবগত হইলাম, তিনি বাঙ্গালাদেশীয় এক ব্রাহ্মণের পুত্র। তাঁহার পিতার পরলোক-যাত্রার পরে তাঁহার পিতৃব্য-পুত্রেরা প্রতারণা করিয়া, তাঁহাকে পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছে। তিনি অতি নির্ব্বিরোধ মনুষ্য! বিবাদ বিসংবাদে কোন ক্রমে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না; তথাপি আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শক্রমে রাজদ্বারেও ইহার প্রতীকার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিপক্ষের সহায়-সম্পত্তি-বল অধিক ছিল, একারণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; অবশেষে মনোদুঃখে সংসার বিরক্ত হইয়া, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার বাক্যাবসান না হইতেই, আমার সম্মুখবর্ত্তী আর এক সুশীল শান্ত-স্বভাব ধর্ম্মপরায়ণ উদাসীন, "হা নারায়ণ!" বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"ভাই। তোমার দারুণ দুঃখের কথা শুনিয়া, আমি মহা-খেদান্বিত হইলাম; এক্ষণে আমার দুর্দ্দশার বিষয় কিছু শ্রবণ কর। আমি কোন রাজ-সংক্রান্ত সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত ছিলাম এবং নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, যশোভাজন হইয়াছিলাম; ইতিমধ্যে আমার উপরিতন অধ্যক্ষের মৃত্যু ঘটনা হইলে, অন্য এক ব্যক্তি তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। প্রথমাবধি তাঁহার আচরণ দেখিয়া বোধ হইল, রাজ-কোষের সর্ব্বস্ব হরণ-সঙ্কল্প করিয়াই তিনি এ কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমাকে তাঁহার অনুগামী করিবার নিমিত্তে বিস্তর কৌশল করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই মানস পূর্ণ করিতে না পারিয়া, অবশেষে

আমাকে পদ-চ্যুত করিবার নিমিত্তে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমাগত তিন বৎসর শঠতা, মিথ্যাকথন ও নানাপ্রকার প্রতারণার অনুষ্ঠান দ্বারা চরিতার্থ হইয়া আপনার কোন প্রিয়-পাত্রকে আমার পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা অনেকেই তাঁহার দুষ্ট ব্যবহার ও আমার নির্দ্দোষ চরিত্র জ্ঞাত ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই মনোযোগ করিলেন না। এ সকল বিষয়ের যেরূপ চরম ফলাফল দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইল, ইহার প্রতীকার করা এক প্রকার অসাধ্য। অতএব নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া সংসারাশ্রমে ধিক্কার দিয়া, এই পথের পথিক হইয়াছি।

এই সমুদায় শোচনীয় ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, আমি বিষাদ-সমুদ্রে মগ্ন হইলাম এবং দয়া, ক্ষোভ ও ক্রোধ পর্য্যায়ক্রমে আমার অন্তঃকরণকে ব্যাকুলিত করিতে লাগিল। সাংসারিক লোকের এই সকল অন্যায়াচরণ ভাবিতে ভাবিতে, সে রজনীতে আমার সুন্দররূপ নিদ্রা হইল না; কারণ, চিন্তাকুল-চিত্তে সুচারু সুষুপ্তি-সমাগম সম্ভব নয়। পরে রাত্রিশেষে কিঞ্চিৎ নিদ্রাকর্ষণ হইতেই আমি কি অপূর্ব্ব ব্যাপারসকলই দর্শন করিলাম! সে সমুদায় আমার এরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়া রহিয়াছে যে, স্বপ্ন কি বাস্তবিক, সহসা অনুভব করা যায় না। আমি জন-সমাজের যে প্রকার বিপর্য্যয় দেখিয়াছি, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তবে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য ও স্বদেশ সম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা দৃষ্টি করিয়াছি, তাহাই যথার্থবৎ বর্ণন করি। কিন্তু স্বপ্নের সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকিলেও না থাকিতে পারে।

আমার বোধ হইল, যেন কোন তিমিরাবৃত রজনীতে ভ্রমণ করিতে করিতে, অকস্মাৎ আকাশ-মণ্ডলের পশ্চিমাংশ দাব-দাহ তুল্য অসামান্য জ্যোতিঃপূর্ণ দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। সেই আশ্চর্য্য তেজো-রাশি দ্রুতবেগে অধোদিকে আগমন করিতে লাগিল। অনুভব হইল,

যেন সূর্য্য-মণ্ডল কোন অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় কারণবশতঃ স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া, পতিত হইতেছে। কিঞ্চিৎ সমীপস্থ হইলে, তাহার অভ্যন্তরে এক পুরুষচ্ছায়া প্রত্যক্ষবৎ আভাসমান হইল। তাহার কিছুকাল পরে, স্পষ্ট দেখিলাম—শুভ্রকান্তি, শুভ্রমাল্যাদি-বিশিষ্ট শুভ্রালঙ্কার-ভূষিত কোন তেজঃ-পুঞ্জ পুরুষ, এক মণিময় দণ্ডহস্তে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছেন। সেই দণ্ডের শিরোভাগে 'ন্যায়' এই অক্ষরদ্বয় অঙ্কিত ছিল এবং দিবসে যেমন বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, সেই তেজোমণ্ডল-মধ্যে ন্যায়-দণ্ডের প্রভা সেইরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ফলতঃ সেই পুরুষের সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া, আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইল, ইনি ধর্ম্ম-পুরুষ; ন্যায়দণ্ড হস্তে করিয়া ভূ লোক শাসনার্থ আগমন করিতেছেন। অনেকেই তাঁহার প্রখর প্রভা সহ্য করিতে না পারিয়া, ভীত-চিত্ত হইল; আর যিনি সহিষ্ণুতা-প্রভাবে তাঁহাকে সুন্দর রূপ নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন, তাঁহার নিকটে তিনি পরম রমণীয় রূপে প্রকাশিত হইলেন। এক কালেই তিনি ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গি দ্বারা কাহাকেও ভয়ে কম্পমান করিলেন, কাহাকেও বা প্রসন্ন-বদনে সুমধুর-হাস্য-প্রকাশ দ্বারা পরমানন্দ-নীরে নিমগ্ন করিতে লাগিলেন। যখন তিনি ভূ-মণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হইয়া, মনুষ্যের দৃষ্টিপথের অন্তর্গত হইলেন, তখন চতুর্দ্দিকে কতকগুলি মেঘাবলি বিস্তার দ্বারা আপনার মহামহিমান্বিত জ্যোতিঃপূর্ণ মূর্ত্তি আবৃত করিয়া, তৎপরিবেশ-স্বরূপ আলোক-ঘটা নানাবর্ণ-ভূষিত ও সর্ব্বলোকের সুখ-দৃশ্য করিয়া, বিকীর্ণ করিলেন। ইতিমধ্যে যাবতীয় লোক বিস্ময়াপন্ন ও শঙ্কাকুল হইয়া, এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমাগত হইল। বোধ হইল, যেন সমুদায় মনুষ্য একত্র উপস্থিত হইয়াছে। অকস্মাৎ —"সত্যের জয়! সত্যের জয়!" বলিয়া, ঘন ঘন আকাশ-বাণী হইতে লাগিল। পরে সেই মহামহিমান্বিত পুরুষ মেঘাভ্যন্তর হইতে কহিতে লাগিলেন,—"মানবগণ! রাজ্যের অবিচার নিবারণার্থে আমার আগমন

হইয়াছে; তোমরা আপন আপন প্রাপ্য বিষয় প্রাপ্ত্যর্থে প্রস্তুত হও।" এই আকস্মিক দৈবধ্বনি শ্রবণ করিয়া, জন-সমাজ ভয়, আশা, হর্ষ ও খেদে যে প্রকার বিচলিত হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

তদনন্তর ধর্ম্ম অনুমতি করিলেন,—"প্রথমতঃ বিষয়াধিকারের বিষয় সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে ধনে যাহার স্বত্ব আছে, তিনি তাহা এই দণ্ডেই প্রাপ্ত হইবেন। অতএব যাহার যত লেখ্য-পত্র আছে, সমস্ত উপস্থিত কর।" ইহা শুনিয়া যাবতীয় লোক স্ব স্ব স্বত্বাধিকার সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বিবিধ প্রকার লেখ্য-পত্র আহরণ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! তাহাদের উপর ন্যায়দণ্ডের জ্যোতিঃ পতিত হইবামাত্র, তাহাদের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হইল। সেই দণ্ডের এ প্রকার আশ্চর্য্য গুণ যে, তদীয় কিরণ-স্পর্শমাত্র যাবতীয় কৃত্রিম পত্র দগ্ধ হইয়া গেল! দহ্যমান পত্রের প্রজ্বলিত অগ্নি, সমুদায় লাক্ষাদ্রব ও অনর্গল ধূমোদ্গম দ্বারা সে স্থান অতি ভয়ানক ও পরম বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। কোন কোন পত্রের দুই চারি পঙ্‌ক্তি ও কোন কোন পত্রের কেবল কতিপয় প্রক্ষিপ্ত অক্ষর নষ্ট হইয়া, তাহার অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল। কিন্তু শত শত মুদ্রার ষ্ট্যাম্পপত্র সকল দাবানল দগ্ধ মহারণ্যের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া, পর্ব্বতাকার হইল। সেই লক্ষ-লক্ষ-মণিময় দণ্ডের জ্যোতিঃ কত কত পরম গুহ্য স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া, অলক্ষিত, অপহৃত ও সংগোপিত লেখ্য-পত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম। প্রধান প্রধান বিচারাগারের সহস্র সহস্র অনুজ্ঞা-পত্র দগ্ধ হইল, ইন্‌সালবেণ্ট্ কোর্টের প্রায় সমস্ত নিষ্কৃতি-পত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল ও যে সকল সম্ভ্রমশালী ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, নির্ম্মুক্ত পুরুষের ন্যায় বিহার ও ব্যবহার করিতেছিলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বন্দী হইয়া, দণ্ডায়মান হইলেন। ইতিমধ্যে উৎকোচ, অপহরণ, প্রতারণা ও বলপ্রয়োগ দ্বারা

যাবতীয় ধন উপার্জ্জিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় পর্ব্বত-প্রমাণ রাশীকৃত হইয়া, মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিল। তথন ধর্ম্মপুরুষ ঘোষণা করিয়া দিলেন,—"এই ধনরাশি হইতে যাহার যত ন্যায্য ধন আছে, গ্রহণ কর"।

উহাতে লোক-সমাজের কি বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিল! সহস্র সহস্র ব্যক্তি অপূর্ব্ব-বেশভূষণ ধারণপূর্ব্বক পরম-রমণীয় রথারোহণ করিয়া, মহাবেগে গমন করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ অবতরণ পুরঃসর গাত্র হইতে সমস্ত বস্ত্রাভরণ উন্মোচন করিয়া, এক সামান্য বসন পরিধান-পূর্ব্বক পদব্রজে চলিলেন। কোন স্থানে দেখিলাম, – লক্ষপতি বা কোটিপতি ধনাঢ্য ব্যক্তি পরমশোভাকর অট্টালিকায় বহুমূল্য অত্যুত্তম আসনে উপবিষ্ট হইয়া, বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে পরমসুখে কাল-হরণ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে একজন সামান্য গৃহস্থ অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে আসনচ্যুত করিয়া দিল, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নির্গত হইয়া, অতি পুরাতন বৃক্ষ-মূল-বিদ্ধ ভগ্ন গৃহে গিয়া বাস করিলেন। কুত্রচ দৃষ্টি করিলাম, যে সকল ধনাসক্ত, মহামান্য মনুষ্য সর্বাধিক ধনাগম করিয়া, অতি উদার-ভাবে ব্যয় ব্যসন করিয়া আসিতেছিলেন ও অতিশয় আড়ম্বর-সহকারে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া, বিপুল কীর্ত্তি-লাভ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহাদের সামান্যরূপ উদরান্ন আহরণ করাও কঠিন হইল এবং কতকগুলি নিরন্ন-নির্ব্বিষয় ব্যক্তি আসিয়া, তাঁহাদের সমুদায় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইল। তদ্ভিন্ন ধনাধিকার-বিষয়ে যে সকল অল্প অল্প পরিবর্ত্তন হইল তাহার বিবরণ করিয়া শেষ করা যায় না। জাগরিত হইয়া যাহা দেখিতেছি, তখন তাহার বিস্তর অন্যথাভাব দৃষ্টি করিয়াছিলাম।

এবম্ভূত অদ্ভুত কাণ্ড সমুদায় অবলোকন করিয়া, বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে অপর এক পরম কৌতূহল-জনক অত্যাশ্চর্য্য মহোপকারী ব্যাপার উপস্থিত হইল। ধর্ম্মপুরুষ মেঘান্তরে অবস্থান পূর্ব্বক

পূর্ব্বোক্ত তাবৎ কার্য্য সমাধা করিয়া, আদেশ করিলেন—"অবনী-মণ্ডলে কেহ অন্যায় মানসম্ভ্রম লাভে সমর্থ হইবে না, অদ্যাবধি সকলেই নিজ নিজ গুণানুসারে পদ প্রাপ্ত হইবে।" এই অতুল হিতকর অনুমতি শ্রবণ করিয়া, লোক-সকল যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠা-পর্য্যাকুল হইল। রূপবান্, বলবান্ ও ধনবান্ মনুষ্যেরা সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মদেবের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায়-দণ্ড-জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া, অবিলম্বে পরাঙ্মুখ হইলেন। তিনি কেবল তাঁহার সর্ব্বগুণময় ন্যায়-দণ্ডের কিরণ বিকীর্ণ করিয়া, সকলকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। উহাতে যাহাদের বিশিষ্টরূপ ধর্ম্ম, বিদ্যা বা বিষয়-বুদ্ধি আছে, তদ্ভিন্ন আর তাবতেই দণ্ড-জ্যোতিঃ দর্শনমাত্রে বিমুখ ও শঙ্কাতুর হইয়া রহিলেন। সেই সকল মহাত্মারা পর্য্যায়ক্রমে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পরম হিতৈষী পুণ্যবান্ লোকেরা প্রথম শ্রেণীতে, বিদ্যাবান্ লোকেরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও বিষয়-নিপুণব্যক্তি সকল তৃতীয় শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইলেন। প্রথম শ্রেণীর শোভা দেখিয়া মন মোহিত হইল। তাঁহাদের কি প্রফুল্ল বদন, সকরুণ নয়ন ও সুমধুর বচন! কি সৌজন্য, কি কারুণ্য-স্বভাব! তাঁহাদিগের পরম পবিত্র জ্যোতিঃ-পূর্ণ মুখশ্রী অবলোকন করিলে, অন্তঃকরণ প্রেমামৃত রসে আর্দ্র হইতে থাকে। কতকগুলি হীন-জাতীয় এবং অজ্ঞাত-কুলশীল মনুষ্যকেও এই শ্রেণী-ভুক্ত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। জাগ্রৎকালে যাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া, আপনাকে অশুচি বোধ করিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম, তাহারা কত শত সদ্‌বংশজ ভদ্র-সন্তানের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিয়াছে, এবং যাঁহাদিগকে পরম তপস্বী ঋষিতুল্য বোধ ছিল, তাঁহারা এই শ্রেণীতে যৎকিঞ্চিৎ স্থানও প্রাপ্ত হইলেন না। কত কত দীর্ঘপুণ্ড্রধারী দাম্ভিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের শত শত আত্মাভিমানী বহুভাষী ছাত্র, এই শ্রেণীতে ভুক্ত হইবার নিমিত্তে বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা করিলেন। অবশেষে

যখন দর্পহারী ধর্ম্মপুরুষ তাঁহাদের মুখ-মণ্ডলোপরি ন্যায়-দণ্ড চালনা করিয়া, তদীয় প্রচণ্ড জ্যোতিঃ বিস্তীর্ণ করিলেন, তখন তাঁহারা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া, তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সংস্থাপনের সময় বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। যত লোক সে শ্রেণীর অধিকারী, সকলেই নিজ নিজ গুণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্তির নিমিত্তে সাতিশয় ব্যগ্র হইলেন। তাঁহাদিগের এইরূপ অবিহিত অনুচিত জিগীষা দেখিয়া ধর্ম্মপুরুষ দণ্ডহস্তে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া, সকলের স্ব স্ব গুণোচিত সম্মান প্রদান করিলেন। সর্ব্বোত্তম ধী শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি-সমুদায়কে সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত করিলেন। যাহাদের তাদৃশ স্বকীয় শক্তি নাই, যাহারা কেবল পরিচিত গ্রন্থ পাঠ দ্বারা বিদ্যাবিষয়ে পারদর্শী হইয়াছে, তাহা-দিগকে তৎপরে স্থাপিত করিলেন। যাহাদিগের অনেকানেক গ্রন্থ পাঠ হইয়াছে, কিন্তু তাদৃশ বিচারশক্তি নাই, তাহারা সর্ব্বশেষে থাকিল। এই-রূপে এক্ষণকার প্রত্যেক বিদ্যাবান্ ব্যক্তি ইহার কোন না কোন স্থানে নিবিষ্ট হইলেন। ফলতঃ, কি বিপর্য্যয়ই দেখিলাম! যাঁহাদের বিদ্যাবিষয়ে বিলক্ষণ খ্যাতি আছে, তন্মধ্যেও অনেকানেক ব্যক্তি অধম স্থানে সংস্থাপিত হইলেন। কতকগুলি বাঙ্গালা-গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু আক্ষেপের কথা কি কহিব, ধর্ম্মপুরুষ তাঁহাদিগকে নিতান্ত অনধিকারী বিবেচনা করিয়া, তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সে শ্রেণীতে কোন স্থানে তাঁহাদের স্থান হইল না। তাঁহাদের এই দারুণ দুরবস্থা দর্শন করিয়া, আমার অন্তঃকরণ দুঃসহ দুঃখ-তাপে তাপিত হইতে লাগিল। ভাবিলাম, এই সকল অবোধ মনুষ্য যে বিষয়ে যশঃ-সৌরভ লাভের বাসনা করে, অধিকারী না হইয়া, তাহাতে কেন প্রবৃত্ত হয়? তবে প্রবোধের বিষয় এই যে, তিনি তাহাদিগকে শ্রেণী বহির্ভূত করিয়া কহিলেন,— "তোমরা প্রতিপত্তি লাভ ও স্বদেশোপকারের উৎকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াছ।

স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকে কখন কোন দেশে জ্ঞানের প্রচার ও প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না। তোমরা কিছুকাল পঠদ্দশায় থাক, পরে মনোরথ পূর্ণ হইলেও হইতে পারে। তোমরা যে সকল প্রস্তাব লিখিয়া থাক, তাহার পূর্ব্বাপর ঐক্য থাকে না, ভাবের প্রগাঢ়তা থাকে না এবং রচনাও পরিপাটি-শুদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ যিনি যে বিষয় রচনা করেন, তিনি তাহা নিয়মিতরূপে শিক্ষা ও তদ্বিষয়ে সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হন। আর অনেকে যৎকুৎসিত অনুপ্রাসের অনুরোধে তাৎপর্য্যের ব্যাঘাত করেন। ইত্যাকার সমস্ত দোষ সংশোধন পূর্ব্বক অভীষ্ট বিষয়ে পারদর্শী হইতে পারিলে, অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে।” যাহারা ভাষান্তরে সামান্যরূপ কথোপকথন শিক্ষা করিয়া, বিদ্যাভিমান প্রকাশ করে, যাহাদের কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্রে কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তাহাদের অপমান দেখিয়া, হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাহারা ধর্ম্মপুরুষের বিস্তর সাধ্য-সাধনা করিয়া তথায় যৎকিঞ্চিৎ স্থান প্রাপ্ত হইল না। আর কতকগুলি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দুরবস্থার বিষয় কি বলিব! তাঁহারা নিরুপবীত হীনজাতীয় শত শত ব্যক্তিকে আপনার অপেক্ষা উচ্চ পদাভিষিক্ত দেখিয়া, অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। আহা! কত কত গুরুদেব ঐ শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, লজ্জায় অধোমুখ হইলেন, এবং তাঁহাদের শিষ্যেরা তাঁহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থানে স্থিতি করিয়া, তাঁহাদের দারুণ দুর্দ্দশা দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই শ্রেণীর লোক-সংস্থাপন সমাপ্ত হইলে, ধর্ম্মপুরুষ বিষয়ীদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহা শুনিয়া, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রতাপান্বিত মানগর্ব্বিত শত শত ব্যক্তি, সবিশেষ-উৎসাহ-সহকারে সদর্প পাদবিক্ষেপপূর্ব্বক আগমন করিলেন। ধর্ম্মদেব ন্যায়-দণ্ডের সুবিমল প্রভায় তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ অবলোকন করিয়া কহিলেন,—“তোমরা এ বিষয়ে উপযুক্ত বটে; তোমরা

উদ্যোগী, পরিশ্রমী ও কর্ম্মদক্ষ ; তোমাদের বিলক্ষণ বিষয়জ্ঞান আছে, কিন্তু ধর্ম্মরক্ষায় যত্ন নাই ; তোমরা স্বার্থ-পরবশ হইয়া, পর-পীড়া কর, উৎকোচ গ্রহণ কর, এবং স্বীয় প্রভুর অপচয় কর। এ সকল কুব্যবহার পরিত্যাগ না করিলে, কোন প্রকারে তোমাদের সম্ভ্রম জনক পদলাভে অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।" এই কথা বলিয়া, তাহাদের মধ্যে শতকে এক বা দুইজনকে গ্রহণ করিয়া, অপরাপর সকলের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। তদনন্তর তিনি সংসারের বিষয় কার্য্য-সম্পাদনার্থে পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর কতক লোক আহ্বান করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যেমন জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মশীল, বিষয়কার্য্যে সেরূপ অভিজ্ঞ ও অনুরক্ত নহেন। তবে যে কয়জন ত্রি-গুণ-সম্পন্ন, সুতরাং তিন শ্রেণীতে উপযুক্ত ও পদগ্রহণে সম্মত ও অভিলাষী হইলেন, তাঁহাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট সম্ভ্রান্ত পদ সমুদায় সমর্পণ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করিয়া দিলেন, ভূ-মণ্ডলে ইহারাই সর্ব্বমান্য পরম পূজ্য প্রধান মনুষ্য। তৎপরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, যাহারা দুই গুণসম্পন্ন তাহাদিগকে তদপেক্ষা অপকৃষ্ট পদে স্থাপন করিলেন এবং অবশেষে যাহাদের কেবল বিষয়-কার্য্যে নৈপুণ্য আছে, তাহাদিগকে অতি অপকৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদে নিযুক্ত করিলেন, আর উৎকোচগ্রাহী পরপীড়ক পাপাত্মা অপহারীদিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তন্মধ্যে দেখিলাম, পূর্ব্বে যাঁহারা রাজ-সংক্রান্ত উন্নতপদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এইরূপ মানচ্যুত ও তিরস্কৃত হইয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহারা যাহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করিতেন না, তাহারা পদস্থ হইয়া, তাঁহাদের এইরূপ বিষম দুর্দ্দশা দর্শন করিতে লাগিল। কতিপয় ইংরেজ-জাতীয় রাজকর্ম্মচারীর অপমানের কথা কি কহিব! তাঁহারা ক্রমাগত নানা দুষ্টাচরণ করিয়াও একাল পর্য্যন্ত কেবল সহায়-বলে ও বুদ্ধি-কৌশলে সমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে ধর্ম্ম-পুরুষের ন্যায়রূপ

দণ্ড-জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া, লজ্জিত ও অপমানিত হইলেন, এবং কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাদের পদে অভিষিক্ত হইয়া যশস্বী হইতে লাগিলেন।

কিন্তু ইহাতেও বিস্তর মান্য পদ শূন্য থাকিল দেখিয়া, ধর্ম্ম-পুরুষ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কতকগুলি জ্ঞানাপন্ন শান্ত-স্বভাব পরিশ্রম-বিমুখ ব্যক্তিকে যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া মৃদুভাবে মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন,—"তোমরা বিদ্যাবান্ ও ধর্ম্মশীল বটে; কিন্তু এ প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া, আলস্যের বশীভূত থাকা উচিত নয়। কতকগুলি পুস্তক-সমভিব্যাহারে বিরলে কাল-যাপনার্থে বিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই, এবং সংসারের শুভাশুভ তাবৎ বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া, অনুৎসাহে কালক্ষেপণ করাও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়। ভূ-মণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া, যদি সংসারের কার্য্যই না করিলে, তবে জীবন ধারণের ফল কি? শিক্ষিত বিদ্যাকে যদি জগতের উপকারার্থে নিয়োগ না করিলে, তবে সে বিদ্যার প্রয়োজন কি? যদি সকলেই তোমাদের ন্যায় বৃথা কাল হরণ করে, তবে এক দিবসেই লোক-যাত্রার উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত হয়। তোমরা বলিয়া থাক, আমরা আকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সন্তোষ অবলম্বন করিয়াছি; কিন্তু তোমাদের যে প্রকার হীন অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়। তোমরা কোনক্রমে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছ; সমুচিত অন্ন-বস্ত্রাদি আহরণেও সমর্থ নহ। যথেষ্ট উপাদেয় অন্ন, অক্লেশ-জনক পবিত্র বস্ত্র, প্রশস্ত পরিষ্কৃত বাটী, এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাভাবে তোমাদের পরিবারেরা ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইয়া অশেষ-প্রকার দুঃখ পাইতেছে; তাহাদের রোগ হইলে ব্যয়সাধ্য প্রযুক্ত তাহার যথোচিত চিকিৎসা হয় না, স্বচ্ছন্দভাবে তোমাদের সন্তানদিগের শরীরপুষ্টি ও মনঃস্ফূর্ত্তি হয় না এবং ধনাভাবে

তাহারা উৎকৃষ্ট শিক্ষাও প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে তোমাদের দ্বারা বিবিধ-মতে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হইতেছে। ক্ষমতা সত্ত্বে এ প্রকার অবস্থায় তৃপ্ত থাকিয়া, এই সমস্ত দুঃখ-নিরাকরণে যত্ন না করা, অবশ্যই দূষণীয় বলিতে হয়। আমার অঙ্গ-স্বরূপ যে সন্তোষ, তাহার এরূপ স্বভাব নয়। আপন আপন ক্ষমতানুযায়ী অবস্থাতে তৃপ্ত থাকা এবং যে দুঃখ নিবারণের উপায় নাই, তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রসন্ন-ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই প্রকৃত সন্তোষের লক্ষণ। এইরূপ সন্তোষে পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা দুইই আছে। অতএব তোমাদের আত্ম-হিত ও সংসারের উপকারার্থে সচেষ্ট হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; তাহা হইলে, তোমরাই এই সকল সম্ভ্রান্ত পদের অধিকারী হইতে পার।"

ধর্ম্মের এই সকল মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া, আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং সাতিশয় শ্রদ্ধাবিষ্ট হইয়া, মনে মনে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিলাম। এমন সময়ে উদাসীনদিগের স্থানান্তর-যাত্রার্থ উদ্যোগ-ধ্বনি শুনিয়া, আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তখন আমি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলাম এবং এই পরম রমণীয় স্বপ্ন-ব্যাপার সম্পূর্ণ সফল হউক বলিয়া বার বার প্রার্থনা করিলাম।

প্রভু ও ভৃত্যের ব্যবহার

একাল পর্য্যন্ত জনসমাজে যেরূপ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তদনুসারে সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে প্রধান ও নিকৃষ্ট নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে হইয়াছে। বিদ্যা, ধন, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতরবিশেষই এরূপ শ্রেণী-ভেদের মূলীভূত। এপ্রকার শ্রেণী-ভেদ হইলে, সুতরাং কাহাকেও বা সেবক অর্থাৎ ভৃত্য, কাহাকেও

সেব্য ও সেবক

বা সেব্য অর্থাৎ প্রভু হইতে হয়। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে স্ব-তন্ত্র কেহই নহে, উভয়েই পরতন্ত্র। উভয়েই পরস্পর সাহায্য-সাপেক্ষ। প্রভু আপনার অর্থ দিয়া ভৃত্যের আনুকূল্য করেন, ভৃত্য তদ্‌বিনিময়ে পরিশ্রম দিয়া প্রভুর উপকার করে। অতএব ভৃত্যকে হেয় ও জঘন্য জ্ঞান করা প্রভুর পক্ষে উচিত নয়, প্রভুর আজ্ঞা অবহেলা করাও ভৃত্যের পক্ষে বিধেয় নয়। তাঁহাদের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দুই চারি কথার উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। অগ্রে প্রভুর কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ ভৃত্যের কর্ত্তব্য লিখিত হইতেছে।

ভৃত্যের প্রতি সদয় ব্যবহার

ভৃত্যদিগের প্রতি সতত সদয় ব্যবহার করা উচিত। তাহাদিগকে প্রহার ও প্রভুত্ব প্রদর্শন এবং তাহাদের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করা কোন মতে বিহিত নহে। তাহাদের প্রতি এরূপ ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে, তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত রোষ ও বিদ্বেষের উদ্রেক হইয়া থাকে। মান-অপমান ও সুখ-দুঃখ বোধ সকলেরই তুল্যরূপ, এই পরম কল্যাণকর যথার্থ তত্ত্ব প্রভুদিগের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

ভৃত্যের প্রতি কর্ত্তব্য

ভৃত্যদিগের অবস্থা মন্দ বলিয়া, তাহাদের উপর অত্যাচার করা কোন-মতে উচিত নয়। তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ, বাৎসল্য ও সৌজন্যপ্রকাশ করা এবং যখন যে বিষয়ে আদেশ করিতে হয় তাহা প্রসন্নভাবে অকর্কশ মৃদু বচনে করাই শ্রেয়ঃকল্প। তাহারা যদি প্রভুর কার্য্যে অনুরক্ত থাকিয়া উচিত মত ব্যবহার করে, তাহা হইলে, তাহাদিগকে বিশিষ্টরূপ যত্ন ও আদর করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহাদের শরীর অসুস্থ ও অস্বচ্ছন্দ হইলে, তৎপ্রতীকারার্থে সম্যগ্‌রূপে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; তাহারা কোন দুর্ব্বিপাকে পতিত হইলে, উদ্ধার করা বিধেয়; তাহাদের ক্লেশ-নিবারণ ও অবস্থার উন্নতি-সাধনার্থ

সুমন্ত্রণা প্রদান করা আবশ্যক। এদেশে অনেক ব্যক্তি ভৃত্যাদিগের প্রতি যেরূপ কটূক্তি ও কঠোর ব্যবহার করেন, তাহা অত্যন্ত গর্হিত। তাঁহারা অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি যেরূপ অকথ্য অশ্রাব্য শব্দসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিলে, লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়। অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করিলে যে ভদ্রলোকের ভদ্রতা-গুণের ব্যতিক্রম হয়, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। একারণে এদেশে যাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সহিত সহবাস, ও কথোপকথন করা যথার্থ ভদ্র-প্রকৃতি সুশীল ব্যক্তির পক্ষে কঠিন কর্ম্ম। অন্যের প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক কটূবাক্য প্রয়োগ করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিলে যে স্বকীয় স্বভাবকে কলঙ্কিত করা হয়, ইহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম নাই।

প্রভুর প্রতি ভৃত্যের কর্ত্তব্য

প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহার অন্যথাচরণ দ্বারা সংসারে বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ভৃত্যের অহিতাচারে তদীয় স্বামীর যত উৎপাত উপস্থিত হয়, প্রভুর অত্যাচারে ভৃত্যের তত হইতে দেখা যায় না। অপহরণ ও বিশ্বাস-ঘাতকতা যে ভৃত্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত কর্ম্ম, ইহা বলা বাহুল্য। তাহারা স্বামিকর্ত্তৃক যে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহা সবিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক সুচারুরূপে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। স্বামীকে সম্যক্-প্রকারে সমাদর করা ও তাঁহার সন্তোষ-সাধনার্থে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা আবশ্যক। নিতান্ত চাটুকার হওয়া দূষণীয় বটে, কিন্তু ন্যায়ানুগত আচরণ দ্বারা প্রভুর সন্তোষ সম্পাদনার্থ যত্নবান্ থাকা কদাচ দূষ্য নহে, প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রভুর কার্য্য নিজ কার্য্য জ্ঞান করা, প্রভুর সম্পদে সম্পদ্ ও বিপদে বিপদ্ বোধ করা, প্রভুর দুঃসময় ঘটিলে, সাধ্যানুসারে আনুকূল্য করা এবং প্রভুর উপকার করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ

বোধ করিয়া প্রফুল্ল ও প্রসন্নচিত্ত হওয়া প্রভু-পরায়ণ পুণ্যশীল সেবকের প্রধান কর্ম্ম। প্রভুর কার্য্যে অবহেলা করিয়া আত্মকার্য্য সাধন করা এবং প্রভু-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে যে সময়ে প্রভুর কর্ম্ম বিহিত, সে সময় কর্ম্মান্তরে ক্ষেপণ অথবা নিরর্থক গল্প করিয়া নষ্ট করা, কোনক্রমে কর্ত্তব্য নয়। প্রভু কোন কার্য্যে প্রেরণ করিলে, অনেকে যে স্থানান্তরে ও কার্য্যান্তরে কালক্ষেপ করিয়া আইসে, উহা কাহারও অবিদিত নাই। এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার অত্যন্ত দূষ্য ও ঘৃণাকর। এরূপ আচরণ নিতান্ত স্বার্থপরতার লক্ষণ। প্রভুর কার্য্যে যত্ন ও অনুরাগ থাকিলে, এরূপ ব্যবহার করিতে কোনরূপে প্রবৃত্তি হয় না।

বিশ্ব-মানবতা

পরমেশ্বর যেমন আমাদের সকলের পিতৃতুল্য, সেইরূপ, যাবতীয় মনুষ্য আমাদের ভ্রাতৃ-সমান। অতএব আমাদের উচিত, আমরা সকলকে সহোদরের সদৃশ জ্ঞান করি, সকলের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত থাকি এবং সাধ্যানুসারে সকলের মঙ্গল-চেষ্টা পাই। মনোমধ্যে দ্বেষহিংসাকে স্থান দিও না, ভ্রমেও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিও না এবং পরোপকাররূপ ব্রতপালনে কদাচ পরাঙ্মুখ হইও না। সাধুগণের সহিত সতত সহবাস করিবে এবং সকল গুণের ভূষণ স্বরূপ বিনয় ও শিষ্টাচার অবলম্বন করিয়া, সকলের প্রিয়পাত্র হইবে। কেবল পরিবার-প্রতিপালন ও স্বজনের শুভানুসন্ধান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা, মনুষ্যের পক্ষে উচিত নয়। যাহাতে স্বদেশে জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, স্বদেশীয় কুরীতি-সকল পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হয় এবং স্বদেশস্থ লোকের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নত হয়, তাহার উপায় ও উদ্যোগ করা, অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্বদেশ, আমাদের সকলের গৃহ-স্বরূপ। স্বদেশের শুভানুষ্ঠানে উপেক্ষা করা, অধম লোকের স্বভাব।

তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের প্রতি উপদেশ

যৌবন বিষম কাল। যৌবনের প্রারম্ভে ইন্দ্রিয় সকল প্রবল হয়, অন্তঃকরণে বৃত্তি-সমুদায় সতেজ হয় এবং অশেষবিধ সুখ-ভোগের বাসনা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই কাল পাপ ও পুণ্য উভয় পথের সন্ধি-স্থল। তোমরা সেই সন্ধি-স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছ; অতএব এই সময়ে বিচার করিয়া সৎপথ অবলম্বন কর। যেমন অন্ধের পক্ষে সুশোভন চিত্র ও বধিরের পক্ষে সুমধুর সঙ্গীত কোন কার্য্যের নয়, সেইরূপ অনুপদিষ্ট অধিক-বয়স্ক ব্যক্তিকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে কোন ফল দর্শে না।

পরমেশ্বর তোমাদিগকে সংসার নির্ব্বাহে সমর্থ করিবার অভিপ্রায়ে কাম-ক্রোধাদি কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, ইহা যথার্থ বটে; কিন্তু তিনিই আবার তোমাদিগকে সে সমুদায় শাসন করিতে সক্ষম করিয়াছেন। একান্ত যত্ন করিলে শাসন করিতে পারিবে। যদি নির্জ্জনে থাকিলে কোন দুষ্প্রবৃত্তির সঞ্চার হয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ সচ্চরিত্র শান্ত জনের সমাজে গমন করিবে। অসৎ লোকের সংসর্গ, অসৎ বিষয়ের পুস্তক পাঠ ও অসৎ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইও না। পাপরূপ পিশাচ কখন কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া মনোমন্দিরে প্রবেশ করিবে, কে বলিতে পারে? ধনকষ্টই উপস্থিত হউক, গুরুতর বিপদই বা পতিত হউক, কেবল ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র বন্ধু;—এই সুধাময় মহাবাক্য সকল অবস্থাতেই স্মরণ রাখিবে। যে মোহান্ধ ব্যক্তি, পরম পবিত্র পুণ্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ক্লেশকর বোধ করে, সে কোনকালে পুণ্যজনিত সুখস্বরূপ সুধা-পানে অধিকারী হয় না।

সৎকথন ও সদাচার

১। কোন ব্যক্তি গ্রীস-দেশীয় এরিষ্টটল-নামক জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"মহাশয়! অসত্য-কথনে উপকার কি?" এরিষ্টটল উত্তর দিলেন,—"এই উপকার যে, সত্য বলিলেও লোকে বিশ্বাস করে না।"

২। কোন ব্যক্তি স্পার্টা রাজ্যের অধীশ্বর এজেসিলস্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মহারাজের বিবেচনায় বাল্যকালে কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করা উচিত?" নৃপতি উত্তর করিলেন,—"যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় যে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, বাল্যকালে তাহাই শিক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা উচিত কর্ম্ম।"

৩। একদা এন্টেনায়ইস্ পায়স্ নামে এক পরম দয়ালু সুশীল ব্যক্তি রোমক রাজ্যের রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহার সভাস্থ কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে যুদ্ধ-বিষয়ণী জয়শ্রীলাভে সমুৎসুক করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন,—"সহস্র শত্রু নিধন করা অপেক্ষা একটি প্রজার প্রাণ রক্ষা আমার অধিক বাঞ্ছিত।"

৪। রোমক রাজ্যের অধিপতি টাইটস্ একদিন রাজ্যের কল্যাণকর কোন কর্ম্ম করেন নাই, ইহা রজনীতে স্মরণ হওয়াতে, তিনি পারিষদ-বর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মিত্রগণ! আমি একটি দিন নষ্ট করিয়াছি।"

৫। ইংলণ্ডাধিপতি মহানুভব আলফ্রেডের তুল্য জ্ঞানবান্, দয়াবান্, উৎকৃষ্ট নৃপতি অতি দুর্লভ। তিনি সময়কে বহুমূল্য সম্পত্তি বিবেচনা করিতেন; এক মুহূর্ত্তও নিরর্থক ক্ষেপণ করিতেন না। তিনি অহোরাত্রকে

ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া, এক এক প্রকার কর্ম্মনির্ব্বাহার্থ এক এক ভাগ নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শরীরে প্রবল রোগ সত্ত্বেও তিনি আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম বিষয়ে বিংশতি দণ্ডের অধিক ক্ষেপণ করিতেন না; অবশিষ্ট চল্লিশ দণ্ডের মধ্যে রাজ-কার্য্যে বিংশতি দণ্ড এবং লিখন-পঠন ও ঈশ্বরোপাসনায় বিংশতি দণ্ড ক্ষেপণ করিতেন। তিনি সময়কে সামান্য বস্তু জ্ঞান করিতেন না; প্রত্যুত, এইরূপ বিবেচনা করিতেন, -- পরমেশ্বর আমার হস্তে ঐ অমূল্য সম্পত্তি, সমর্পণ করিয়াছেন; অতএব তদর্থে আমাকে তাঁহার নিকট দায়ী হইতে হইবে।

৬। লাইকর্গস্-নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী স্পার্টা নগরের ব্যবস্থাপক ছিলেন। তথাকার এক দুর্ব্বিনীত যুবা রাজবিদ্রোহী হইয়া তাঁহার এক চক্ষু উৎপাটন করাতে, নগরবাসীরা তাহাকে ধরিয়া, লাইকর্গসের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিল—"আপনি ইহাকে স্বেচ্ছানুরূপ শাস্তি প্রদান করুন।" লাইকর্গস্ তাহাকে শাস্তি প্রদান না করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সুশিক্ষিত ও সুবিনীত করিয়া নগর-নিবাসীদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া কহিলেন,—"যখন আমি তোমাদের নিকট এই ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তখন ইনি উগ্রস্বভাব ও পরদ্রোহী ছিলেন, এখন ইঁহাকে শান্ত ও সুজন করিয়া প্রত্যর্পণ করিতেছি।" তাহারা লাইকর্গসের এতাদৃশ অসামান্য সৌজন্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

৭। গ্রীস দেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী মেগারা নগরে ষ্টিপো নামে এক পণ্ডিত বাস করিতেন। যে সময়ে ডেমিট্রিয়স্ উল্লিখিত নগর অধিকার করিয়া তদীয় ধন-দ্রব্যাদি অপহরণ করেন, তখন ঐ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, -- "নগর লুণ্ঠন করাতে তোমার কি কিছু অপচয় হইয়াছে?" পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "কিছুমাত্র হয় নাই। সংগ্রাম আমাদের ধর্ম্মও

হরণ করিতে পারে না এবং বিদ্যা ও বাক্‌পটুতাও নষ্ট করিতে পারে না; আমার সম্পত্তি নির্ব্বিঘ্নে আছে, কারণ উহা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে।”

৮। কোন নৃপতি কন্যা-শোকে সাতিশয় কাতর হওয়াতে, এক পণ্ডিত তাঁহাকে কহিলেন,—“কখন কোন শোকের বার্ত্তা জানে না, এই প্রকার তিনটি লোক যদি নিরূপণ করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমার দুহিতাকে পুনর্জীবিতা করিয়া দিব।” নৃপতি অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কুত্রাপি এরূপ লোক না পাইয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

৯। এপিক্‌টিটস্‌-নামক গ্রীক্ জাতীয় পণ্ডিত, প্রথমে একজন ধনাঢ্য রোমকের দাসত্ব-ক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিলেন। দাসত্ব-মোচন হইলে পর, তিনি অত্যন্ত প্রাজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথায় ও কার্য্যে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ছিল না। যেরূপ উপদেশ দিতেন, নিজে তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন। দাসত্বাবস্থায় তদীয় স্বামী এক দিবস অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে তাঁহার এক জঙ্ঘা ধরিয়া নোয়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার সহিষ্ণুতা-শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত উত্তরোত্তর অধিক বল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সে সময় এপিক্‌টিটস্‌ কেবল এই কথাটি কহিয়াছিলেন, “ইহাতে আমার জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া যাইবে।” বাস্তবিক তদীয় স্বামীর নিষ্ঠুরাচরণে তাঁহার জঙ্ঘা ভগ্ন হইল। তখন নিতান্ত শান্তস্বভাব এপিক্‌টিটস্‌ কহিলেন, “আমি তো বলিয়াছিলাম, জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া যাইবে।” কি আশ্চর্য্য! এতাদৃশ সহিষ্ণুতা ধরণীতলে অতীব দুর্লভ।

১০। জগদ্বিখ্যাত সর্ আইজাক্ নিউটন আপনার অসামান্য বুদ্ধিবলে জ্যোতিষাদি বিবিধ বিদ্যার আত্যন্তিকী শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কহিয়াছিলেন,—“আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি; কিন্তু জ্ঞান-মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।”

সক্রেটিস্-নামক গ্রীস্-দেশীয় সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত এই কথা বলিয়া গিয়াছেন,— "আমি কেবল এইটি নিশ্চিত জানি যে, আমি কিছুই জানি না।"

১১। সক্রেটিস্ প্রকৃত জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি স্বদেশীয় কুরীতি-সংশোধন, স্বজাতীয় পণ্ডিতদিগের ভ্রম-নিরাকরণ ও বালকগণের সৎশিক্ষা-সংশোধন-বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু ঐ পণ্ডিতেরা আপনাদিগের ভ্রান্তি স্বীকার না করিয়া, সক্রেটিসের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিল; মিথ্যাপবাদ প্রচার দ্বারা অপরাপর লোক-দিগকে তাঁহার বিপক্ষ করিয়া তুলিল এবং চক্রান্ত করিয়া, তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইল। তাহারা অমূলক অপবাদ দিয়া, তাঁহার নামে অভিযোগ করিল, এবং প্রাড়্‌বিবাকেরাও পক্ষপাত করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিল। বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইলে পর, তিনি প্রাড়্‌বিবাকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"এক্ষণে আমার প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত, আমি জীবন বিসর্জ্জন করিতে যাই, তোমরা জীবন যাপন করিতে যাও; কিন্তু ইহার মধ্যে কাহার ভাগ্য ভাল, তাহা পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্যে জানে না।"

১২। তিনি প্রাণদণ্ড-বিষয়ক অনুমতি প্রাপ্তির পর ত্রিশ দিন কারা-রুদ্ধ ছিলেন। ঐ কয়েক দিবস তদীয় মিত্র ও শিষ্য সমুদায় সতত তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিল; তিনি অবিষণ্ণ-হৃদয়ে ও অম্লানবদনে তাঁহাদের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া এবং জীবনান্ত পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া কালহরণ করিয়াছিলেন, ক্ষণমাত্র বিষণ্ণ ছিলেন না, এবং অন্যকে তাঁহার নিমিত্ত শোকান্বিত দেখিলে হিতগর্ভ বচনে অনুযোগ করিতেন। 'নিরপরাধে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হইল' এই কথা উল্লেখ করিয়া একজন শিষ্য সাতিশয় শোকাকুল-হৃদয়ে বিলাপ করিতেছিল। তাহা শুনিয়া সক্রেটিস্ কহিলেন,—"তোমার কি বাসনা, আমি সাপরাধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিব?"

১৩। সক্রেটিসের মিত্রবর্গ মধ্যস্থ হইয়া তদীয় উদ্ধারের উপায় করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি তাহাতে কোন মতেই সম্মত হন নাই। ক্রিটো নামে তাঁহার এক শিষ্য কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া দিবার মন্ত্রণা স্থির করিয়াছিলেন। সক্রেটিস শুনিয়া কহিলেন,—"ক্রিটো ! আমি এই সর্ব্বজনাধিগত অপরিবর্ত্তনীয় নিয়তি পরিহারার্থে কোথায় পলায়ন করিব ?"

ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি

পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তিনি ভূমণ্ডলস্থ সমুদায় প্রাণীকেই ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মনুষ্যকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভে অধিকারী করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। এই দুই বিষয়ের ক্ষমতা থাকাতে, মনুষ্য-নামের এত গৌরব হইয়াছে, এবং এই দুই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেই মনুষ্যের যথার্থ মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়। সুখ যে এমন অনির্ব্বচনীয় পরম প্রার্থনীয় পদার্থ, ধর্ম্মস্বরূপ রত্নজ্যোতি তদপেক্ষাও শতগুণ উৎকৃষ্ট। যদিও সকল লোকে প্রায় সুখোদ্দেশেই সমস্ত কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকে, কিন্তু যে স্থলে কোন পুণ্য-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, আপাততঃ ইন্দ্রিয়-সুখের অল্পতা ও বৈষয়িক ক্লেশের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে যিনি ধর্ম্মার্থে সুখ-বিসর্জ্জন ও ক্লেশ স্বীকার করেন, আমরা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অঙ্গীকার করি, এবং তাঁহাকে মনের সহিত প্রীতি ও প্রশংসা করিয়া থাকি। আর যিনি তুচ্ছ সুখানুরোধে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত হন, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকি।

ধর্ম্মের মহিমা

বিশুদ্ধ-সুখ-সম্ভোগ পরম পবিত্র পুণ্যক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান-কালে স্বকীয় সুখোদ্দেশে কার্য্য করা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্বভাব-সিদ্ধ নহে। যখন কোন দয়াবান্ সাধু ব্যক্তি কোন মনুষ্যকে গৃহ-দাহে দগ্ধ হইতে দেখিয়া অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিয়াও, তৎক্ষণাৎ তাহাকে রক্ষা করিতে ধাবমান হন, তখন তিনি মনে মনে ঐহিক বা পারত্রিক সুখ-লাভের প্রত্যাশা ও পর্য্যালোচনা করিয়া ঐ অসমসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না। মুমূর্ষু ব্যক্তির উপস্থিত দুঃখ ও আসন্ন বিপদ্ দৃষ্টি করিয়া তাঁহার দয়া-সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এই নিমিত্ত, তিনি স্বকীয় কারুণ্য ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও, সেই ব্যক্তির যন্ত্রণা নিবারণ ও প্রাণরক্ষার্থ যত্নবান্ হন। ভোগাসক্ত ধনাঢ্যদিগের শোভাকর অট্টালিকা, উত্তম বেশ ভূষা, বহু মূল্য যান, অবিশ্রান্ত আমোদ প্রমোদ প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুরূপ ঐশ্বর্য্য ভোগে অনেকের অভিলাষ হইতে পারে বটে, কিন্তু যে মহাত্মা যথার্থ ধর্ম্ম-প্রচারার্থে কঠিন নিগ্রহ স্বীকার ও অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, অথবা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র পাঠ ও কীর্ত্তি শ্রবণ করিলে, তাঁহাকে একান্ত মনে আশীর্ব্বাদ করিতে ও মনুষ্যের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিতে সকলেরই প্রবৃত্তি হয়। অতএব ধর্ম্মরূপ মহারত্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ। এই পরম পদার্থের স্বরূপ কি, এবং কোন্ কোন্ কর্ম্মই বা যথার্থ ধর্ম্ম তাহা বিবেচনা করা মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেন?

অপর সাধারণ সকলেই কতকগুলি কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম, আর কতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলিয়া জানেন। ক্ষুধাতুরকে অন্ন-দান, অজ্ঞানকে জ্ঞান প্রদান, বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার, উপকারীর প্রত্যুপকার এই সমুদায়কে সৎকর্ম্ম, এবং অর্থাপহরণ, পরপীড়ন, প্রতারণা, নরহত্যা এই সমুদায়কে অসৎ কর্ম্ম

বলিয়া মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম আছে। কিন্তু আমরা কি নিমিত্ত প্রথমোক্ত কর্ম্ম সমুদায়কে অসৎকর্ম্ম বলিয়া থাকি, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে অগ্রে আমাদের মানসিক প্রকৃতি নিরূপণ করিতে হয়। মানসিক প্রকৃতি নিরূপিত হইলেই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপিত হইবে।

মনুষ্যের মনোবৃত্তি তিন প্রকার; নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। কাম, অপত্য-স্নেহ, অর্জ্জনস্পৃহা, জিঘাংসা প্রভৃতির নাম নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি; উপমিতি অনুমিতি প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা পদার্থ জ্ঞান ও বিচার শক্তি জন্মে, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি; আর উপচিকীর্ষা, ভক্তি, ন্যায়পরতা এই তিন প্রধান বৃত্তির নাম ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। ধর্ম্মাধর্ম্ম অবধারণ ও তাহাদের স্বরূপ নিরূপণ, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বিষয়ক জ্ঞানের উপর অধিক নির্ভর করে, এ কারণ এ স্থলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্বরূপ ও কার্য্যাকার্য্য সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বিবিধ

পরের দুঃখমোচন ও সুখ-বর্দ্ধনের অভিলাষ করা, পরম পবিত্র উপচিকীর্ষা-বৃত্তির স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। কেবল অর্থ দান করিলেই দয়া প্রকাশ হয়, অন্য প্রকারে হয় না, এমত নহে। প্রত্যুত সহস্র প্রকারে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এবং জন-সমাজের শুভ সম্পাদন করিয়া উপচিকীর্ষা বৃত্তিকে চরিতার্থ করা যায়। পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির যতদূর সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহার উপায় করা, জ্ঞানোপদেশ, ধর্ম্মোপদেশ, সদালাপ, সৎপরামর্শ প্রদান প্রভৃতি শুভকর ব্যাপার দ্বারা সকলকে সুখী করিবার চেষ্টা করা, কর্কশ কথা ও কঠোর ব্যবহার দ্বারা অন্য লোককে নিরর্থক দুঃখিত করিতে না হয় একারণ ক্রোধ-নিবারণ এবং বিনয় ও

(১) উপচিকীর্ষা

শিষ্টাচার অভ্যাস করা, লোকের যথার্থ দোষ উল্লেখ করিবার সময়েও রসনা হইতে নীরস শব্দ নিঃসারণ না করিয়া দয়া ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করা, পীড়িত লোকের নিকেতনে ও দরিদ্রদিগের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাহাদের যন্ত্রণারূপ অগ্নি শিখায় শান্তি বারি সেচন করা, চতুর্দ্দিকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম জ্যোতি বিকীর্ণ করিবার নিমিত্তে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা, সমুদয় সংসারকে সুখামৃত রসে অভিষিক্ত করিবার উদ্দেশে সকল কার্য্য সম্পাদন করা এই পরম পবিত্র উপচিকীর্ষা-বৃত্তির উদ্দেশ্য। আপন সন্তানেরই হউক, মিত্রেরই হউক, অপর ব্যক্তিরই বা হউক, সকল লোকেরই কল্যাণ প্রার্থনা ও সুখ চেষ্টা করা এই উপচিকীর্ষার কার্য্য। কোন বিষয়ে স্বার্থানুসন্ধান করা এ প্রবৃত্তির অভিসন্ধি নহে।

"মহৎ ও উত্তম গুণ মনে হইলেই ভক্তির উদয় হয়।" পাত্রবিশেষে ভক্তি, মর্য্যাদা, ও আদর অবেক্ষা করা এই প্রধান প্রবৃত্তির কার্য্য। এই বৃত্তি থাকাতে, আমরা গুরুজনদিগকে ভক্তি করি, গুণী, মানী, বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে শ্রদ্ধা করি, এবং প্রভু ও ভূপতি প্রভৃতি প্রভুত্বশালী ব্যক্তিদিগকে সমাদর ও সম্ভ্রম করি। যাঁহার যত উৎকৃষ্ট গুণ দর্শন ও শ্রবণ করা যায়, তাঁহার প্রতি তত প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হয়। কিন্তু জগদীশ্বর যেমন ভক্তি-ভাজন এমন আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই। তাঁহার অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়, পরমাশ্চর্য্য, পরাৎপর স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, কাহার অন্তঃকরণ প্রগাঢ় ভক্তি রসে আর্দ্র না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে?

(২)
ভক্তি

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে এই প্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উপকারিণী। পরের হিতাভিলাষ এবং পাত্র-বিশেষে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ মাত্র উপচিকীর্ষা ও ভক্তিবৃত্তির কার্য্য। কিন্তু ইতিকর্ত্তব্যতাজ্ঞান, অর্থাৎ অমুক কর্ম্ম আমার কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে, এ প্রকার জ্ঞান করা এই দুই

বৃত্তির কার্য্য নহে, ইহা কেবল ন্যায়পরতার কার্য্য। যখন উপচিকীর্ষাবৃত্তি, কোন যোগ্য পাত্রকে অর্থ দান করিতে প্রবৃত্তি দেয়, এবং ভক্তি, কোন শ্রদ্ধাস্পদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে আদেশ প্রদান করে, তখন তাহাদের উপদেশানুসারে দান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এ প্রকার জ্ঞান হওয়া ন্যায়পরতাবৃত্তির কার্য্য।

(৩)
ন্যায়পরতা

ন্যায্যান্যায্য প্রতীতি করাও এই প্রবৃত্তির স্বভাবসিদ্ধ। ফলতঃ বিচারাগারে যত বিচারক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা কেবল ন্যায়পরতা ও বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি, দোষীর দোষ নিরূপণ ও অভিসন্ধি অবধারণ, এবং তাহার কর্ম্মের ফলাফল বিবেচনা করিয়া থাকে, কিন্তু সেই কর্ম্মটী অন্যায় বা ন্যায় সিদ্ধ তাহা কদাপি প্রতীত করিতে পারে না। কোন বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে, বুদ্ধিবৃত্তি তৎসম্পর্কীয় সমুদায় ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, পরে ন্যায়পরতা-বৃত্তি আবির্ভূত হইয়া তাহা গর্হিত বা অগর্হিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ন্যায্যান্যায্য প্রতীতি করা কেবল ন্যায়পরতা বৃত্তিরই কার্য্য।

যখন ক্রোধাদি প্রবল হইয়া পরের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন ন্যায়পরতা এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিতে থাকে, যে, আত্ম-রক্ষা ও আশ্রিত প্রতিপালনার্থ আততায়ী নিবারণ করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু আততায়ী হইয়া অন্যকে আক্রমণ করা উচিত কর্ম্ম নহে। যখন অর্জ্জন-স্পৃহা বলবতী হইয়া কাহারও অর্থাপহরণ করিতে উদ্যত হয়, তখন ন্যায়পরতা উপস্থিত হইয়া এইরূপ আদেশ করে; পারিবার-প্রতিপালন ও পরোপকার-সাধনার্থ যথানিয়মে অর্থোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তদর্থে পর-ধন-হরণ করা কোন মতে উচিত নহে। যখন উপচিকীর্ষা-বৃত্তি

অত্যন্ত তেজস্বিনী হইয়া পাত্রাপাত্র ও ন্যায্যান্যায্য বিবেচনা না করিয়া যথা-সর্ব্বস্ব দান করিতে প্রবৃত্তি দেয়, তখন ন্যায়পরতা উত্থিত হইয়া এইরূপ উপদেশ করিতে থাকে, দান-ধর্ম্ম প্রধান কর্ম্ম বটে, কিন্তু অপাত্রে ও অন্যায় স্থলে দান করা উচিত নহে। কৃপণতা দোষ বটে, কিন্তু অতিব্যয়শীলতাও সামান্য দোষ নহে। ন্যায়পরতা বৃত্তি এইরূপে অপরাপর সমুদায় বৃত্তিকে সংযত ও শাসিত করিয়া সংসারের অনিষ্টনিবারণে অবিরতই প্রবৃত্ত থাকে।

যাঁহার ন্যায়পরতা বৃত্তি অতিশয় তেজস্বিনী, তিনি কেবল অন্যের শরীর ও সম্পত্তি বিষয়ক অনিষ্ট-সাধন পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত থাকেন না; বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অন্যের সুখ্যাতি-লোপ, প্রণয়-হানি ইত্যাদি ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার করাও বিষম বিগর্হিত বলিয়া জানেন। কিন্তু আপনারই হউক, আর পরেরই হউক, যথার্থ দোষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া থাকেন। সহসা ঋণ-বদ্ধ হইতে চাহেন না, কিন্তু ঋণ-পরিশোধে ও প্রতিশ্রুতি-পরিপালনে সর্ব্বদা সত্বর থাকেন। ন্যায়-পরায়ণ মহানুভব মনুষ্যেরা এই মহীয়সী বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সত্যপালন ও কর্ত্তব্য-সম্পাদনার্থে ধন, মান, খ্যাতি ও প্রভুত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারেন।

উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ন্যায়পরতা এই তিনটি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিষয় এ স্থলে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল; যে কার্য্য এই তিন উৎকৃষ্ট বৃত্তির অনুমোদিত, তাহাই সৎকার্য্য। আর যে কার্য্য ইহাদের অনুমোদিত নহে, তাহাই অসৎ কার্য্য।

ধর্ম্মের স্বরূপ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ

পরমেশ্বর আমাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বৃত্তির এক এক প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা, উপার্জ্জন করা অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রয়োজন, পরোপকার করা উপচিকীর্ষা বৃত্তির প্রয়োজন, কার্য্য-কারণ নিরূপণ করা অনুমিতি বৃত্তির প্রয়োজন, ইত্যাদি। জগদীশ্বর যে কার্য্য সাধনার্থ যে বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োজন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক স্থলে এক বৃত্তির সহিত অন্য বৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়। এক বৃত্তি যে কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, অন্য বৃত্তি তাহা নিষেধ করিতে থাকে। অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি থাকাতে উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্তি হয়, এবং পরিবার প্রতিপালনার্থে উপার্জ্জন করাও বিহিত তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু পরের অর্থাপহরণ করা ন্যায়পরতা বৃত্তির অভিমত নহে। অর্জ্জনস্পৃহা-বৃত্তি পর-ধন-হরণে প্রবৃত্তি দিতে পারে, কিন্তু ন্যায়পরতা-বৃত্তি তাহা নিষেধ করিয়া থাকে ; সুতরাং এক বৃত্তির উপদেশ স্বীকার করিতে গেলে, অন্য বৃত্তির উপদেশ অস্বীকার করা হয়। অতএব, এরূপ স্থলে কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি, অন্য অন্য বৃত্তিকে তাহাদের বশবর্ত্তী করিয়া রাখা উচিত। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায় যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবতঃ হৃদয়ঙ্গম আছে। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হইলে, এই সমস্ত শেষোক্ত প্রধান প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। অতএব, এমন স্থলে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তিকে অনাদর করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বিবিধ মনোবৃত্তি

যদি অপত্যস্নেহ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী না থাকে, তাহা হইলে বিস্তর অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা। যাঁহার অপত্যস্নেহ অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি তাদৃশ তেজস্বিনী নহে, তিনি অত্যন্ত স্নেহাসক্ত হইয়া স্বীয় সন্তানের শুভাশুভ সমুদায় মনোরথ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হন। হিতকারী বা অহিতকারী যে কোন বিষয় দ্বারা সন্তানের মনস্তুষ্টি জন্মে, তাহাই করিয়া থাকেন। এইরূপে, অনেকে সন্তানের অতিভোজনে, আলস্য-বর্দ্ধনে ও পাপাচরণেও উৎসাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু এ প্রকার ব্যবহার আমাদের সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ। বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিরূপিত হয়, সন্তানের সমুদায় অশুভ বাসনা সিদ্ধ করিলে, তাহার অসুস্থতা, অশিষ্টতা, উগ্রভাব প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্ট উৎপাদন করা হয়। যদ্দ্বারা কাহারও ক্লেশ ও অনিষ্ট হয়, তাহা কদাচ উপচিকীর্ষা বৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। নির্ব্বোধ বালকের অন্তঃকরণ অসৎ পথে চালনা করিলে তাহার প্রতি ন্যায় বিরুদ্ধ ব্যবহার করা হয়, অতএব এরূপ আচরণ ন্যায়পরতা-বৃত্তিরও সম্মত নহে। পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি শিশুর ভরণ পোষণ ও সাধ্যমত শুভোন্নতি সাধন করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন, অতএব তাহার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করিয়া অকল্যাণ উৎপাদন করা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত নহে; সুতরাং এরূপ আচরণ পরমেশ্বর বিষয়িণী ভক্তিরও অনুগামী নহে। সন্তানের অসৎ কামনা পরিপূরণ যদিও অপত্য-স্নেহের সম্পূর্ণরূপ গ্রাহ্য, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির গ্রাহ্য নহে; অতএব কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নয়।

অপত্য স্নেহের প্রাধান্যের অপকারিতা

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি বটে, কিন্তু তাহাদেরও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধানার্থে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের সহায়তা আবশ্যক করে। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত প্রগাঢ় অপত্যস্নেহের সহযোগ থাকিলে,

সন্তানকে যেরূপ যত্ন ও উৎসাহ পূর্ব্বক লালন পালন করা যায়, কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দ্বারা সেরূপ করা যায় না। অপরের অপেক্ষা সন্তানের শুভসাধনে যে অধিকতর অনুরাগ হয়, অপত্য-স্নেহই তাহার প্রধান কারণ।

অপত্য-স্নেহের গুণ

অতএব, সকল প্রকার মনোবৃত্তি পরস্পর মিলিত ও অবিরোধী থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তদনুযায়ী ব্যবহারই বৈধ ব্যবহার, এবং তদ্বি-রুদ্ধ ব্যবহারই অবৈধ। যে স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে এই শেষোক্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সমুদায়ের অনুমতি প্রতিপালন করাই শ্রেয়ঃকল্প। এইরূপ ব্যবহারের নামই ধর্ম্ম ও পুণ্য; ধর্ম্ম ও পুণ্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। যেমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোমাবৃত চতুষ্পদ প্রাণীর সাধারণ নাম পশু, এবং কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পক্ষবিশিষ্ট দ্বিপদ প্রাণীর সাধারণনাম পক্ষী, সেইরূপ, সমুদায় বৈধ কর্ম্মের সাধারণ নাম ধর্ম্ম ও পুণ্য। বৈধ কর্ম্মের সহিত ধর্ম্ম ও পুণ্যের কিছুমাত্র বিশেষ নাই। পরস্পর ঐক্যভাবাপন্ন সমুদায় মনোবৃত্তির অভিমত কার্য্যকে বৈধ কার্য্য বলে, তাহাকেই কর্ত্তব্য কহে, এবং তাহাই ধর্ম্ম ও পুণ্য বলিয়া উল্লিখিত হয়।

ধর্ম্ম ও পুণ্য

সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভক্তি, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা এই তিন বৃত্তিরই অভিমত তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল স্থানে পর-স্পর সহকৃত হইয়া একত্র কার্য্য করে এমত নয়। তাহারা অনেক স্থলেই স্বতন্ত্র কার্য্য করে। যদি কোন ব্যক্তি সহসা নদী-গর্ভে পতিত হয় আর অন্য কোন দয়াশীল ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা দেখিতে পান, এবং তাঁহার সন্তরণ করিবার সামর্থ্য থাকে, তবে তিনি স্বভাবসিদ্ধ প্রগাঢ় উপচিকীর্ষামাত্রের বশীভূত হইয়া তাহার উদ্ধারার্থ ধাবমান হইতে পারেন। ঐ কার্য্য ন্যায় সম্মত ও

বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সমন্বয়

ঈশ্বরাভিপ্রেত কি না, তিনি সে সময়ে তাহা বিবেচনা না করিলেও না করিতে পারেন। কিন্তু যখন আমরা স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখি, তখন প্রতীত হয়, এ কার্য্য যেমন উপচিকীর্ষা-বৃত্তির অভিমত, সেইরূপ, ন্যায়ানুগত, বুদ্ধিসম্মত এবং ঈশ্বরাভিপ্রেতও বটে। অতএব সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধি বৃত্তি এ কার্য্যের বৈধতা স্বীকার করিয়া থাকে। এইরূপ সমুদায় ন্যায়-যুক্ত কার্য্যই লোকের উপকারী এবং পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, এবং যে যে কার্য্য পরম পূজনীয় পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত, সুতরাং পরমেশ্বর বিষয়িণী ভক্তির অনুমোদিত তাহা উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতারও সম্মত, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, এক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, তাহা স্বভাবতঃই অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরও অভিমত হইয়া থাকে।

বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য করিলে সকল স্থলে দোষ হয় না বটে, কিন্তু এক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, উপচিকীর্ষা-বৃত্তির সহিত বুদ্ধি ও ন্যায়পরতার সহযোগ না থাকিলে, অপাত্রে দান, অতিব্যয়শীলতা প্রভৃতি নানা দোষ ঘটিতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত না হইলে, ভক্তি-বৃত্তি সৃষ্ট ও মনঃকল্পিত বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়।

একের প্রাধান্যের অপকারিতা

অতএব, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ সমুদায় মনোবৃত্তি পরস্পর মিলিত ও অবিরোধী থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাই কর্ত্তব্য, এবং তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার অকর্ত্তব্য। যে স্থলে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ হয়, সে স্থলে শেষোক্ত প্রধান বৃত্তিদিগের অনুগামী হইয়া কার্য্য করাই শ্রেয়ঃকল্প। কিন্তু সকলের

সমুদয় মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য।

সকল বৃত্তি সমান নয়, কাহারও কাম ও জিঘাংসা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, কাহারও অর্জ্জন-স্পৃহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, কাহারও বা ভক্তি উপচিকীর্ষা সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বিনী। ইহাতে সকল বিষয়ে সকলের সমান ভাব ও সমান অভিপ্রায় হওয়া সুকঠিন। অতএব যাঁহাদের মানসিক বৃত্তি সকল স্বভাবতঃ তেজস্বিনী ও পরস্পর সমঞ্জসীভূত হইয়া থাকে, এবং নানাপ্রকার বিস্থানুশীলন দ্বারা উত্তম রূপ মার্জ্জিত ও পরিশোধিত হয়, তাঁহাদের মনোবৃত্তি সমুদায় পরস্পর অবিরোধী ও মিলিত থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

সৎকার্য্য ও সাধু ব্যবহার

এইরূপে যে সমস্ত কর্ত্তব্য অবধারিত হয়, তাহারই নাম সৎকার্য্য, তাহাই জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, এবং তাহাই একান্ত যত্ন ও অবিচলিত শ্রদ্ধা সহকারে সম্যক্‌রূপে পালন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যবহারকে সাধু ব্যবহার বলে। এইরূপ আচরণ করিলে অতি পবিত্র আত্মপ্রসাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, অন্তঃকরণে যে অসঙ্কোচ সম্বলিত অনির্ব্বচনীয় সন্তোষের উদ্রেক হইয়া থাকে, তাহাকেই আত্ম-প্রসাদ কহে। আত্ম-প্রসাদ অমূল্য ধন। যিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে কহিতে পারেন, আমি নিরপরাধ ও নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করিতেছি—যথাসাধ্য পরোপকার ব্রত পালন করিতেছি—সকল লোকের সহিত অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ন্যায়যুক্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত রহিয়াছি—প্রগাঢ় ভক্তি ও সাতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া রহিয়াছি, তিনি অপ্রাকৃত মনুষ্য। তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধ সুখের নিকেতন। তিনি আপনার নির্ম্মল-জলতুল্য পবিত্র চরিত্র পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। যদিও তাঁহার সাধু ব্যবহার যাবতীয় মনুষ্যের

অগোচর থাকে, সুতরাং একবার মাত্রও লোক-মুখে স্বীয় সুখ্যাতি শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, তথাপি তিনি আপনাকে ধর্ম্মরূপ ব্রত পালনে কৃত-কার্য্য জানিয়া অনুপম সুখ সম্ভোগ করেন। দুঃখীর দুঃখ মোচন, বিপদুদ্ধার, জ্ঞানান্ধকে জ্ঞানোপদেশ-প্রদান ইত্যাদি কোন স্বানুষ্ঠিত সৎ ক্রিয়া এক বার মাত্র স্মরণ করিলে, যেরূপ পরিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, অখণ্ড ভূমণ্ডলের আধিপত্যরূপ প্রচুর মূল্য প্রাপ্ত হইলেও তাহা বিক্রয় করা যায় না। সকলের শুভ সাধন করাই দীন-দয়ালু ধর্ম্মশীল ব্যক্তির সঙ্কল্প, অতএব তিনি সকলেরই প্রিয় হইতে পারেন। আর যদি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ় লোকে তাঁহার কর্ম্মের মর্ম্মবোধে অসমর্থ হইয়া বিদ্বেষ-প্রকাশ ও অনিষ্ট চেষ্টা করে, তথাপি তাঁহার কি করিতে পারে? গতসর্ব্বস্ব হইলেও তিনি অধীর হন না। তিনি আপনার হৃদয়ভাণ্ডারে যে অমূল্য সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন তাহা কাহারও স্পর্শ করিবার সামর্থ্য নাই।

আত্ম-প্রসাদ

আত্ম-প্রসাদ যেমন পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার, আত্ম-গ্লানি ও গতানুশোচনা সেইরূপ পাপানুষ্ঠানের গুরুতর প্রতিফল। যখন কোন দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায়ের অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করিয়া পাপপিঞ্জরে বদ্ধ হই। তৎকালে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় উচ্চৈঃস্বরে নিবারণ করিলেও, আমরা তাহাতে শ্রুতিপাত করি না। কিন্তু রিপু সকল চরিতার্থ হইলে, অবিলম্বে নিরস্ত হয়, এবং তখন গতানুশোচনারূপ অন্তর্দাহের উদ্রেক হইতে থাকে। তখন আপনার আত্মাই আপনাকে গুরুতররূপ তিরস্কার করিতে থাকে। যিনি আপনার কুব্যবহার দ্বারা কাহারও সুখ-রত্ন হরণ করিয়াছেন, অথবা বলে ও কৌশলে কাহারও ধর্ম্মরূপ বিশুদ্ধ ভূষণ ভ্রষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার চিত্ত-ভূমিতে তাহার মলিন

আত্ম-গ্লানি

মূর্ত্তি স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে থাকে। আমার দ্বারা অমুকের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, বা অমুকের পরিবার দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, অথবা সংসারের দুঃখ-স্রোত এত দূর বৃদ্ধি হইয়াছে, আমি জন্মগ্রহণ না করিলে ভূ-মণ্ডলে পাপপ্রবাহ এক্ষণকার অপেক্ষা অবশ্য কিছু না কিছু মন্দীভূত থাকিত, এরূপ স্মরণ ও চিন্তা করা দুঃসহ যাতনার বিষয়। যে ব্যক্তি এরূপ আলোচনা করিয়াও অন্তঃকরণ স্থির রাখিতে পারে, তাহার হৃদয় পাষাণময় তাহার সন্দেহ নাই। যিনি কোন দারুণ দুর্ব্বিপাক বশতঃ স্বকীয় নিষ্কলঙ্ক সুচারুচরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক কোন নির্ধন সামান্য ব্যক্তিকে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছেন তাঁহার আন্তরিক গ্লানি ও অনুতাপজনিত বিষম যন্ত্রণা চিন্তা করিলে, সেই প্রতারিত দুঃখী ব্যক্তিরও দয়া উপস্থিত হয়। আমোদপ্রমোদ যে সমস্ত পাপ কর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহারও সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে কিয়ৎকাল অবাধে ধর্ম্মরূপ পবিত্র ব্রত পালন করিয়া, পরিশেষে রিপুবিশেষের বশীভূত হইয়া, পাপ-পথে পদ চালনা করেন, তিনিই জানেন, অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আমাদের আপন অন্তঃকরণ আমাদিগকে অধর্ম্ম-পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে তিরস্কার করিতে থাকে, কিন্তু আমরা সে উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক যত অত্যাচার করি, ততই আমাদের পাপাচরণ অভ্যাস পায়, এবং অভ্যাস পাইলে ক্রমে ক্রমে গ্লানি ও অনুতাপ জনিত যাতনার হ্রাস হইয়া আইসে, কারণ যেমন প্রস্তরের উপর পুনঃপুনঃ খড়্গাঘাত করিলে, খড়্গের ধার ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হয়, সেইরূপ, পুনঃপুনঃ পাপাচরণ করিলে, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া ধর্ম্মবৃত্তি সকল দুর্ব্বল হয়, সুতরাং তাহাদের তিরস্কার করণের শক্তি ন্যূন হইয়া মনুষ্যকে কেবল নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তির অধীন করিয়া ফেলে। মনুষ্য-কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া পশুবৎ

রিপু-পরতন্ত্র ও রিপু-সেবায় অনুরক্ত এবং পুণ্যজনিত পবিত্র সুখে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে।

কিন্তু, পাপ করিলে সকলের মনে সমান গ্লানি ও সমান অনুশোচনা উপস্থিত হয় এমন নয়। যে ব্যক্তির ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমধিক তেজস্বিনী, দৈবাৎ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে, তাহার যেরূপ মনস্তাপ হয়, ইতর ব্যক্তির কখনই সেরূপ হয় না। যাহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষীণ, সে পাপপঙ্কে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হয়, এবং পুনঃপুনঃ পাপাচরণ করাতে, অবিলম্বে রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত ও অন্যান্য প্রকারে নিগৃহীত হইয়া স্বেচ্ছানুযায়ী উপদ্রব করিতে অসমর্থ হয়।

আত্ম-গ্লানির তারতম্য

যদি পাপ-পুণ্য-জ্ঞান মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ হইল তবে এ বিষয়ে মতামত ও বাদানুবাদ উপস্থিত হইবার কারণ কি? সমুদায় মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাব, অতএব যে বিষয় আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ সে বিষয়ে সকল মনুষ্যেরই একরূপ অভিপ্রায় হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সর্ব্বত্র ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্টি করা যাইতেছে। এক ব্যক্তি যে কর্ম্ম নিতান্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করেন, অন্য ব্যক্তি তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও পরম পবিত্র বোধ করিয়া থাকেন। এক জাতীয়-লোক যে প্রকার ব্যবহার বিষম বিগর্হিত বলিয়া নিন্দা করে, অন্য-জাতীয় লোকে তাহা অতিশয় শ্রেয়স্কর কার্য্য বোধ করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কত দেশে কত প্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ দেশাচার প্রচলিত আছে, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। অতএব, এক মানব জাতি হইতে এরূপ পরস্পর-বিপরীত অভিপ্রায় উৎপন্ন হইবার কারণ কি তাহা বিবেচনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মতভেদ

প্রথমতঃ।—ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, সকল লোকের সকল

প্রবৃত্তি সমান নয়। কাহারও অধিক বুদ্ধি, কাহারও অল্প বুদ্ধি, কাহারও অধিক দয়া, কাহারও অল্প দয়া, কাহারও এক রিপু প্রবল, কাহারও অন্য রিপু প্রবল। কোন বৃত্তি অত্যন্ত বলবতী থাকিলে তদ্দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনার কিছু না কিছু ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। যাহার উপচিকীর্ষা বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল কিন্তু ভক্তি-বৃত্তি-অতিশয় দুর্ব্বল, পরোপকার সাধন করা তাহার যাদৃশ কর্ত্তব্য বোধ হইবে, পরমেশ্বরের বিষয় শ্রবণ মননাদি করা তাদৃশ কর্ত্তব্য বোধ হইবে না। আর যে ব্যক্তির ভক্তি-বৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, কিন্তু উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা অতিশয় দুর্ব্বল, পরমেশ্বরের অথবা মনঃকল্পিত উপাস্য দেবতার জপ, স্তুতি, ধ্যান ও ধারণায় তাঁহার যাদৃশ শ্রদ্ধা ও উৎসাহ জন্মে, যথানিয়মে সাংসারিক-কর্ম্ম-নির্ব্বাহে ও জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তাদৃশ জন্মে না। কাম, অপত্যস্নেহ ও আসঙ্গলিপ্সা প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে, সংসারাশ্রমে অবস্থিতিপূর্ব্বক পরিবার প্রতিপালন করা যেরূপ আবশ্যক বোধ হয়, এ সমস্ত বৃত্তি নিস্তেজ হইলে সেরূপ না হইতে পারে। বোধ হয়, যাঁহাদের এই সমুদায় বৃত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, এবং ভক্তি-বৃত্তি ও কৌতূহলজনক কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় প্রবল তাঁহারাই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক তীর্থ ভ্রমণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকিবেন।

প্রথম হেতু প্রবৃত্তির বিভিন্নতা

দ্বিতীয়তঃ।—বুদ্ধিদোষেও অনেকানেক অবিধেয় কর্ম্ম বিধেয় বোধ হয়, এবং বিধেয় কর্ম্মও অবিধেয় বোধ হয়। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা যে কর্ত্তব্য এ বিষয় সর্ব্ব-বাদি-সম্মত; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিয়া সেই সমুদায় নিয়ম নিরূপণ না করিলে, তাহা জানিতে পারা যায় না। তাতারদেশীয় লোকের বিদেশীয় লোকদিগকে

দ্বিতীয় হেতু বুদ্ধির দোষ

বৈরী বলিয়া হৃদয়ঙ্গম আছে, একারণ তাহারা বিদেশীয়দিগের অর্থাপহরণ ও প্রাণ-সংহার করা শ্লাঘার বিষয় বোধ করিয়া থাকে। ঐরূপ ব্যবহার অত্যন্ত নির্দ্দয় ও ন্যায়-বিরুদ্ধ বলিয়া এমত বিবেচনা করা উচিত নহে যে, তাহাদের কিছুমাত্র দয়া ও ন্যায়পরতা নাই। যদি কোন ক্রমে তাহাদিগের এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারা যায় যে, কোন দেশের লোক তাহাদিগের বৈরী নহে, সকল লোকে তাহাদিগকে মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, এবং পরে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, বিদেশীয় লোকমাত্রেরই ধন প্রাণ হরণ কর্ত্তব্য কি না, তবে আর তাহারা কোনক্রমে ইহা বিধেয় বলিয়া স্বীকার করিবে না। অতএব, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত না হওয়াতেই, এই বিষম দোষাকর কুসংস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় লোকে বিচারস্থলে সাক্ষ্য দান করা দারুণ-দুর্গতি-জনক গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শাস্ত্রে সাক্ষ্যদানের সুস্পষ্ট ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইদানীন্তন লোকেরা সে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলেন না। চিরাগত কুসংস্কার এই অশেষ দোষাকর দেশাচারের মূলীভূত কারণ। কিন্তু যিনি নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চিত জানেন, সাক্ষী হইয়া যথাশ্রুত যথাদৃষ্ট যথার্থ কথা কহিতে কিছুমাত্র দোষ নাই, বরং দুষ্ট-দমন ও শিষ্ট-পালনার্থে সাক্ষ্য প্রদান করা সম্পূর্ণ বিধেয় ও সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। সত্য কথা কহিয়া দোষীর দোষ ও নির্দ্দোষের নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যে উচিত ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

কোন কোন কর্ম্মে কিছু কিছু দোষও আছে, এবং কতক কতক গুণও আছে। যিনি তাহার দোষ ভাগ মাত্র দৃষ্টি করেন, তিনি তাহা দূষ্য বোধ করেন, এবং যিনি গুণ-ভাগ মাত্র দৃষ্টি করেন, তিনি তাহা বৈধ বলিয়া অঙ্গীকার করেন। অল্প বয়সে পুত্রের বিবাহ দেওয়া উচিত কি না এ প্রস্তাব

উত্থিত হইলে এতদ্দেশীয় লোকে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে এই প্রকার বিবেচনা করিয়া থাকেন, যে তদ্দ্বারা অবিলম্বে স্নেহাস্পদ পুত্র-বধূর মুখ-চন্দ্র দর্শন করিয়া আহ্লাদসাগরে অবগাহন করা যায় এবং তাহাকে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অনেক বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা পরম সুখের বিষয়, অতএব অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু দূরদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন, পুত্রবধূর মুখাবলোকন সুখজনক বটে, কিন্তু বালক বালিকা পরস্পর উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইলে পরস্পরের মর্য্যাদা জানিতে পারে না, এবং কাহার কিরূপ চরিত্র তাহাও অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরস্পর-বিরুদ্ধ-স্বভাবাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে চিরজীবন দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করতঃ বিবাদ কলহ করিয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। আর যদি অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি না হইতে হইতে, সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে সে সন্তান দুর্ব্বল, জীর্ণ ও রোগার্ত্ত হয়, এবং অল্প বয়সে কালগ্রাসে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যাচারী পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। তদ্ভিন্ন, যদি বিবাহিত পুত্র অল্প কালে ভার প্রাপ্ত হইয়া রীতিমত বিদ্যা ও বিষয়কর্ম্ম শিক্ষার্থে অবসর না পায়, এবং সেই কারণে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থে পর্য্যাপ্ত উপার্জ্জন করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে দারুণ দৈন্যদশায় পতিত হইয়া চিরজীবন যৎপরোনাস্তি ক্লেশরাশি ভোগ করিতে থাকে। অতএব বাল্য-বিবাহে দোষের ভাগ অধিক। যাহাতে এই সমস্ত সঙ্কট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা কোন মতে আমাদের উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতার অভিমত হইতে পারে না, সুতরাং তাহা কোনক্রমে পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। বাল্য-বিবাহের যৎকিঞ্চিৎ যাহা গুণবৎ আভাস পায় তাহাই লক্ষ্য করিয়া দোষ সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে, এতদ্দেশীয় লোকে বালক পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকে। যে দেশে যত প্রকার কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহার অনেক এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা যেমন কতকগুলি একপ্রকার জন্তুকে পশু, পক্ষী, পতঙ্গ অথবা অন্য কোন সংজ্ঞা দিয়া থাকি, সেইরূপ কতকগুলি একপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াকে এক শ্রেণীতে গণিত করিয়া সত্য, ক্ষমা, দান, চৌর্য্য প্রভৃতি নানা আখ্যা প্রদান করি। ইহার মধ্যে দান, ক্ষমা, সত্য-কথন প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কর্ম্মকে বৈধ এবং অন্য কয়েকজাতীয় কর্ম্মকে অবৈধ বলিয়া জানি। কিন্তু একজাতীয় সমুদায় সৎকর্ম্মও সমান গুণশালী নহে, এবং একজাতীয় সকল কর্ম্মও সমানরূপ দূষণীয় নহে। কাহাকেও দান করিতে দেখিলে সকলে তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, কিন্তু যে স্থলে দান করিলে, কাহারও আলস্য-বৃদ্ধি অথবা কোন কুৎসিত ক্রিয়ায় বা কুৎসিত প্রথায় উৎসাহ প্রদান করা হয়, সে স্থলে দান করা কোনরূপে বৈধ বলিয়া উক্ত হইতে পারে না। ঋণপরিশোধ না করিয়া যথেচ্ছা অর্থদান করা কোন মতেই উচিত নহে। স্থলবিশেষে ক্ষমা করা ভাল বটে, কিন্তু বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া যথাবিধানে দোষীর দণ্ড না করা এবং যে স্থলে ক্ষমা করিলে লোকের উপর উপদ্রব বৃদ্ধি হয়, সে স্থলে ক্ষমা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কেহ কেহ হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া উক্তরূপ স্থলেও দানাদি করা পুণ্যজনক বোধ করেন, কিন্তু তাঁহাদের এরূপ বোধ কোনরূপে যুক্তিসম্মত নহে। এক জাতীয় সমুদায় কর্ম্মকে সমানরূপ গুণশালী জ্ঞান করাতে, ঐরূপ ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ।—আমরা যাহাকে স্নেহ, প্রীতি বা ভক্তি করিয়া থাকি, তাহার চরিত্রের বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার সময়ে দোষ-ভাগকে লঘু ও গুণ-ভাগকে অধিক বলিয়া বোধ হয়। স্নেহপাত্র, প্রেমাস্পদ ও ভক্তিভাজনকে স্মরণ হইবামাত্র অন্তঃকরণ স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া এপ্রকার পক্ষপাত উপস্থিত করে যে, তাহাদিগের দোষভাগকে দোষ বলিয়াই স্বীকার

তৃতীয় হেতু
পক্ষপাতিত্ব

করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাহাদের দোষ সমুদায় লক্ষিত হয় না, গুণভাগ মাত্রই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মিত্রেরা যে মিত্রপক্ষের দোষ দৃষ্টি করিতে অসমর্থ তাহার কারণ এই। প্রত্যুত, শত্রুকে স্মরণ হইলে, দ্বেষানল প্রবল ও ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং তদ্দ্বারা তাহার গুণসমূহ বিস্মৃত হইয়া তিল-প্রমাণ দোষ তাল-প্রমাণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। তাহার দোষভাগের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি থাকে, এবং তাহার প্রতি এরূপ শাত্রব ভাবের আবির্ভাব হয় যে, তদীয় গুণসমূহকে গুণ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। একারণ, অনেকানেক স্থলে শত্রুরা যেমন যথার্থ দোষ নিরূপণ করিয়া মিত্রবৎ কার্য্য করে, মিত্র পক্ষ হইতে সেরূপ হওয়া সুকঠিন। শত্রু বা মিত্র পক্ষ ঘটিত কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে, বিচারকর্ত্তাদিগের পক্ষপাতরূপ গুরুতর দোষে পতিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ব্যতিক্রম হয় না

আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ হইলেও, যে কয়েক কারণে কোন কোন দুষ্কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম ও কোন কোন সৎকর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম জ্ঞান হয়, তাহার বিবরণ করা গেল। তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্বভাবের কদাপি ব্যতিক্রম হয় না। পরের হিতাভিলাষ করা উপচিকীর্ষার স্বভাব, ন্যায্যান্যায্য প্রতীতি করা ন্যায়পরতার স্বভাব, ভক্তি-ভাজনকে ভক্তি করা ভক্তিবৃত্তির স্বভাব, ইত্যাদি যে বৃত্তির যেরূপ স্বভাব নির্দ্দিষ্ট আছে, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হয় না। হয়, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যথোচিত মার্জ্জিত না হওয়াতে সকল কর্ম্মের যথার্থ গুণাগুণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না, নয়, কোন মনোবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলা হইয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের উপদেশ বলবৎ হইতে দেয় না। ইহাতেই স্থলবিশেষে ধর্ম্মকে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। অম্ল, মধুর, কটু, তিক্তাদি অনুভব করা আমাদের যেরূপ স্বভাব-সিদ্ধ, ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রতীতি করাও সেইরূপ স্বভাব সিদ্ধ

তাহার সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায় স্ব স্ব স্বভাবানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে প্রবৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক আপনাদের সর্ব্বপ্রাধান্য জ্ঞাপন করিতেছে, এবং মার্জ্জিত বুদ্ধির সহকৃত হইয়া সর্ব্ব-ধর্ম্ম-প্রয়োজক পরমেশ্বরের প্রকৃতি অনুমতি প্রচার করিতেছে। তাহাদিগকে তাঁহার প্রতিনিধি জ্ঞান করা উচিত, এবং তাহাদের আদেশ তাঁহারই আদেশ জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে পরিপালন করা কর্ত্তব্য।

পাপ ও পুণ্য, দণ্ড ও পুরস্কার

জগদীশ্বর যেমন আমাদিগকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাপ-পুণ্য-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ তদনুযায়ী দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া সেই উপদেশকে দৃঢ়তর রূপে সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম আমাদের চিত্তপটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে, সংসারে তদনুযায়ী শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া তাহাদের প্রামাণ্য-বিষয়ে নিঃসংশয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

দণ্ড ও পুরস্কার বিধানের নিরপেক্ষতা

পরমেশ্বর যে আমাদের সদসদ্ ব্যবহার অনুসারে ফলাফল প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বাবধি সকলদেশীয় সকলজাতীয় পণ্ডিতেরাই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি নিয়মে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদান করেন তাহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া নানা ব্যক্তি নানাপ্রকার কাল্পনিক মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন, কোন কোন ন্যায়পরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্যক্তি চিরকাল অন্ন-চিন্তায় কাতর হইয়া বহু কষ্টে দিনপাত করেন, অথচ কত কত অতি পাপিষ্ঠ পরপীড়ক নরাধম অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়া নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদ ও হাস্যকৌতুক করত পরম সুখে কাল যাপন করে। কোন কোন পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্যবান্ ব্যক্তি যাবজ্জীবন রুগ্ন ও শীর্ণ শরীরে বহু ক্লেশে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন,

কেহ কেহ চিরকাল পাপপথে প্রবৃত্ত থাকিয়াও সুস্থ ও সবল শরীরে বিনা ক্লেশে সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা এই সমস্ত বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ হইয়া, কেহ পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পাপপুণ্য, কেহ বা অন্যপ্রকার অনির্দ্দেশ্য বিষয়, উক্তরূপ সুখ দুঃখ ভোগের হেতু বলিয়া কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সমুদায় মত কোন মতেই প্রামাণিক নহে। পূর্ব্বে বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারবিষয়ক পুস্তকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়মের যেরূপ বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলে অবশ্যই বিশ্বাস হয়, যে ব্যক্তি যদ্বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করে, সে তদ্বিষয়ক দণ্ড বা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, হস্তপদাদি আহত হয়, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, রোগ উৎপন্ন হয়, আর ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, পুণ্য-জনিত বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হইয়া লোকনিন্দা, চির-মালিন্য, লোকের নিকট অবিশ্বস্ততা, রাজ-দ্বারে দণ্ড ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রতিফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হয়। কি ধনী, কি নির্ধন, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি যুবা, কি, বৃদ্ধ, কাহারও প্রতি এ বিধানের অব্যাপ্তি নাই। সকলেই বিশ্বাধিপের প্রজা, সুতরাং সকলেই তৎসন্নিধানে স্ব স্ব ধর্ম্মানুরূপ দণ্ড ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব, যে সমস্ত সুনীতি-সূত্র মনুষ্যের মানস-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে, যখন তাহা পালন করিলে শুভ ফল, ও লঙ্ঘন করিলে অশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তখন বলিতে হইবে, ঐ নীতি প্রত্যয় ও তদনুযায়ী ফলোৎপত্তি উভয়ে ঐক্যাবলম্বন পূর্ব্বক বিশ্বপতির শাসনপ্রণালীর যথার্থ তত্ত্ব প্রচার করিতেছে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত পরিশুদ্ধ নিয়ম দৃঢ়তর রূপে সপ্রমাণ করিতেছে।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে যাবৎ জাতীয় প্রাণী ও যাবৎ জাতীয় জড় বস্তুর এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধও নিরূপিত আছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই সমস্ত পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিয়া অচিন্ত্য, অদ্বিতীয়, অনাদি, পরমকারণ পরমেশ্বরের সত্তা স্পষ্ট উপলব্ধি করেন। তিনি বিচার কর্ত্তার জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলাভিপ্রায় এই বিশ্বের সর্ব্ব স্থানে দেদীপ্যমান দেখিতে পান। জগদীশ্বর বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ বিশ্ব-রাজ্য পরিপালনার্থে যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা কেবল সংসারের শুভাভিপ্রায়েই সঙ্কল্পিত। সেই সমস্ত সুকৌশল-সম্পন্ন সুচারু নিয়ম অবগত হইলে পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির সঞ্চার হয়, এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে যত সমর্থ হওয়া যায়, ততই সুখস্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইতে থাকে।

প্রাণী ও জড়ের প্রকৃতি ও সম্বন্ধ

আমাদিগের দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখোৎপত্তির উপায় বিবেচনা করিতে হইলে আমাদিগের কিরূপ প্রকৃতি, ও বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সহিতই বা তাহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। মনুষ্য এই ভূলোকে সর্ব্ব-জীব শ্রেষ্ঠ। যে সকল গুণে তিনি এই পৃথিবীর রাজা হইয়াছেন, তাহা ভূমণ্ডলে আর কোন জন্তুরই নাই, এবং অন্য কোন জন্তুতে তাদৃশ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণও দৃষ্টি করা যায় না। এক বিষয়ে তাঁহাকে পিশাচতুল্য বোধ হয়, আর বিষয়ে তাঁহাকে দেবতুল্য বলিলেও বলা যায়। যখন তাঁহার রণস্থল-

মনুষ্যে বিরুদ্ধ গুণাবলীর সমাবেশ

বর্ত্তিনী সংহারমূর্ত্তি ও নানাপ্রকার পাপাচরণ মনে করা যায়, তখন তাঁহাকে অসুরাবতার বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত বিদ্যা, কারুণ্য স্বভাব, স্বদেশের হিতোৎসাহ, বিশ্বপতির মহিমানুশীলন এই সমস্ত গুণ আলোচনা করিলে বোধ হয়, তিনি কোন পরম সুখাস্পদ স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর হিতার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আর কোন জন্তুতেই এরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণসমূহের একত্র সমাবেশ উপলব্ধ হয় না।

গুণাবলীর ঐক্য ও বাহ্য বিষয়ে উপযোগিতা সুখের হেতু

ছাগ ও মেষের যাদৃশ দুর্ব্বল প্রকৃতি এবং নিরুপদ্রব মৃদু স্বভাব, বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহাদিগের তদুপযোগী সম্বন্ধ ঘটনা হইয়াছে। তাহারা মনুষ্যের আশ্রয়ে থাকিয়া ফলপত্রাদি আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, এবং মনুষ্যের যত্নে প্রতিপালিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করে। ব্যাঘ্র অতি দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তু, তদনুসারে বহু পশু-সমাকীর্ণ মহারণ্য তাহার আবাসস্থান, এবং তথায় তাহার হিংস্র স্বভাব প্রকাশের স্থল ও সীমা সুচারুরূপে নিরূপিত আছে। নিরুপদ্রব ছাগ মেষ প্রভৃতি তৃণ পত্র আহার করিয়া যেরূপ তৃপ্তি-সুখাস্বাদন করে, জীবদ্রোহী ব্যাঘ্র আপনার নৃশংস শক্তি প্রচার করিয়া সেই রূপই তৃপ্তি-সুখ প্রাপ্ত হয়। অপরাপর জন্তুর প্রকৃতিও এই প্রকার, অর্থাৎ তাহাদিগের শারীরিক ভাব, মানসিক বৃত্তি ও তাবৎ বাহ্য বস্তুবিষয়ক সম্বন্ধ সমুদায় পরস্পর উপযোগী হইয়া তাহাদিগের প্রকৃতি এক এক সুশৃঙ্খল ও সুকৌশল সম্পন্ন পরম সুন্দর যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে। এবম্প্রকার তাহাদিগের সমুদায় গুণের পরস্পর ঐক্য ও বাহ্য বিষয়ে তাহার সম্যক্ উপযোগিতাই সুখোৎপত্তির কারণ। যদি এক দিবস প্রত্যক্ষ করিতাম, কোন ব্যাঘ্র সম্মুখোপস্থিত প্রত্যেক জন্তুর শরীর আক্রমণ করিয়া বিদীর্ণ করিতেছে, এবং পর দিবস দেখিতাম, সেই ব্যাঘ্র পূর্ব্ব

দিবসের ঐ সকল নিষ্ঠুর ব্যবহার আলোচনা করিয়া পশ্চাত্তাপে পরিতপ্ত হইতেছে, বা কারুণ্য-রসাভিষিক্ত হইয়া সেই পূর্ব্ববিদারিত পশুদিগের ক্ষত বিক্ষত গাত্রে ঔষধ লেপন করিতেছে, অথবা কেবল নগরে বা প্রান্তরে অবস্থিতি করিতে তাহার একান্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে, তবে তাহার প্রকৃতি কেমন বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত বোধ হইত! এবং অনায়াসেই এপ্রকার অনুভব হইত যে তাহার মানসিক বৃত্তি সকলের যেরূপ পরস্পর অনৈক্য, বিপর্য্যয় ও বাহ্য বিষয়ে অনুপযোগিতা, তাহাতে সে কখনই সুখভাগী হইতে পারে না। অতএব, মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সামঞ্জস্য ও বাহ্য বিষয়ে তাহার উপযোগিতা এই উভয়ই জীবের জীবন-যাত্রার ও সুখোৎপত্তির মূলীভূত কারণ।

মনুষ্যে বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য

কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণ কেবল পরস্পর বিপরীত গুণেরই আশ্রয় বোধ হয়। তাঁহার নিকট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইলে তিনি মোহাতিশয়বশতঃ কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্যাদির বশীভূত হইয়া অতি কুৎসিত ইতর জন্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। আর বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল সম্যক্ স্ফুরিত হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া এবং সত্য, সারল্য, দয়া ও প্রীতিদ্বারা শান্তি রসাভিষিক্ত হইয়া পরম রমণীয় হয়। তখন তাঁহার মুখশ্রীতে কি মহত্ত্বই প্রকাশ পায়। মনুষ্যের এইরূপ বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি সমুদায়ের কি প্রকারে সামঞ্জস্য হইতে পারে? এবং তৎসম্বন্ধীয় বাহ্য বস্তু সকলই বা কীদৃশ হইলে তাহার প্রত্যেক প্রবৃত্তির উপযোগী হইতে পারে? এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকেই সম্ভব পায়। তিনি মনুষ্যের এই সমস্ত পরস্পর বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহাকে মর্ত্ত্যলোকের অধিপতি করিয়াছেন।

এক্ষণে মানব প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ যৎকিঞ্চিৎ যাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ইহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, যে পরমেশ্বর তাঁহাকে সুখভোগী করিবার নিমিত্ত জগতে তদুপযোগী নিয়ম সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সমুদায় সুচারু নিয়ম সম্যক্ প্রতিপালিত হইলে ঐহিক দুঃখের সম্যক্ নিরাকরণ হইতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক ইহা সকলেরই বাসনা, কিন্তু তদ্বিষয়ক কার্য্য-কারণ-ভাবের তথ্য জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ আমাদিগের কি প্রকার স্বভাব, অন্য অন্য বস্তুর সহিত তাহার কি প্রকার সম্বন্ধ, ও সেই সম্বন্ধ অনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠানের কিপ্রকার উপায় কর্ত্তব্য, এ সমস্ত জ্ঞাত না হইলে সে মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে না। কোন দেশীয় লোকের দুর্ভাগ্য ও অনুন্নতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ পূর্ব্বাদৃষ্ট, কেহ বা কাল-ধর্ম্ম তাহার কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিবেন, কেহ বা প্রসঙ্গক্রমে তাহাদিগের আলস্য-স্বভাবাদি লৌকিক কারণও উল্লেখ করিতে পারেন। বৈদ্যকে রোগ ক্ষয়ের উপায় জিজ্ঞাসিলে তিনি এই যথার্থ উপদেশ দিবেন, যে সমুচিত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসিলে তিনি গ্রহ-শান্তির পরামর্শ দিবেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে কোন উপায় করিতে কহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব দূরদৃষ্ট ক্ষয়ের নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন বিশেষের বিধি দিবেন। আর কোন কোন সর্ব্ব-মীমাংসক বিজ্ঞ অধ্যাপক পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ক্রিয়াই অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহার মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা রোগীর রোগ শান্তি হয়, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই অভিলাষ হইতে পারে। এইরূপ আর আর সাংসারিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার যথার্থ পথ কি তাহা জানিতেও সকলের কৌতূহল হইতে পারে। অতএব, এ বিষয় সর্ব্ব সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ লিখিত হইতেছে যে,

বাহ্য বস্তুর সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ জ্ঞান

মনুষ্যের বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের জ্ঞানই এ প্রয়োজন সাধনের এক মাত্র উপায় ; সুতরাং তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বোধ হইতেছে, অবনীমণ্ডল যে একবারেই সম্পূর্ণ সুখোৎপাদক হইবে, পরমেশ্বর তাহার এরূপ স্বভাব করিয়া দেন নাই। যাহাতে পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, তাঁহার সমুদায় নিয়মে তদনুরূপ কৌশল দৃষ্ট হইতেছে। ভূমণ্ডল ক্রমে ক্রমে রচিত হইয়াছে, ও ক্রমে ক্রমেই উৎকৃষ্টতর হইয়া পরিশেষে মানববর্গের বাসোপযোগী হইয়াছে। ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মতে আদৌ অবনী-মণ্ডল অত্যুষ্ণ তরল-পদার্থময় ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে স্নিগ্ধ ও কঠিন হইয়া দ্বীপাদি উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে বিবিধ প্রকার উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী কালে কালে পরিবর্ত্তিত ও স্তরে স্তরে রচিত হইয়াছে, এবং তদনুক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাণিজাতি ধ্বংস হইয়া নব নব জাতি সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী খনন করিয়া এক কালের ভূমি-স্তরে যে সমস্ত প্রাণি-জাতির মৃত শরীরের প্রস্তরীভূত অস্থি দৃষ্ট হয়, দ্বিতীয় কালের ভূমি-স্তরে তন্মধ্যে অনেক জাতির কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং তদপেক্ষা আধুনিক ভূমি-স্তরে দ্বিতীয় কালের বহু প্রকার জন্তুর কোন নিদর্শন প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু প্রতিকালের ভূমি-স্তরে নূতন নূতন প্রাণিজাতির চিহ্ন আছে, এবং ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে, যে, উত্তরোত্তর প্রধান প্রধান জন্তুরই উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এ তিন কালে মেদিনী মনুষ্যের বাসযোগ্য হয় নাই। তিনি সর্ব্বশেষে এখানকার নিবাসী হইয়াছেন।

ক্রম-বিবর্ত্তন

পূর্ব্বোক্ত বিবরণদ্বারা নিশ্চয় হইতেছে, পৃথিবীতে মনুষ্যের পূর্ব্বে অপরাপর বিবিধ প্রকার জীবের অধিষ্ঠান ছিল, এবং বহুতর প্রামাণিক নিদর্শনদ্বারা ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, এক্ষণকার ন্যায় তথনও

তাহাদিগের উপর জন্ম মৃত্যুর অধিকার ছিল; তখনও এই ভূলোক মর্ত্ত্যলোক ছিল। সৃজনকর্ত্তা মরণ ধর্ম্মশীল মনুষ্যের সৃজন কালে অবনীর নিয়মশৃঙ্খলার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না। বরং ইহাই সঙ্গত বোধ হইতেছে, তিনি মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য করিয়া সৃষ্ট করিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে আততায়ীর দমন নিমিত্ত ক্রোধ দিলেন এবং বিপৎপাত নিবারণার্থ সাবধানতা বৃত্তি প্রদান করিলেন। অতএব, মনুষ্য এ পৃথিবীর পূর্ব্বনিবাসী ইতর জন্তুদিগের মধ্যে আসিয়া তাহাদিগের অধিপতি হইয়া অধিষ্ঠান করিলেন। তাঁহার প্রকৃতি মরণোৎপত্তিশীল ভূলোকেরই উপযুক্ত হইয়াছে, এবং শারীরিক ও মানসিক স্বভাব বিষয়ে ইতর জন্তুদিগের সহিত বহু অংশে তাঁহার সাদৃশ্য আছে। তিনি তাহাদিগের ন্যায় অন্নপানে পরিতুষ্ট হন, নিদ্রা গিয়া আরোগ্য লাভ করেন ও অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া স্ফূর্ত্তি বোধ করেন; কিন্তু এ সমুদায় তাঁহার উৎকৃষ্ট স্বভাবের কার্য্য নহে। পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর তাঁহাকে বুদ্ধিশীল ও ধর্ম্মশীল করিয়া পৃথিবীস্থ অপরাপর সমস্ত জীব হইতে বিশিষ্ট করিয়া সকলের শ্রেষ্ঠপদ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি সকলই তাঁহার পরম ধন, এবং প্রগাঢ় সুখ ও নির্ম্মল আনন্দের কারণ। এই সমুদায় মহীয়সী বৃত্তি দ্বারা তিনি জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্রীতি-প্রফুল্ল মনে সংসারের শুভানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন এবং বিশ্বকর্ত্তার বিশ্বকার্য্যের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কৌশল আলোচনা করিয়া প্রেমাভিষিক্ত চিত্তে অতুলানন্দ সাগরে অবগাহন করেন। এই সমুদায় বৃত্তি থাকাতেই মনুষ্য নামের এই গৌরব হইয়াছে, এবং এই সমুদায় বৃত্তির সঞ্চালনেই তাঁহার জন্ম সার্থক হয়।

মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা

সর্ব্বশুভকর পরমেশ্বর সমস্ত বাহ্য বস্তু আমাদিগের ঐ সকল শুভ বৃত্তি সঞ্চালনের উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। বিশ্বমধ্যে কত মহা মহা প্রকাণ্ড

পদার্থ বর্ত্তমান আছে, মনুষ্যের দুর্ব্বল হস্ত কথনই তাহার দারুণ শক্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু করুণাকর বিশ্বকর্ত্তা তৎসমুদায় তাঁহার আবশ্যক মত আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদিগের পদতলস্থ ভূমিতে সহস্র প্রকার উৎপাদিকা শক্তি সমর্পণ করিয়াছেন, বুদ্ধিবৃত্তি চালনাদ্বারা তাহার গুণ জানিয়া কর্ষণ করিলেই প্রচুর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পর্ব্বতগুহা হইতে নদী সমুদায় নিঃসারণ করিয়াছেন, তরণী সহকারে তাহা রাজপথ-স্বরূপ করিয়া পদব্রজের শ্রান্তি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, ও প্রয়োজনানুসারে তাহার প্রবাহ পরিবর্ত্তন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা যায়। যে দুর্গম মহাসিন্ধু-গর্ভে অবনীর অর্দ্ধভাগ নিমগ্ন রহিয়াছে, তাহাতেও সমুদ্রপোত সন্তারিত করিয়া সুগম পথ প্রস্তুত করা যাইতেছে। আর জগদীশ্বর আমাদিগেরই হিতের নিমিত্ত আমাদিগকে যে পদার্থের শক্তি অতিক্রম বা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন নাই, তাহার স্বভাব জানিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবার উপায় জ্ঞান দিয়াছেন। যদিও মনুষ্যের গ্রীষ্মতাপ ও প্রবল ঝটিকাদি নিবারণ করিয়া মনঃকল্পিত চির-বসন্ত-সুখ সম্ভোগ নিমিত্ত সূর্য্যের গতি রোধ করিবার শক্তি নাই তথাপি তিনি সলিলসেবিত গৃহচ্ছায়াতে অবস্থিতি করিয়া ও ঝটিকাদির পূর্ব্ব লক্ষণ সকল উপলব্ধিপূর্ব্বক সাবধান হইয়া নিরাপদ ও নিরুৎকণ্ঠ হইতে পারেন। যৎকালে বাহিরেতে বিদ্যুৎ, ঝঞ্চা ও শিলাবৃষ্টিদ্বারা অবনীর উপপ্লব-সম্ভাবনা বোধ হয়, তখন তিনি স্বকীয় নিভৃত আলয়ে প্রিয়তম মিত্র-মণ্ডলী মধ্যে মধুর আলাপে পরম সুখে কাল যাপন করিতে সমর্থ হন।

বুদ্ধিবৃত্তি চালনার ফল

আমরা যে সকল বিবিধ গুণান্বিত মনুষ্য ও ইতর জন্তু দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, তাহাদিগেরও উপর আমাদিগের সুখ দুঃখ সম্যক্ নির্ভর করিয়া আছে। পরমেশ্বর তাহাদিগের সহিত আমাদিগের যাদৃশ

সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তদনুযায়ী কার্য্য করিলেই সুখ লাভ হয়, আর তদ্বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলেই দুঃখোৎপত্তি হয়। অতএব, তাহাদিগের কি প্রকার প্রকৃতি ও আমাদিগের সহিত তাহাদিগের কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহা জ্ঞাত হওয়া ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক।

ইতর জন্তুর প্রকৃতি নির্ণয়

যে পর্য্যন্ত মনুষ্য অসভ্য ও অজ্ঞানাবৃত থাকেন, সে পর্য্যন্ত তিনি অতি নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ও ধর্ম্ম বিষয়ে নানা প্রকার কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে তাঁহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ হয়, তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় নিতান্ত জড়ীভূত থাকে। তিনি এই সংসারকে কেবল কতকগুলি অসম্বন্ধ বস্তুরাশি বলিয়া মনে করেন; বিশ্বের ঘটনা সকল তাঁহার শৃঙ্খলাবদ্ধ বোধ হয় না, এবং তাঁহার অন্তঃকরণে কার্য্য-কারণ ভাবের তত্ত্বজ্ঞান কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি পায় না। তিনি জগতের অন্তর্ভূত অনেকানেক পদার্থের অনিবার্য্য ভয়প্রদ শক্তি দেখিয়া ভীত হন, এবং সে শক্তি অতিক্রম করা নিতান্ত সাধ্যাতীত বোধ করেন। যদিও বিশ্বকার্য্যের কোন কোন অংশের সৌষ্ঠব ও সুশৃঙ্খলা কদাচিৎ মনোগত হইয়া সুখের আশা সঞ্চারিত হয়, কিন্তু তৎপরক্ষণেই সে সমুদায় ঘন-তিমিরাবৃতবৎ অস্পষ্ট ও অলক্ষিত হইয়া যায়, ও সেই সঙ্গেই তাঁহার সকল আশা ভগ্ন হয়। জগদীশ্বর যে এই জগতের বস্তু সমুদায় মনুষ্যের সুখোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রতীত হয় না, ও সুতরাং তাঁহার নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিয়া সুখলাভ করিতেও সামর্থ্য জন্মে না।

অজ্ঞ ও অসভ্য মানব

কিন্তু মনুষ্য সভ্য ও জ্ঞানবান্ হইলে নিশ্চয় জানিতে পারেন, তাঁহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত বস্তু ও সমস্ত ঘটনা পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া এক সুশৃঙ্খলাযুক্ত

পরম শুভদায়ক যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে, এবং তাহা তাঁহার সমুদায় মনোবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনার্থেই সঙ্কল্পিত হইয়াছে। তিনি আপনাকে বিশ্বাধিপের প্রজা জ্ঞান করিয়া আনন্দিতমনে তাঁহার বিশ্ব-কার্য্য পর্য্যালোচনায় অনুরাগী হন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সমুদায় নিরূপণ করিয়া তদনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করেন। তিনি ঈশ্বরানুমত ইন্দ্রিয়সুখ এককালে পরিত্যাগ না করিয়া জ্ঞানধর্ম্ম-জনিত বিশুদ্ধ সুখাস্বাদনেও তৎপর থাকেন, এবং যথা-নিয়মে চালনা দ্বারাই মনুষ্যদিগের সমুদায় শক্তির স্ফূর্ত্তি ও তত্তৎ বিষয়ের সুখোৎপত্তি হয় জানিয়া তাহাতে যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন।

সভ্য ও জ্ঞানী মানব

অতএব, যৎপরিমাণে মনুষ্যের স্বায় প্রকৃতি ও বাহ্য বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তৎপরিমাণে তাঁহার সুখবৃদ্ধির উপায় হইতে থাকে। প্রথমে সকল জাতীয় মনুষ্যেরই অতি অসভ্যাবস্থা থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়। তিনি প্রথমতঃ হিংস্র জন্তুবৎ জঙ্গলে ভ্রমণ-পূর্ব্বক পশু হিংসা করিয়া উদরপূর্ত্তি করেন; পরে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদ্রেক হইলে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তদনন্তর বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধর্য্য হইলে শিল্পকর্ম্ম ও বিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। এক্ষণকার সভ্য জাতিদিগের এই শেষোক্ত অবস্থা ঘটিয়াছে; এ অবস্থায় লোভ রিপু অত্যন্ত প্রবল। মনের ও শরীরের প্রকৃতি চিরকালই সমান, কিন্তু ঐ ভিন্ন ভিন্ন কালত্রয়বর্ত্তী লোকদিগের বাহ্য বস্তুবিষয়ক সম্বন্ধের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রথম অবস্থায় কাম ক্রোধাদির প্রাবল্য হইয়া অতি অপকৃষ্ট পশুবৎ ব্যবহারে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয়; দ্বিতীয় অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি হয় বটে, কিন্তু কাম ক্রোধাদি অন্যান্য নিকৃষ্ট বৃত্তির উপর বুদ্ধির আয়ত্তি না হওয়াতে, এক প্রকার অসভ্যা-

মানসিক বৃত্তির সামঞ্জস্য ও বাহ্য বিষয়ের সহিত ঐক্য

বস্থাই থাকে, এবং তৃতীয় অবস্থায় বুদ্ধিবলে অনেকানেক বাহ্য বস্তু তাঁহাদের আয়ত্ত হইয়া ধনাকাঙ্ক্ষা ও মানাকাঙ্ক্ষারই আতিশয্য হয়। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কোন অবস্থাতেই মনুষ্যের মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সামঞ্জস্য ও সমস্ত বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার ঐক্য স্থাপন হয় নাই, এবং তৎপ্রযুক্ত কোন কালেই তাঁহার ইহলোক-প্রাপ্য সমস্ত সুখ ভোগ অধিকার হয় নাই।

—উহার সন্ধান স্পৃহা

যদি অদ্যাপি মনুষ্যের কোন অবস্থাতেই তৃপ্তিলাভ না হইল তবে তাঁহার প্রকৃতিই বা কি প্রকার ও বাহ্য বিষয়ের কিরূপ শৃঙ্খলাই বা তাহার সমুচিত উপযোগী, ইহার অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় লোকের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপ খণ্ডের বুদ্ধিমান্ গুণবান্ মনুষ্যদিগেরই বা ঐহিক সুখ সম্ভোগের কত উন্নতি হইয়াছে? এক্ষণে তাঁহারা শিল্প কার্য্য ও বাণিজ্য কার্য্য বিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতেই কি তাঁহাদিগের সুখের একশেষ হইয়াছে? তাঁহারা কি বংশানুক্রমে এই সমস্ত ব্যাপারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া কেবল ইহাতেই লিপ্ত থাকিবেন? সকলেই জানেন, এ অবস্থা মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা নহে। তবে কি উপায় করিলে তাঁহার সুখোন্নতি হইবে? কে আমাদিগের ভবিষ্যৎ সুখরাজ্যের পথ প্রদর্শন করিবেন? এ সমস্ত প্রশ্নের এক সিদ্ধান্ত আছে। পরমেশ্বর মনুষ্যের এ প্রকার স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে তাঁহার সকল বিষয়েরই ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইবে, এবং তাঁহাকে পৃথিবীর অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখের অধিকারী করিয়া এই অভিপ্রায়ে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যে তিনি স্বীয় যত্নে আপনার প্রকৃতি ও বাহ্য বিষয়ের স্বভাব জ্ঞাত হইবেন, এবং যাহাতে মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সামঞ্জস্য হইয়া বাহ্য বিষয়ের সহিত, তাহাদের ঐক্য থাকে, তাহার উপায় অনুসন্ধান

করিবেন। মনুষ্য যাবৎ আপন স্বভাব অজ্ঞাত ছিলেন, তাবৎ তাঁহার তদনুযায়ী সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপন করাও অসম্ভাবিত ছিল। তিনি যাবৎ আপনার মানসিক প্রকৃতি এবং বাহ্য বস্তুর সহিত তাহাদের সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত না হইয়াছিলেন, তাবৎ মনোবৃত্তি সমুদায়কে বিবেচনানুসারে উচিত পথে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হন নাই। মনুষ্য পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ের সদসৎ বিচার না করিয়া অর্থাৎ তাহাতে আপনার সমস্ত প্রকৃতির উপযোগিতা বিবেচনা না করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এ কারণ তাহাতে সুখী হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি চিরকালই যে আপনার স্বভাব অজ্ঞাত থাকিবেন ও তদনুযায়ী সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপনে অশক্ত রহিবেন এরূপ বিবেচনা করা কদাপি যুক্তি-সিদ্ধ নহে। যখন পরমেশ্বর মনুষ্যকে আপন প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিবেচনাশক্তি প্রদান করিয়াছেন ও যখন তদ্দ্বারা তাঁহার সুখের উপায় স্থির করিবার ভার তাঁহারই উপর অর্পণ করিয়াছেন, এবং যখন তিনি কেবল সে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়াতেই অদ্যাপি সে অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে অসমর্থ রহিয়াছেন, সুতরাং যে অভিপ্রায়ে তাঁহার গুণ ও শক্তি সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তি বিশেষের বশীভূত হইয়া চলিতেছেন, তখন একথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, যে এক সময়ে মনুষ্য আপনার প্রকৃতি ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ যথার্থরূপে অবগত হইয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন এবং তখন পৃথিবীতে তাঁহার সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবে, তখন তিনি কার্য্যকারণের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া বিবেচনাপূর্ব্বক নিরূপিত নিয়মানুসারে সুখ প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে যত দর্শন-শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপর্য্য ছিল না। আপনাদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন, তৎকালের লোকের সম্যক্ বোধগম্য হয় নাই। বরঞ্চ, অপরাপর অনেক দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও এই প্রসিদ্ধ মত প্রচলিত আছে, যে আদৌ ভূলোক নির্ম্মল জ্ঞান ও পরম সুখের আস্পদ ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া অজ্ঞান ও দুঃখের বৃদ্ধি হইতেছে ও পরে ক্রমশঃই তাহার আধিক্য হইতে থাকিবে। কিন্তু ইউরোপীয় লোকের পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে, তাহার সহিত এ মতে সঙ্গতি হয় না; কারণ তাঁহাদিগের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতই হইয়া আসিতেছে। যদি এই অভিপ্রায় যথার্থ হইত তাহা হইলে বিজ্ঞান শাস্ত্রের যত উন্নতি হউক ও তদ্দ্বারা জগতের নিয়ম যত অবগত হওয়া যাউক, কিছুতেই মনুষ্যের উন্নতি হইবার আর সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই মত ক্রমশঃ অশ্রদ্ধিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া নিশ্চয় জানিতেছেন, যৎপরিমাণে জগতের নিয়ম নিরূপিত হইবে ও লোকে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে, তৎপরিমাণে তাহাদিগের সুখের বৃদ্ধি এবং অবস্থা ও স্বরূপের উন্নতি হইবে। তাঁহারা অবিজ্ঞ লোকদিগের ন্যায় পরমেশ্বরকে লৌকিক ফলাফলের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, অর্থাৎ পরমেশ্বর কাহারও প্রতি তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ ঐশী শক্তি প্রকাশপূর্ব্বক কোন সাংসারিক ব্যাপার সম্পন্ন করেন, এবং তাহাতে বিশেষ বিশেষ সঙ্কল্প করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সুখ দুঃখ নিয়োজন করেন, ইহা অঙ্গীকার করেন না। প্রত্যুত তাঁহারা এই প্রকার

এতদ্বিষয়ে এদেশীয় অজ্ঞতা

পাশ্চাত্যগণের মত

বিশ্বাস করেন, যে জগদীশ্বর নিরূপিত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন—ফলাফল বিধান করিতেছেন—সুখ দুঃখ বিতরণ করিতেছেন। তিনি কদাপি কাহারও স্তব বা প্রার্থনার অনুরোধে কোন নিয়মের অতিক্রম করেন না। তিনি জগতের পদার্থ সকল কিয়ৎ পরিমাণে আমাদিগের ইচ্ছার আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং যাহাতে আমরা সেই সমস্ত বস্তুর বিষয় আলোচনা করিয়া আপনাদিগের জ্ঞান ও সুখের উন্নতি করিতে পারি, তাহাদিগের তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। অতএব যখন পরমেশ্বর চেতনাচেতন তাবৎ বস্তুর উপর সাধারণ নিয়ম প্রচারণ করিয়া সংসার-রাজ্য শাসন করিতেছেন ও তদ্দ্বারা আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, তখন তাঁহার সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং তজ্জন্য অবশ্যই ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয়। যে কার্য্য তাঁহার নিয়মাধীন না হয়, তাহা কখনই উচিত কার্য্য নহে, যখন তাঁহার নিয়ম অবগত হইলাম, তখন তাহাতে শ্রদ্ধা করা, অন্যকে তাহা উপদেশ দেওয়া ও সংসারে যাহাতে তদনুযায়ী ব্যবহার প্রচলিত হয় তাহার উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরের নিয়ম উপদেশ দেওয়া ধর্ম্মোপদেশেরই অঙ্গ। চতুষ্পাঠীর পাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যামধ্যে তদ্বিষয়ক গ্রন্থ নিয়োজিত করা বিধেয়।

এতদ্দেশীয় কোন ভাষায় বিজ্ঞান শাস্ত্রের তাদৃশ প্রচার নাই, অতএব এক্ষণে চতুষ্পাঠীতে এরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রচলিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্রসমুজ্জ্বলিত ইউরোপ খণ্ডের ধর্ম্ম ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরাই বা কোন্ আপনাদিগের বিদ্যালয়ে এ বিষয়ের উপদেশ দিয়া থাকেন? বরঞ্চ, কেহ অনুরোধ করিলে তাহার প্রতি খড়্গাহস্ত হইয়া কটূক্তি করেন ও নাস্তিকতা অপবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, যৎকালে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশিত

বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রমাণ

হইয়াছিল, তখন মনের নিয়ম ও ভৌতিক জগতের নিয়ম বিশিষ্টরূপে আলোচিত হয় নাই। ইহ লোকে কিরূপ নিয়মে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, ভোগাভোগের বিধান হইতেছে, সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা তৎকালের লোকের স্পষ্ট প্রতীত হয় নাই, সুতরাং পরমেশ্বর যেরূপ নিয়মে বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, শাস্ত্রকারেরা তাহার সহিত স্বপ্রকাশিত শাস্ত্রের ঐক্য রাখিতে সমর্থ হন নাই। অনেকানেক প্রাচীন পণ্ডিত সংসারের সুখ-দুঃখবিষয়ক সুনিয়ম নিরূপণে অপারগ হইয়া তাহা মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বা এককালে এমত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, যে এ সংসারের কোন সুশৃঙ্খলাই নাই, যদিও কোন কোন ধর্ম্মব্যবসায়ী পণ্ডিত জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা উপদেশ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক জ্ঞান করেন না, সুতরাং তদ্বিষয়ে আদরও করেন না। তাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র ও লৌকিক জ্ঞান কেবল কৌতূহলজনক ও ধনাগমের উপায় বলিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে সাংসারিক ব্যবহার কালে আপন স্বভাব ও প্রাকৃতিক নিয়ম যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবগত আছে, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সচেষ্ট হয়, আপন পুণ্যবল ও অদৃষ্টের উপর নিতান্ত নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না। বৃষ্টি না হইলে কৃষি-কার্য্যের নিয়মানুসারে শস্য-ক্ষেত্রে জল সেচন করে, অন্নসংস্থান না থাকিলে, সাংসারিক নিয়মানুসারে কায়িক পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করে, এবং রোগ হইলে শারীরিক নিয়মানুযায়ী চিকিৎসার্থে চিকিৎসক বিশেষকে আহ্বান করে। অতএব, যখন এতাদৃশ নিয়ম পরিপালনের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে উপদিষ্ট না হইয়াও লোক তদবলম্বনপূর্ব্বক তাহার ফলাফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, তখন মানব প্রকৃতির সহিত বাহ্য বিষয়ের কিরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ পরমেশ্বর কি প্রকার নিয়মে সংসার প্রতিপালন করিতেছেন, তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান

করা ও তদনুযায়ী ব্যবহার করা কি পর্য্যন্ত শুভজনক তাহা বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্রদ্বারা ইহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইতেছে, যে এই প্রকার নিয়ম প্রতিপালন ব্যতিরেকে আমাদিগের বলের উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি, বীর্য্যের উন্নতি, ক্ষমতার উন্নতি হইবার—বলিতে কি, সম্যক্‌রূপে মনুষ্যত্ব রক্ষা হইবার উপায়ান্তর নাই। জগদীশ্বর বিশ্ব-রাজ্য পালনার্থ যে সমস্ত সুচারু সুখাবহ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করিবার অব্যবহিত কাল পরেই দুঃখের সঞ্চার হয়। একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পুনর্ব্বার তদ্রূপ নিষিদ্ধ কার্য্য না করি, এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহাতে দুঃখ নিয়োজন করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিয়ম সংস্থাপনের সময়েই তাহার ফলাফল এককালে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অন্যথা করা কাহারও সাধ্য নহে। দেখ, ব্যায়ামাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে ত্রুটি, অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা না হইতেই স্ত্রী-সহযোগ, জগতের ভৌতিক নিয়ম নিরূপণ পূর্ব্বক সুনিপুণরূপে শিল্পাদি শাস্ত্রের উৎকৃষ্টরূপ অনুশীলন করা, স্ত্রীদিগের মূর্খতা, ও পুরুষদিগের সুচারুরূপ শিক্ষা লাভ না হওয়া, এই সমস্ত কারণে আমাদিগের দেশীয় লোকের যে প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিতে হইলে অনর্গল অশ্রুপাত হয়।

পরমেশ্বর আমাদিগের হিতার্থেই দুঃখ যোজনা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য না করিয়া দুঃখই ভোগ করিতেছি। এখনও আমাদিগের বোধোদয় হইলে তাঁহার করুণাগুণে এই দুঃখরূপ কণ্টকীবৃক্ষ হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হয়। যাঁহাদিগের ধর্ম্মেতে শ্রদ্ধা আছে, ও ঈশ্বরে প্রীতি আছে, তাঁহারা, যাহা সেই পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নিয়ম বলিয়া জানিলেন, তাহা প্রতিপালন করিতে যত্ন না করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন?

প্রাকৃতিক নিয়ম ও তাহার ব্যবহার

যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বৈধাবৈধ কর্ম্মের উপদেশের আবশ্যকতা বোধ করেন,

জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ প্রণীত পরম শাস্ত্র স্বরূপ যে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ, তাহার নিয়ম অভ্যাস ও তদনুযায়ী ব্যবহারে একান্ত যত্ন না করা কি তাঁহাদিগের উচিত? যদি বল, এ সমস্ত বিবরণ ঐহিক ভোগাভোগের বিষয়েই লিখিত হইল। যাঁহারা ঐহিক ভোগ কামনা না করেন, তাঁহাদিগের এত নিয়মানিয়ম বিচারে প্রয়োজন কি? কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন, আর ইহাও তাঁহাদের বিদিত থাকিতে পারে, যাঁহার মানসিক প্রকৃতি যত উৎকৃষ্ট, তিনি উপদেশ গ্রহণ করিতে তত সমর্থ। বিশুদ্ধ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি ঈশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় বিষয়ের জ্ঞান লাভে যেরূপ সমর্থ মূর্খ ব্যক্তি সে প্রকার কখনই নহে। যাহার প্রবল ভক্তিভাব আছে, সে ব্যক্তি যেরূপ ভক্তিবিষয়ক উপদেশ আশু গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের প্রগাঢ় প্রীতিতে মগ্ন হয়, অন্য ব্যক্তি তদ্রূপ কখনই হয় না। যাহার অত্যন্ত দয়াস্বভাব, দয়াবিষয়ক উপদেশ তাহার যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়, ও তদনুষ্ঠানে তাহার যাদৃশ অনুরাগ জন্মে, অন্য ব্যক্তির তাদৃশ কখনই হয় না। পরন্তু আমাদিগের এই সমস্ত গুণের উন্নতি নিমিত্ত কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক, তদ্ব্যতিরেকে ধর্ম্মোপদেশের পূর্ণ ফল উৎপন্ন হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যদি বুদ্ধি-বৃত্তি ও দয়া ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বভাবতঃ বলবতী না থাকাতে, কেহ গুরূপদেশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে কি উপায়ে তাহার মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের উন্নতি হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক নহে। যদি অন্নবস্ত্রের ক্লেশ, অস্বাস্থ্যদায়ক দ্রব্যভক্ষণ, কুস্থানে বাস, দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী ক্লান্তিকর পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে অন্তঃকরণের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল নিস্তেজ হয়, সুতরাং পরমেশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞান ও প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধাদি উদয় হইবার ব্যাঘাত জন্মে, তবে ঐ সমস্ত ধর্ম্ম-কণ্টক ছেদনার্থ তদ্বিষয়ক কার্য্যকারণ নিরূপণ করা উপেক্ষার বিষয় নহে।

কোন দেশীয় ও কোন জাতীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা কোন কালে এ সকল অভিপ্রায় গ্রহণ করেন নাই সুতরাং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানও করেন নাই, এ নিমিত্ত তাঁহারা প্রাণপণে উপদেশ করিয়াও কেবল এই সকল স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে অবহেলা করাতে লোকের ধর্ম্মোন্নতি ও সুখোন্নতি বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান-শাস্ত্র দ্বারা এই সমুদায় মত নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব, বিশ্বের নিয়ম আলোচনা ও তৎপ্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জগতের নিয়ম জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, তাহা লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই দুঃখ আছে। আলোচনা কর, বিচার কর, সিদ্ধান্ত কর, তবে এ বাক্য অবশ্যই বিশ্বাস হইবে। তখন এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে পরমেশ্বর-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র স্বরূপ জানিয়া তদীয় নিয়ম প্রতিপালনে অবশ্যই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিবে।

বিশ্ব নিয়মের আলোচনা ও প্রতিপালন।

মনুষ্যের সুখোৎপত্তি।

মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের বিষয় সংক্ষেপে বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার সুখোৎপত্তির মূল অন্বেষণ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ। ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, যে শরীর ও মন চালনা না করিলে সুখানুভব হয় না। "শরীর ও মনোবৃত্তি সকল চালনা কর, সুখলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই" এই শুভকরী নীতি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ। তাহারা সুষুপ্তবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে আমাদের জীবিত থাকাই বৃথা হইত; মনুষ্যের জীবনে ও বৃক্ষাদির জীবনে কিছুই বিশেষ

থাকিত না। ফলতঃ সর্ব্বতোভাবে নিশ্চেষ্ট থাকা আমাদিগের স্বভাব-বিরুদ্ধ। যদি কোন বালক গৃহ মধ্যে অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে, আর তথা হইতে তাহার ক্রীড়াসক্ত বয়স্যদিগের কেলি কোলাহল শ্রবণ করে, এবং তাহারা কি ক্রীড়া করিতেছে, তাহাও অনুভব করিতে পারে, তবে সে বহির্গত হইয়া তাহাদের সঙ্গী হইবার নিমিত্ত কেমন ব্যগ্র হয়? যদি তাহার পিতা তাহাকে নিবারিত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে, তাহার মনোদুঃখের আর সীমা থাকে না। এইরূপ, যদি কোন প্রবীণ ব্যক্তি ঘোরতর দুর্দ্দিনপ্রযুক্ত ক্রমাগত ৫।৭ দিবস গৃহের বহির্ভূত হইতে না পারেন, তবে তিনিও বিরক্ত ও অস্থির হন তাহার সন্দেহ নাই। যিনি সর্ব্বদা প্রসন্ন-চিত্ত থাকেন, এমতস্থলে তাঁহারও অপ্রসন্ন বদন দেখা যায়। অতএব মনুষ্যের সুখলাভ কায়িক মানসিক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে কি না, তাহা যৎকালে তিনি সর্ব্বদা নিশ্চেষ্ট থাকেন, তখনই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন।

শরীর ও মনোবৃত্তির চালনা

আমরা শরীর ও মনঃ পরিচালনে প্রবৃত্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিব, এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর সমস্ত জগতের সহিত মানব প্রকৃতির তদুপযোগী সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন। দেখ, আহার ব্যতিরেকে শরীর রক্ষা পায় না, সুতরাং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অন্ন আহরণ করিতে হয়। পশুদিগের যেমন গাত্র-লোম আছে, আমাদিগের শীত নিবারণার্থে তাদৃশ কোন স্বাভাবিক আচ্ছাদন নাই সুতরাং শরীর ও মনের চেষ্টা দ্বারা পরিধেয় প্রস্তুত করিতে হয়। আমাদিগের সমুদায় মনোবৃত্তি স্ব স্ব বিষয় লাভার্থে নিয়ত ব্যগ্র, কিন্তু চালনা ব্যতিরেকে তাহাদিগকে চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। অতএব, আমাদিগের শরীর ও মনকে সম্যক্ সচেষ্ট রাখা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত,

ঈশ্বরের অভিপ্রেত

তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া যত চালনা করিবে ততই শরীরের অঙ্গ সকল সবল হইবে, মনের বৃত্তি সকল সতেজ হইবে, এবং অন্তঃকরণ সুখার্ণবে মগ্ন হইতে থাকিবে।

মনোবৃত্তির পরিচালনা

আমাদিগের জ্ঞানাভিলাষ অত্যন্ত প্রবল। জ্ঞানলাভই সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, এবং জ্ঞানামৃত পানদ্বারাই তাহারা চরিতার্থ হয়। কোন অভিনব বস্তু সন্দর্শন মাত্রেই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, তাহার সবিশেষ গুণাগুণ জানিতে ইচ্ছা ও উৎসাহ হয় এবং তাহার স্বভাব ও প্রয়োজন যত জানা যায়, ততই সুখোদয় হইতে থাকে। সে বস্তুদ্বারা আমাদিগের কোন সাংসারিক উপকার না হউক, তথাপি তাহার আলোচনামাত্রেই এরূপ নির্ম্মল আনন্দ অনুভূত হয়, যে তজ্জন্য শারীরিক ও সাংসারিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইলেও সে রমণীয় জ্ঞানালোচনা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। অতএব ইচ্ছা করিলেও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভাবিত নয়। পরমেশ্বর আমাদিগের সুখ সম্পাদনার্থে মানসিক প্রকৃতির সহিত বাহ্যবস্তুর যে সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, এবং উভয়কে পরস্পর যে প্রকার উপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন, ও মনোবৃত্তি সমুদায়কে সচেষ্ট রাখিবার নিমিত্ত যেরূপ কৌশল করিয়াছেন, এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তাহার অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করা গিয়াছে। অতএব, মনোবৃত্তির চালনাতেই যে সুখানুভব হয়, ও তৎসমুদায় চালনা করা যে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তাহার সংশয় নাই।

যদি আমরা জন্ম-কালে বুদ্ধিবৃত্তি নিষ্পাদ্য সমুদায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতাম, এবং আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদায় স্ব স্ব বিষয়ভোগে এককালেই চরিতার্থ হইয়া থাকিত, ও তাহাদিগকে আর চালনা করিবার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে, এইক্ষণকার অপেক্ষা সুখের অল্পতা ভিন্ন কখনই আধিক্য হইত না। যদি একবার মাত্র ভোজন

করিলেই চিরকাল উদর পরিপূর্ণ থাকিত, ও ক্ষুধার উদ্রেক আর না হইত, তবে প্রত্যহ ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিয়া যেরূপ সুখ সম্ভোগ করা যায়, তাহাতে এককালে বঞ্চিত থাকিতে হইত। ধন-লাভ হইলেই ধনলোভী ব্যক্তির আহ্লাদ হয়, কিন্তু সে আহ্লাদ অতি অল্পকাল স্থায়ী। হস্ত-গত ধনে তাহার তৃপ্তি হয় না, সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ অধিক উপার্জ্জনার্থে ব্যগ্র হয়। যদিও লোকে তাহাকে অর্ব্বাচীন বোধ করে, কিন্তু সে ব্যক্তি স্বীয় স্বভাবেরই বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। তাহার অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির চালনাতেই সুখানুভব হয়, এবং কেবল ধনান্বেষণ ও ধনোপার্জ্জনদ্বারা সে বৃত্তি সব্যাপার অর্থাৎ সচল থাকিতে পারে। অতএব যদি ঐ বৃত্তি একবারে অপর্য্যাপ্ত বিষয় লাভ করিয়া চিরকাল সুষুপ্তবৎ ব্যাপারশূন্য থাকিত, তাহা হইলে মানববর্গ তদুৎপন্ন সুখভোগে কখনই অধিকারী হইত না। এইরূপ আর আর মনোবৃত্তিও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে এক্ষণে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ চরিতার্থ করিয়া যে প্রচুর সুখ সম্ভোগ করা যাইতেছে তাহা আর আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিত না। এরূপ হইলে এককালে আমাদের মনশ্চেষ্টার অন্ত হইত, আমাদিগের প্রথম চেষ্টাই শেষ হইত, অত্যল্প কালেই সর্ব্ব বস্তু পুরাতন বোধ হইত। কিছুতে আর কৌতূহল থাকিত না, কিছুতেই উৎসাহ হইত না, এবং কোন বিষয়ে আশাবৃত্তি সঞ্চরণ করিত না। এমন যে পরম রমণীয় বিচিত্র সংসার, তাহাও নিতান্ত নীরস বোধ হইত। অতএব, পরমেশ্বর যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—তাহার উপর আর কথা নাই। যেরূপ মনোবৃত্তি সকল সৃজন করিয়াছেন, তাহাদিগকে তদুপযুক্ত বিষয় সমুদায়ও প্রদান করিয়াছেন। ঐ সকল বিষয়ের প্রয়োজন জানিয়া যথোচিত ব্যবহার করিলেই ইষ্টলাভ ও আনন্দ সঞ্চার হয়, আর এতদ্বিরুদ্ধাচরণ করিলে অনিষ্ট ঘটনা ও দুঃখোৎপত্তি হয়।

মনোবৃত্তির বিষয় ও ব্যবহার

পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বর, তাহাদের গুণাগুণ অনুসন্ধান করিবার ভার আমাদের উপর সমর্পণ করিয়া আমাদের মনোবৃত্তি সকলকে সদা সব্যাপার রাখিবার কি সুন্দর কৌশল করিয়াছেন।

পৃথিবীতে ধান্য গোধূমাদি শস্য জন্মে, এবং তদ্দ্বারা মানব দেহের পুষ্টি বর্দ্ধন হয়, কিন্তু তাহা নিস্তুষ ও সুসম্পাদিত না হইলে সুস্বাদ, সুজীর্ণ ও বলাধায়ক হয় না। পরন্তু এ সমুদায় সাধন করিতে হইলে শরীর ও মন পরিচালন করিতে হয়। অতএব, জগদীশ্বর যৎকালে শস্য সৃজন করিয়া তাহাতে তদুচিত গুণ সকল প্রদান করিয়াছিলেন এবং মানব শরীরকে তন্নিষ্ঠ ধর্ম্ম ও শক্তি সমুদায় দ্বারা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তৎকালেই গোধূমাদির সহিত মানব দেহের পরস্পর সম্বন্ধ ও উভয়ের পরস্পর উপযোগিতা নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, এবং আমরা যে কায়িক ও মানসিক চেষ্টাদ্বারা জ্ঞানলাভ ও সুখ সম্ভোগ করিব, তৎকালেই, তাহারও সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

তদ্দৃষ্টান্ত

পৃথিবীতে বহুতর বিষ-বৃক্ষ আছে, তাহার ফল, মূল, পত্রাদি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে রোগ শান্তি হয়, কিন্তু অধিক ভক্ষণ করিলে প্রাণ বিয়োগ হয়। ইহাতে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়েরও সম্যক্ উপযোগিতা আছে, কারণ ঐ সমুদায় বৃত্তি সাবধানতা সহকারে ঐ সমস্ত দ্রব্যের গুণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া মনুষ্যের মঙ্গল-সাধন করে। যিনি মনুষ্যের দেহকে রোগাস্পদ করিয়াছেন, তিনিই তদুচিত ঔষধ সকল সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তদীয় গুণ সমুদায় নিরূপণার্থে তাঁহাকে তদুপযুক্ত মনোবৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে চালনা করা যে পরমেশ্বরের সম্যক্ অভিপ্রেত, তাহার সংশয় নাই।

জল উষ্ণ করিলে বাষ্প হয়। সেই বাষ্পের আশ্চর্য্য শক্তি প্রভাবে বাষ্পীয় যন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া অত্যদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পন্ন

করিতেছে। বাষ্পীয় তরণী সমুদায় যে প্রকার প্রবলবেগে ধাবমান হইয়া ছয় মাসের পথ এক মাসে উত্তীর্ণ হইতেছে, তাহা সকলেরই বিদিত আছে। পরমেশ্বর সৃষ্টিকালেই সেই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার শুভ সূত্র সঞ্চার করিয়াছেন, এবং মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সকল তৎসাধনের উপযোগী করিয়া জল ও অগ্নির স্বভাব এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিবার ভার তাঁহার উপর সমর্পিত করিয়া রাখিয়াছেন। যখন বুদ্ধি চালনার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে বিমল আনন্দ অনুভূত হয়, এবং যদর্থে চালনা করা যায়, তাহা সিদ্ধ হইলে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের হিতাভিপ্রায়েই এরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন ভূমি শর্করা কি বালুকাময়ী, কঠিন কি পঙ্কিল, নিম্ন কি উচ্চ, ইত্যাকার সমস্ত দোষ জ্ঞাত হইয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান-পূর্ব্বক তৎপ্রতীকারের উপায় চেষ্টা করা অর্থাৎ পঙ্কিল ভূমি শুদ্ধ করিবার, কঠিন মৃত্তিকা চূর্ণ করিবার, অনুর্ব্বরা ভূমি উর্ব্বরা করিবার উপায় অবধারণ করা আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য। যে সকল নরজাতি বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন-পূর্ব্বক ভূমির গুণ, উৎপাদিকা শক্তি এবং জল ও শস্যাদির সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করে, ও নিরালস্য হইয়া ভূমির দোষ সংশোধনার্থে ও কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহার্থে মানসিক শক্তি সকল সঞ্চালন করে, তাহাদের তজ্জন্য প্রচুর অন্ন লাভ হয়, স্বদেশের ভূমি সকল দোষ বর্জ্জিত হইয়া শরীরের সুস্থতা সম্পাদন করে, এবং মনোবৃত্তি চালনা করাতে, অন্তঃকরণ সতত প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকে। আর যাহারা আলস্য'পরবশ হইয়া তাদৃশ অনুষ্ঠান না করে, তাহারা তৎপ্রতিফল স্বরূপ জ্বর, কম্প, বাত ও অপরাপর বহু ক্লেশকর রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, অনবরত অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পায়. এবং মধ্যে মধ্যে শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটিয়া অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হয়। এই ক্লেশ তাহাদের উপদেশ স্বরূপ মনে করা উচিত। তাহারা যে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা

করিয়া সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইতেছে, ইহাই জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত জগদীশ্বর এমত স্থলে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। যখন তাহারা পরমেশ্বরের নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শরীর ও মন চালনা করিবে, তখনই দারুণ দুঃখের কঠোর হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখী হইবে।

সমুদ্রের অগাধ জল, প্রবল ঝটিকা, ভীষণ তরঙ্গ এ সমস্ত আপাততঃ দূরদেশ গমনাগমনের অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক বোধ হয়। কিন্তু জলের সহিত কাষ্ঠের সম্বন্ধ ও জলপ্লুত দ্রব্যের সহিত বায়ুর সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া, ও বাষ্পের অদ্ভুত শক্তি অবধারণ করিয়া মনুষ্য এক্ষণে সাগর-সলিলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পোত সমুদায় সন্তারিত করিয়া দেশ দেশান্তর গমন করিতেছে। পরমেশ্বর কোন্ কালে মনুষ্যে ও তৎসম্বন্ধ বাহ্য পদার্থে এই সমস্ত গুণ সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তি সহকারে এ সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবগত হইতেছি ও তদ্দ্বারা সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতেছি। পরমেশ্বর আমাদিগের মনোবৃত্তি সকল সতত সব্যাপার রাখিবার নিমিত্ত পরমোৎকৃষ্ট কৌশল প্রকাশ করিয়া বাহ্য বস্তুর সহিত তাহাদের এরূপ শুভকর সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, ইহাও আমরা কেবল সম্প্রতি জ্ঞাত হইতেছি। এক্ষণে বাষ্পীয় মহাপোত পৃথিবীর অতি দূরবর্ত্তী দেশ সমুদায়কে পরস্পর সন্নিকট করিতেছে, যে বেলুন যন্ত্র সহকারে ভূমণ্ডলের মনুষ্য গগনমণ্ডলে উড্ডীয়মান হইতেছে, ও যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঊর্দ্ধস্থিত নক্ষত্র-মণ্ডলের সংবাদ নিমেষ মাত্রে এই অধোলোকে আনয়ন করিতেছে, তৎসমু-দায়ই পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই এরূপ বিচিত্র পদার্থ, তাহাদের পরস্পর সামঞ্জস্য, ও পরমাশ্চর্য্য কৌশল অব্যক্ত রহিয়াছে, তৎপ্রকাশার্থে কেবল অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যদিগের উদয় হইবার অপেক্ষা। জগদীশ্বর সৃজন কালেই এ সমস্ত সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং আমাদিগের মানসিক প্রকৃতি তৎসম্বন্ধ বাহ্য বস্তু সমুদায়কে তদুপযোগী

করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পরম মঙ্গলালয়, তাঁহার দ্বারা যাহা কিছু উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাই মঙ্গলদায়ক। তিনি যখন আমাদের সুখ সঞ্চার শরীর ও মনের চেষ্টাধীন করিয়াছেন তখন তদনুযায়ী ব্যবহারই নিশ্চিত শুভদায়ক, এবং অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাতে প্রবৃত্ত থাকা উচিত।

মনোবৃত্তি নিচয়ের সামঞ্জস্য সাধন

দ্বিতীয়তঃ। সমুদায় মনোবৃত্তিকে পরস্পর সম্পূর্ণরূপে সমঞ্জসীভূত করিয়া চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য, নতুবা এ সংসারে যে প্রমাণ স্থায়ী সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা আছে, তাহা সম্পন্ন হয় না। কেবল ধন কিম্বা যশোলাভই জীবনের সার কার্য্য জানিয়া তন্মাত্র উপার্জ্জনে আয়ুঃক্ষয় করিলে ভক্তি, উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তিকে তৃপ্ত করা হয় না, সুতরাং অন্তঃকরণ সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানানুসন্ধানপূর্ব্বক আপনার প্রতি, স্বদেশের প্রতি, সমস্ত মনুষ্যবর্গের প্রতি, ও পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করিলে, সমস্ত মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া ধন, মান, খ্যাতি ও শারীরিক স্বাস্থ্য লাভাদি বিবিধ ফল প্রদান করে, এবং অন্তঃকরণ সর্ব্বদা স্থির সুখ প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখী হয়।

মনোবৃত্তি নিচয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর ঐক্যবিধান

তৃতীয়তঃ। মনুষ্যের সুখ স্বচ্ছন্দতাকে বদ্ধ-মূল করিতে হইলে, তাঁহার সমস্ত মনোবৃত্তি পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে তাহার সহিত বাহ্যবস্তুবিষয়ক নিয়ম সমুদায়ের ঐক্য রাখা আবশ্যক, এবং বুদ্ধি যাহাতে উভয়েরই স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণপূর্ব্বক ভ্রম-প্রমাদ শূন্য হইয়া সৎপথ-প্রবর্ত্তক হইতে পারে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ পরমেশ্বর এইরূপই করিয়াছেন। তিনি মানব প্রকৃতির সহিত জগতের সমুদায় নিয়মের ঐক্য করিয়া আমাদের সুখোন্নতি সাধনের

সুন্দর উপায় ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য সমস্ত মনোবৃত্তিকে ইহলোকে উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সেই সমুদায় শুভবৃত্তিকে বিশ্ব-রাজ্যের নিয়ম নিরূপণ পূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম করিয়াছেন। আমরা যখন তাহাদের পূর্ণাবস্থা সম্পাদনে সমর্থ হইয়া তাহাদিগকে যথাবৎ নিয়োগ করিতে পারিব, তখনই চরিতার্থ হইব। অতএব আমরা যত জ্ঞান লাভ করিব, এবং যথানিয়মে শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায় যত চালনা করিব, ততই যে বিশ্বস্রষ্টার জ্ঞান ও করুণার অশেষ নিদর্শন প্রকাশ পাইতে থাকিবে, ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

অক্ষয়-সুধা

তৃতীয় খণ্ড

বিজ্ঞান

অক্ষয়-সুধা

তৃতীয় অধ্যায়

বিজ্ঞান

[নিসর্গ-কথা]

মেঘ ও বৃষ্টি

জল উত্তপ্ত হইলে যে ধূমাকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাষ্প কহে। শীত ঋতুর প্রাতঃকালে নদী, সরোবর প্রভৃতি হইতে যে ধূমাকার বস্তু উঠিতে দেখা যায়, তাহাও ঐ বাষ্প বৈ আর কিছুই নয়। ঐ সকল বাষ্প ঘন হইলেই মেঘ হয়।

বাষ্প ও মেঘ

মেঘ সচরাচর দুই ক্রোশের অধিক উঠিতে পারে না। এমন কি, অনেক মেঘ দেড় ক্রোশ পর্য্যন্তও উত্থিত হয় না। বৃষ্টির সময়ে, কতখান মেঘ কেবল অর্দ্ধক্রোশ মাত্র উর্দ্ধে থাকিয়া জলবর্ষণ করে, এই নিমিত্ত উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলে, অধোদিকে মেঘের চলাচল দেখিতে পাওয়া

যায়। চারি পাঁচ ক্রোশ উপরের বায়ু অতি স্বচ্ছ ও পরিশুষ্ক। তথায় মেঘ ও বাষ্পের লেশমাত্র নাই।

মেঘের উৎপত্তি, বায়ুর শৈত্য ও উষ্ণত্বের উপর বিস্তর নির্ভর করে। জল যত উত্তপ্ত হয়, তাহা হইতে ততই বাষ্প উঠিতে থাকে। এ নিমিত্ত প্রখর গ্রীষ্মের সময়ে অধিক বাষ্প উৎপন্ন হইয়া অধিক দূর উত্থিত হয়। সেই সমস্ত বাষ্প উপরিস্থিত বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া থাকে; অত্যন্ত লঘু বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ সমূহ বাষ্পরাশি আকাশ-মণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, এমত সময়ে যদি কোন দিক্ হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে, ঐ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘ জন্মায়। এইরূপ অন্য অন্য কারণেও বায়ুর উষ্ণতা হ্রাস ও শৈত্য-বৃদ্ধি হইয়া, মেঘ উৎপাদন করে। দিবাবসান-কালে বায়ুর উত্তাপ ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে; এই নিমিত্ত সে সময়ে সতত মেঘ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। উপরিস্থিত বায়ু অধঃস্থিত বায়ু অপেক্ষা শীতল; এই হেতু যে সমস্ত জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইবার সময়ে অদৃশ্য থাকে, তাহা উপরে উঠিয়া ঘন হইয়া মেঘ জন্মায়।

মেঘের উৎপত্তি

উপরে প্রতিক্ষণ নানা দিকে নানা প্রকার বায়ু-প্রবাহ বহিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মেঘ-সমুদায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া অশেষবিধ অদ্ভুত আকার ধারণ করে। মেঘ সকল এক নিমিষের নিমিত্তেও স্থির নহে, সর্ব্বদাই তাহাদের কোন না কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। অদৃশ্য জলীয় বাষ্পের সহিত শীতল বায়ু মিশ্রিত হইলে, যেমন সেই বাষ্প ঘন হইয়া, মেঘ উৎপাদন করে, সেইরূপ আবার উৎপাদিত মেঘে উষ্ণ বায়ু লাগিলে, সেই মেঘ বিক্ষিপ্ত হইয়া, অদৃশ্য হইয়া যায়। এক এক খান মেঘ উঠিতে উঠিতে যে অন্তর্হিত হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই।

মেঘ অদৃশ্যের হেতু

সমুদায় মেঘই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জল-কণা-সমূহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া, অশেষ-প্রকার মনোহর বর্ণ উৎপাদন করে। সূর্য্য কিরণে নীল, পীত, লোহিত, হরিৎ, পাটল প্রভৃতি নানা বর্ণ আছে। বহু-কোণ-বিশিষ্ট কাচে ও অন্য অন্য কোন বস্তুতে সূর্য্যকিরণ পাতিত করিয়া ঐ সকল বর্ণ পৃথক্ করিয়া দেখান যায়। বেলোয়ারি ঝাড়ের কলমে রৌদ্রের আভা পতিত হইয়া যে নানাবিধ বর্ণ উৎপাদন করে, তাহা অপর সাধারণ সকলেই বিদিত আছে। গগন-মণ্ডলস্থ মেঘাবলির বিচিত্র বর্ণও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে; সচরাচর এই কয়েক বর্ণের মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়; - শ্বেত, পীত, লোহিত, পিঙ্গল ও ধূসর। হরিদ্বর্ণ মেঘও পরম সুদৃশ্য; কিন্তু অতি বিরল। সায়ংকালীন জলদ-জালের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া, কে না মোহিত হয়?

মেঘাবলির বর্ণ-বৈচিত্র্য

রামধনুর পরম সুন্দর শোভাও ঐরূপে সমুদ্ভূত হয়। উল্লিখিত বহুকোণ কাচের ন্যায়, বৃষ্টি-কালীন-জল-কণা-সমূহে সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইলেও, তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন কিরণ-জাল সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উহার এক একটি জল-কণা এক এক খানি বহুকোণ কাচ-স্বরূপ। এইরূপ বহু-সংখ্যক জল-বিন্দু একত্র হইয়া রামধনু উৎপাদন করে। নভো-মণ্ডলের যে ভাগে সূর্য্যমণ্ডল অবস্থিত থাকে, তাহার বিপরীত ভাগে রামধনু দৃষ্ট হয়। লোকে উহাকে রামধনু ও ইন্দ্রধনু উভয়ই বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক উহা কাহারও ধনু নয়। জল-কণা-সমূহে সূর্য্য-কিরণ পতিত হইয়া, এইরূপ মনোহর আকার উৎপন্ন হয়। সূর্য্য-কিরণের ন্যায় চন্দ্র-কিরণেও রামধনু উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু চান্দ্র রামধনুর বর্ণ সৌর রামধনুর তুল্যরূপ উজ্জ্বল নয়। যিনি এই অত্যাশ্চর্য্য অচিন্ত্য বিশ্ব-কার্য্যের সর্ব্বস্থানে সুললিত

—উহার হেতু

সৌন্দর্য্য-সুধা বর্ষণ করিতেছেন, উহাতে কেবল তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ পাইতেছে!

মেঘ কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-কণা-ব্যতিরেকে যে আর কিছুই নয়, ইহা পূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন বাষ্প শীতল হইয়া মেঘ জন্মায়,

বৃষ্টির উৎপত্তি

সেইরূপ মেঘ শীতল হইলে, তাহার অণু সমুদায় ঘন হইয়া, জল হইয়া পড়ে। যে মেঘের ভার যে স্থানের বায়ুর ভারের সমান, সেই মেঘ সেই স্থানে অবস্থিত থাকে। পরে কোন হেতু বশতঃ শীতল হইলেই ঘনীভূত ও ভারাক্রান্ত হইয়া জল-ধারা-রূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। ইহাকেই বৃষ্টি কহে। অতএব বৃষ্টির নিয়ম অতি সহজ। ইহা জানিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস আবশ্যক করে না।

সমুদ্র ও জলাভূমি হইতে অধিক বাষ্প উত্থিত হয়। এই নিমিত্ত সেই সেই স্থানে ও তাহার সমীপবর্ত্তী প্রদেশে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। পর্ব্বত-

পর্ব্বত-শিখরে বৃষ্টির প্রাচুর্য্য

শিখর অপেক্ষাকৃত শীতল; অতএব যে সকল মেঘ চলিতে চলিতে পর্ব্বত-শিখরে গিয়া অবস্থিত হয়, তাহা শীতে ঘনীভূত হইয়া জল হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত পর্ব্বতেও অধিক পরিমাণে জল-বর্ষণ হইয়া থাকে। যে পর্ব্বত সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী, তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্ষণ হয় এবং যে পর্ব্বত সমুদ্র-তট হইতে দূরবর্ত্তী, তাহাতে তদপেক্ষা অল্পতর বৃষ্টিপাত হয়।

বায়ু প্রবাহের ইতর বিশেষ দ্বারা বৃষ্টি-পাতেরও অনেক ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ-দিকে সমুদ্র; এ নিমিত্ত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ,

বায়ু-প্রবাহ ও বৃষ্টিপাত

আষাঢ়, শ্রাবণ প্রভৃতি যে কয়েক মাস দক্ষিণ দিক্ অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, সেই সেই মাসে উল্লিখিত সমুদ্র হইতে উৎপন্ন মেঘ-সমুদায় ঐ বায়ু-সহকারে সঞ্চালিত হইয়া, ভারত-ভূমির উপর প্রচুর বারি-

বর্ষণ করে। এই প্রবল বায়ু কয়েক মাস প্রবাহিত থাকাতে ভারতবর্ষের বর্ষাকাল, শীত বসন্ত গ্রীষ্মাদি ঋতুর ন্যায়, এক স্বতন্ত্র ঋতু বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। ইংলণ্ডে ও তাদৃশ অন্য অন্য প্রদেশে এরূপ স্বতন্ত্র বর্ষা ঋতু নির্দ্দিষ্ট নাই, সে সকল স্থানে বার মাসই বৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের উত্তর-দিকে মেঘোৎপত্তির উপায় নাই। এ নিমিত্ত, এতদ্দেশে কার্ত্তিক মাসে দক্ষিণ বায়ু নিবৃত্ত হইয়া, উত্তরীয় বায়ু আরব্ধ হইলে, জলবর্ষণও এক প্রকার নিবৃত্ত হয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের অর্থাৎ দক্ষিণাপথের পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ তিন দিকেই সমুদ্র। এ নিমিত্ত, যে সময়ে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তখন দক্ষিণাপথের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে, অর্থাৎ মলয়বর-দেশে প্রচুর বারিবর্ষণ হয়, এবং যখন পূর্ব্বোত্তর হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে অর্থাৎ চোর-মণ্ডল-নামক উপকূলে আসিয়া মেঘ ও বৃষ্টি উপস্থিত করে।

পর্ব্বতাদি দ্বারা বায়ুর প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হওয়াতেও বৃষ্টিপাতের অনেক ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। যে বায়ু-প্রবাহ দ্বারা বাষ্পবারি আনীত হইয়া, ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর খণ্ডে মেঘ সঞ্চারিত ও বারিবর্ষিত হয়, তাহা প্রথমতঃ পশ্চিম-দক্ষিণ হইতে বঙ্গীয় অখাতের উপর দিয়া বাহিত হয়।

বৃষ্টির ন্যূনাধিক্যের হেতু

পরে, যখন হিমালয় ও তৎসন্নিহিত দক্ষিণদিকৃস্থ পর্ব্বতের নিকট উপনীত হইয়া, তদ্দ্বারা প্রতিহত হয়, তখন আর উত্তরাংশে গমন করিতে না পারিয়া, পশ্চিমোত্তর ভাগে চলিতে থাকে। পশ্চিমোত্তর ভাগে বহিতে বহিতে, যখন হিন্দুকুশ নামক পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন তদ্দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া, পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই প্রকারে সুলিমান-নামক পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিয়া, তদ্দ্বারা পুনরায় প্রবাহিত হইয়া, অন্য দিকে সঞ্চরণ করে।

যে সমস্ত মেঘ ও বায়ু উল্লিখিত বায়ু-প্রবাহ দ্বারা সঞ্চারিত হয়, তাহা হিমালয়ের উত্তরাংশে গমন করিতে পারে না; হিমালয়-কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া, বারিবর্ষণপূর্ব্বক গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি অনেক অনেক নদীর জল বৃদ্ধি করে ও সেই সমস্ত নদীর তীরস্থ ভূমি জলে প্লাবিত করিয়া, উর্ব্বরা করিয়া থাকে। ঐ বায়ু হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাহার উত্তর-দিকে মেঘ ও বাষ্প সঞ্চালন করিতে পারে না। এ নিমিত্ত জলাভাবে সেই প্রদেশ মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে।

যদি কোন পর্ব্বতময় প্রদেশ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তাহা হইলে, তত্রস্থ মেঘ-সমুদায় সেই বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া, অন্য নিম্নস্থানে গিয়া বর্ষণ করে। যদি সেই সমস্ত স্থান অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হয়, তাহা হইলে, ঐ মেঘ ঘনীভূত না হইয়া, আরও লঘু হইয়া যায়; সুতরাং তাহাতে বৃষ্টি হয় না। এই কারণে ইউরোপের দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী ভূমধ্য-সাগর হইতে যে সমস্ত বাষ্পরাশি উৎপন্ন হইয়া মিশর দেশের উপর দিয়া, দক্ষিণাভিমুখে গমন করে, তাহা উল্লিখিত মিশরদেশের উপরে ঘনীভূত ও বর্ষিত না হইয়া, উত্তরোত্তর দক্ষিণ-দিকেই চলিয়া যায়। পরে যখন আবিসিনিয়ার পর্ব্বতময় উন্নত প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন জল হইয়া বর্ষিত হইতে থাকে। এই নিমিত্ত মিশর দেশে সর্ব্বদাই অনাবৃষ্টি, গ্রীষ্মকালে মূলেই বৃষ্টি হয় না, অন্য সময়েও অতি অল্প। বিশেষতঃ তাহার দক্ষিণখণ্ডে জল-বর্ষণ অতি অসামান্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত আছে। তত্রত্য লোক বৃষ্টি ব্যতিরেকে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, বিবেচনা করিতে হইলে, আপাততঃ বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রকাশ করিয়া, তাহাদের অনাবৃষ্টি-ঘটিত অনিষ্টপাতের আশঙ্কা একেবারে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন; তথায় যেমন যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় না, তেমন গ্রীষ্মকালে এরূপ শিশির-বর্ষণ হয় যে, তথাকার

মিশরে অনাবৃষ্টি

মৃত্তিকা তাহাতেই আর্দ্র হইয়া, বিলক্ষণ উর্ব্বরা হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন তথায় নীল-নামে এক নদী আছে; তাহা গঙ্গা নদীর ন্যায় প্রতিবর্ষে বৃদ্ধি পাইয়া, উভয় তট কয়েকমাস জলে প্লাবিত করিয়া রাখে। উহাতে ঐ উভয় তীরস্থ ভূমি অত্যন্ত-রসশালিনী হইয়া অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করে।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী পেরু দেশে বালেশ-নামে এক স্থান আছে, তথায় দক্ষিণ-দিক্ হইতে উত্তর-দিকে বায়ু বহিয়া থাকে। সে স্থানের দক্ষিণ-দিক্ শীতল এবং উত্তর-দিক্ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, শীতল প্রদেশ হইতে উষ্ণ প্রদেশে বাষ্প সঞ্চালিত হইলে, বৃষ্টিপাত হয় না। এই নিমিত্ত ঐ বালেশ ভূমিতে কোনকালেই বৃষ্টি হয় না। কিন্তু করুণার্ণব বিশ্ববিধাতার কি আশ্চর্য্য মহিমা! সেখানে যেমন কোন সময়ে বিন্দুপাতও হয় না, তেমন শীতকালে এরূপ ঘোরতর কুজ্ঝটিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে যে, তদ্দ্বারা অত্যন্ত অনুর্ব্বরা ভূমিও উর্ব্বরা হয় এবং পথের ধূলিও কর্দ্দম হইয়া যায়।

আমাদের দেশে যেমন দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের বায়ুতে অধিক বৃষ্টি হয়, অন্য অন্য দেশেও ইহার অনুরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন দেশে বর্ষণের ন্যূনাধিক্য

দেশ-বিশেষে দিগ্বিশেষ হইতে বায়ু বহিলে যে বর্ষণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে, ইহা তত্তদ্দেশীয় লোকের নিকট প্রসিদ্ধি আছে। ইংলণ্ড দেশে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে বায়ু বহিলে, অধিক বৃষ্টি হয়। ইহার কারণ এই যে, ঐ দেশের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অতি বিস্তৃত সমুদ্র আছে, সেই সমুদ্রের কিয়দংশ অতিশয় উষ্ণ; সুতরাং তথা হইতে প্রচুর বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, উষ্ণ বায়ুর সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক বাষ্প মিশ্রিত থাকিতে পারে। ইংলণ্ডের দক্ষিণ-দিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, ঐ বাষ্প সেই বায়ু-সহকারে সঞ্চালিত হইয়া

ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড প্রভৃতি শীতল প্রদেশে নীত হইলে, ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি হইয়া পড়ে।

কোন্ প্রদেশে কত বৃষ্টি পতিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহা পরিমাণ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত বর্ষ-মান নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রতিবর্ষে কোন্ স্থানে কত জল পতিত হয়, ঐ যন্ত্র দ্বারা পরিমাণ করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। উহাতে যত বুরুল জল পতিত হয়, তত্তৎ স্থানে বৃষ্টি তত বুরুল বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়।

বর্ষমান যন্ত্র

উষ্ণ স্থানে অধিক বৃষ্টি পতিত হয়, শীতল স্থানে তদপেক্ষা অল্প। ইহার কারণ, উষ্ণ স্থানে যত বাষ্প উৎপন্ন হয়, শীতল স্থানে কথনই তত হয় না। বাষ্প অধিক উৎপন্ন না হইলে, সুতরাং বৃষ্টিও অধিক হইতে পারে না। ফলতঃ পৃথিবীর যে সকল প্রদেশ প্রখর রবি-কিরণে প্রতপ্ত, তথায় অধিক বারিবর্ষণ আবশ্যক করে, এই নিমিত্তই পরম-কারুণিক পরমেশ্বর জল-বর্ষণ-বিষয়ে ঐরূপ শুভকর ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন।

উষ্ণ স্থানে বৃষ্টির আধিক্য

জল-বর্ষণের সহিত কথন কথন অন্য অন্য বস্তুও পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। এ বিষয় আপাততঃ আশ্চর্য্য বোধ হয় বটে, কিন্তু পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া সে আশ্চর্য্য দূরীকৃত করিয়াছেন। আঠার শত দশ খৃষ্টাব্দে, ইউরোপের অন্তঃপাতী হঙ্গেরী দেশে রক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ জল বর্ষিত হয়। প্রথমে ইহা অতিশয় বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল, পরে অবধারিত হইল, ঐ প্রদেশের অনতিদূরে এক অরণ্য আছে; তাহা হইতে পুষ্প-রেণু সকল বায়ু-সহকারে সঞ্চালিত হইয়া, বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় লোক যে রক্ত-বৃষ্টির কথা কহিয়া থাকে, তাহাও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। এক বার আয়র্লণ্ডে বৃক্ষ-নির্য্যাসের ন্যায় ঘনতর একপ্রকার দ্রব

অন্যান্য বস্তুবর্ষণ

পদার্থ পতিত হয়। পরীক্ষা করিয়া নিরূপিত হইল, তাহাও উদ্ভিদ্ ও জন্তু বিশেষ হইতে নির্গত পদার্থ-বিশেষ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। একদা পারস্যানে এমন একরূপ অপরিজ্ঞাত পদার্থ পতিত হয় যে, পশুগণ তাহা ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আঠার শত আটাইশ খৃষ্টাব্দে ঐ বস্তু ফরাশিশ দেশের এক সমাজে উপস্থিত করা হয়। উহা এক প্রকার উদ্ভিদ্। চীন দেশে প্রতি বৎসর বারংবার বালুকা-বর্ষণ হইয়া থাকে। সতর শত চুয়াত্তর শকের চৌদ্দই চৈত্রে আরম্ভ হইয়া সতরই চৈত্র পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত এরূপ বালুকা-বৃষ্টি হয় যে, ঐ কয়েক দিবস চন্দ্র-সূর্য্য অদৃশ্যবৎ হইয়াছিল। চীন দেশের উত্তর পার্শ্বে গবি নামে বহু-বিস্তৃত বালুকা-ভূমি আছে এবং তথায় সর্ব্বদা ঘোরতর ঘূর্ণি-বায়ুও উপস্থিত হইতে থাকে; অতএব বোধ হয়, ঐ বালুকা ঘূর্ণি-বায়ু দ্বারা আকাশমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, অনেক অনেক দূরবর্ত্তী প্রদেশে বর্ষিত হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বায়ুই এই সমুদায় অদ্ভুত বৃষ্টিপাতের প্রবল কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কত কত মৎস্য প্রবল বায়ু দ্বারা চারি পাঁচ ক্রোশ পরিচালিত হইয়া থাকে।

উষ্ণ-প্রস্রবণ

পৃথিবীর কত স্থানে কত প্রকারই অদ্ভুত পদার্থ আছে, এবং তদ্দ্বারা কতই বা আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে! স্থানে স্থানে ভূ-মণ্ডলের অভ্যন্তর হইতে যে জল-প্রবাহ নির্গত হয়, তাহার নাম প্রস্রবণ। যে সকল প্রস্রবণের জল স্বভাবতঃ সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে, তাহার নাম উষ্ণ প্রস্রবণ; ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে সীতাকুণ্ড নামে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে, তাহা লোকের

প্রস্রবণ

অবিদিত নাই। পাটনা জেলার অন্তর্গত রাজগিরে এবং বীরভূম জেলার অন্তর্গত বক্রেশ্বর তীর্থে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সে সমুদায়ের প্রচলিত নাম 'কুণ্ড'।

পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডেও অনেকানেক উষ্ণ-প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ আইস্‌লণ্ড দ্বীপে যত, এত আর কুত্রাপি নাই এবং তথাকার কতকগুলি প্রস্রবণের জল যেরূপ তেজে নির্গত হয়, অন্য কোন স্থানের প্রস্রবণের সেরূপ তেজ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার অধিকাংশ কোন কোন পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী ভূমি হইতে, অনেকগুলি পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ হইতে, আর কয়েকটা শিখর দেশের নিকট হইতে বহির্গত হইয়াছে।

আইসলণ্ডে উষ্ণ প্রস্রবণ গয়সের

পূর্ব্বোক্ত দ্বীপে যত উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, তাহাদের মধ্যে গয়সের নামে বিখ্যাত তিন চারিটী প্রস্রবণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তন্মধ্যেও আবার দুইটি বিশিষ্টরূপে প্রসিদ্ধ, মহাগয়সের ও নবগয়সের।

তথায় মৃত্তিকাময় প্রাকারে পরিবেষ্টিত এক বৃহৎ কুণ্ড আছে। যখন স্থির থাকে, তখন তাহার জল বিলক্ষণ উষ্ণ ও কাচের ন্যায় নির্ম্মল এবং তাহা হইতে সর্ব্বদা জলীয় বাষ্প ও অল্প অল্প বুদ্‌বুদ্‌ উঠিয়া থাকে। কুণ্ডের পরিধি অর্থাৎ বেড় ন্যূনাধিক ১০০ এক শত হস্ত; কিন্তু তাহার জল অধিক গভীর নয়। যখন কুণ্ড পরিপূর্ণ থাকে, তখন ৩ তিন হাতের অপেক্ষা অধিক জল থাকে না। তাহার মধ্যস্থলে ন্যূনাধিক ৫৪ চোয়ান্ন হস্ত গভীর একটা কূপ আছে, সেই কূপ আড়ে ৬ ছয় হাত। কিন্তু মুখের নিকট ক্রমে প্রশস্ত হইয়া কুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে।

বৃহৎ কুণ্ড

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে যেমন উষ্ণ জল ও জলীয়বাষ্পাদি প্রচণ্ডবেগে নির্গত হয়, উল্লিখিত প্রস্রবণ হইতেও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ

হইয়া থাকে। প্রথমে ঘন ঘন কামানের শব্দের ন্যায় ঘোরতর গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করা যায়, তৎক্ষণাৎ ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, পরক্ষণেই কুণ্ডের জল উত্তরোত্তর প্রবলরূপে ফুটিতে থাকে; অবশেষে জল ও বাষ্পাদি সহসা উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সেই সমস্ত বাষ্প এত ঊর্দ্ধে উঠে যে, প্রায় ৮ আট ক্রোশ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ জল ও বাষ্প বারংবার নির্গত হইবার পর একটা প্রকাণ্ড জল-প্রবাহ প্রভূত বাষ্পরাশিতে পরিবেষ্টিত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে বহুদূর উত্থিত হইয়া থাকে। সে সমস্ত অত্যদ্ভুত বৃহদ্‌ব্যাপার দৃষ্টি করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ভূরি ভূরি বাষ্পরাশি ঘূর্ণিত হইতে হইতে উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করে এবং সেই সঙ্গে ঊর্দ্ধগামী জল-প্রবাহ সকল কম্পিত হইতে হইতে ফেনাকার হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। সেই ফেনের কিয়দংশ বাষ্প হইয়া যায়। অবশিষ্ট ভাগ পৃথিবীতলে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব ফেন-বর্ষণ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ঊর্দ্ধগামী জল-প্রবাহ

ভূ-মণ্ডলে ইহার তুল্য সুদৃশ্য আশ্চর্য্য ব্যাপার অতি বিরল। কুণ্ডের জল নির্গত ও উত্থিত হইবার সময়ে নানাবিধ মনোহর বর্ণ ধারণ করে। কখন কখন উৎকৃষ্ট নীলবর্ণে, কখন কখন উজ্জ্বল হরিদ্‌বর্ণে, এবং অধিক দূর উত্থিত হইলে শুদ্ধ শ্বেতবর্ণে শোভা পায়। ঊর্দ্ধগামী প্রবাহ সমুদায় নানাভাগে বিভক্ত হইয়া সহস্র সহস্র পরম শোভাকর শুভ্রবর্ণ জলধারা উৎপাদন করে। তন্মধ্যে কতকগুলি ধারা ঠিক সরলভাবে উত্থিত হয়, আর কতগুলি ধারা সুন্দররূপ বক্রভাবে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে। ঐ সকল জলধারার বেগ এরূপ প্রবল যে, তাহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে, সে প্রস্তর তৎক্ষণাৎ ভূ-মণ্ডলে পতিত না হইয়া, কিয়দ্দূর জলের তেজে ঊর্দ্ধগামী হয়। কুণ্ড হইতে কিয়ৎকাল

অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য

এইরূপ জল নির্গত হইয়া নিবৃত্ত হয়; তখন সেই কুণ্ড একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। পরে আবার জল উঠিয়া পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া থাকে।

জলের উষ্ণতা

ঐ কুণ্ডের জল এত তপ্ত যে, পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা অগ্নি ব্যতিরেকে ঐ জলে মাংস পাক করিয়া খায়। তাহারা একটি পাত্রে শীতল-জল-সংবলিত মাংস পূরিয়া ঐ কুণ্ডের উষ্ণ জলে সেই পাত্র স্থাপন করে। ইহাতে মাংস পাক হয়, আর অগ্নি আবশ্যক করে না।

যুগল প্রস্রবণ

কত দেশে কত আশ্চর্য্য উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। পূর্ব্বোক্ত আইস্‌লণ্ড দ্বীপেই পরস্পর নিকটবর্ত্তী এমন দুই অদ্ভুত প্রস্রবণ বিদ্যমান আছে যে, যখন তাহার একটা হইতে জলধারা সকল উত্থিত হইতে থাকে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতীয় প্রস্রবণ হইতে কিছুমাত্র জল নির্গত হয় না, এবং তৎপরে যখন ঐ দ্বিতীয় প্রস্রবণ হইতে জলধারা নির্গত হয়, তখন প্রথমোক্ত প্রস্রবণ হইতে একটিও ধারা উত্থিত হয় না। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে উভয় কুণ্ডের জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া পরম কৌতুক উৎপাদন করে। ইহা দেখিয়া আপাততঃ অদ্ভুত বোধ হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

সমুদ্র গর্ভে উষ্ণ-প্রস্রবণ

সমুদ্রের গর্ভমধ্যেও ঐরূপ অনেকানেক উষ্ণ-প্রস্রবণ বিদ্যমান আছে। কোন কোনটার জলধারা সতেজে নির্গত হইয়া, সমুদ্রের উপরিভাগস্থ জল অপেক্ষাও অধিকতর ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে।

প্রস্রবণে দাহ্য-পদার্থ

কোন কোন প্রস্রবণ হইতে জলের সহিত এরূপ দাহ্য পদার্থ সকল নির্গত হয় যে, তাহা অগ্নিসংযুক্ত হইবামাত্র জ্বলিয়া উঠে। তাহা দেখিলে বোধ হয়, যেন জলই জ্বলিতেছে।

যে যে প্রদেশে আগ্নেয় গিরি আছে, অথবা পূর্ব্বে কোন কালে ছিল, কিংবা যেথানে অগ্নি ঘটিত অন্য কোন প্রকার নৈসর্গিক উৎপাতের ঘটনা হইয়াছিল সেই সেই প্রদেশেই অনেক উষ্ণ-প্রস্রবণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বোধ হয়, যে রূপে আগ্নেয় গিরি উৎপন্ন হয়, উষ্ণ-প্রস্রবণও সেইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উৎপত্তির আনুমানিক হেতু

ভূ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কহেন,—অবনীর অভ্যন্তরস্থ অগ্নিময় মহাসাগরের তরঙ্গ লাগিয়া, তাহার উপরিস্থিত কঠিন আবরণ স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া ছিদ্র উৎপন্ন হয়, এবং পৃথিবীর গর্ভস্থিত উষ্ণ জল সেই ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া, উষ্ণ-প্রস্রবণ উদ্ভাবন করিয়া থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তর সাতিশয় উষ্ণ। যে স্থান হইতে যে প্রস্রবণের জল উৎক্ষিপ্ত হয়, সে স্থান যেমন উষ্ণ, সে প্রস্রবণের জলও তদনুরূপ উষ্ণ হইয়া থাকে। জল যত উত্তপ্ত হইলে ফুটিয়া উঠে, প্রস্রবণ যদি তদপেক্ষা অধিক উষ্ণ হয়, তাহা হইলে, সেই প্রস্রবণের জল নির্গত হইবা মাত্র বাষ্প হইয়া যায়।

ভূ-তত্ত্ববিদের অনুমান

এই সমস্ত অদ্ভুত বিষয় সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরেরই অচিন্ত্য শক্তি ও অনুপম কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। তিনি পূর্ব্বকালে যে যে বস্তুকে যে যে গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের সেই সেই গুণ দ্বারা এই সমুদায় অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া, তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে।

———

জল-প্রপাত

নানা দেশ ও নানা স্থান পরিভ্রমণ করিলে, জগদীশ্বরের কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য, কতই বা বিচিত্র কীর্ত্তি দৃষ্টি করা যায়। নদী সমুদায় এক এক পর্ব্বতের উচ্চ দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে অথবা তাদৃশ অন্য কোন জলাশয়ে গিয়া পতিত হয়। প্রথমে কোন প্রস্রবণ হইতে অল্প অল্প জল নিঃসৃত হয়, পরে অন্যান্য সেইরূপ জলের সহিত মিলিত হইয়া, ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। ভূমির উচ্চতা ও নিম্নতা অনুসারে কোন কোন স্থানে দ্রুতবেগে গমন করে, কোথাও মন্দ মন্দ চলে, কোথাও বা ভয়ঙ্কর আবর্ত্তরূপে পরিণত হইয়া ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে, কুত্রাপি সম্মুখবর্ত্তী শিলা-রাশি দ্বারা প্রতিহত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। যে নদীর প্রবাহ চলিতে চলিতে কোন স্থানে সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে পর্ব্বত-সমূহে লাগিয়া বাধা পায়, তাহার জল সেই স্থানে একত্র হইয়া, যেদিকের যে পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা অল্প উচ্চ, সেই দিকেই সেই পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া অবতীর্ণ হয়। সেই প্রকাণ্ড জল-রাশি প্রচণ্ডবেগে ভয়ঙ্কর শব্দ করত একেবারে শত শত বা সহস্র সহস্র হস্ত নীচে পতিত হইয়া, অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত করে; ইহাকে জল-প্রপাত কহে।

জল-প্রপাত

আসিয়া, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা চারিখণ্ডেই ভূরি ভূরি জল-প্রপাত আছে। তন্মধ্যে ইয়ুরোপের অন্তঃপাতী সুইজর্লণ্ড দেশীয় জল-প্রপাতসকল সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। তথায় ভূরিপ্রমাণ ভীষণাকার জলরাশি পর্ব্বতের উর্দ্ধদেশ হইতে ভয়ঙ্কর-বেগে ঘোরতর গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক একেবারে কোথাও দেড় সহস্র, কোথাও বা দুই সহস্র হস্ত নীচে পতিত হইতেছে।

জল-প্রপাত সর্ব্বত্র

কিন্তু আমেরিকার জল-প্রপাত-সমুদয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। সেই সকল জল-প্রপাত দৃষ্টি করিলে, চমৎকৃত হইতে হয়। ঐ খণ্ডে নায়েগেরা নামে এক নদী আছে, তাহার জল-প্রপাত এক অদ্ভুত পদার্থ। তাহার অত্যন্ত বিস্তার, অতি প্রচণ্ড বেগ, ঘোরতর গভীর গর্জ্জন, প্রভূত ফেন-রাশি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ঐ নদীর জল স্থানে স্থানে পর্ব্বত-বিশেষে পতিত হইয়া এরূপ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় যে, তাহা দৃষ্টি করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ঐ জল-প্রপাতের এ প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ যে, তাহাতে কর্ণ বধির হইয়া যায়, এবং তথায় এক প্রকার প্রচুর ফেনোৎপত্তি হয়, তাহা বাষ্পময় মেঘস্বরূপ হইয়া থাকে। কোন কোন দিন ন্যূনাধিক আঠার ক্রোশ হইতে উহার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এবং ঐ ফেনরাশি এত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় যে, প্রায় একত্রিশ ক্রোশ হইতে উহার বাষ্প দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন গ্রন্থকর্ত্তা ঐ জল-প্রপাতের বর্ণনা করিতে করিতে লিখিয়াছেন,—"একেবারে এক সহস্র কামানে অগ্নি দিলে যেরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ ও প্রভূত ধূম উৎপন্ন হয়, ঐ জল-প্রপাতে সেইরূপ শব্দ ও সেইরূপ বাষ্প উৎপাদন করিয়া থাকে। আর ঐ ফেন রাশির উপর সূর্য্যের রশ্মি পতিত হইয়া যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ করে, তাহা দৃষ্টি করিলে মোহিত হইতে হয়। নভোমণ্ডলস্থ ইন্দ্রধনুতে যত প্রকার বর্ণ দেখা যায়, উহাতে তাহার সমুদায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।" এক পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ জল-প্রপাতে প্রতিপলে দুই কোটি চৌদ্দ লক্ষ আট চল্লিশ হাজার মণ জল পতিত হইয়া থাকে।

নায়েগ্রা জল-প্রপাত

এক এক জল-প্রপাতের ফেন-পুঞ্জের শোভাই বা কত! আমেরিকার মিসোরী নামে এক নদী আছে, তাহার জল-প্রপাতের দক্ষিণভাগ নিরবচ্ছিন্ন শুভ্রাকার ফেনরাশিতে পরিপূর্ণ। সেই ফেন-ময় ভাগের পরিসর প্রায়

চারি শত হস্ত। তাহার ফেনসমুদায় সতেজে উল্লম্ফনপূর্ব্বক প্রায় এক শত পঁয়ত্রিশ হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, এবং উঠিতে উঠিতে সহস্র প্রকার অদ্ভুত আকার ধারণ করিতেছে ও তাহার উপর সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইয়া, নীল-লোহিত-পীতাদি নানাবিধ রমণীয় বর্ণ প্রকাশ করিতেছে। ব্রিটন দেশীয় এক পর্য্যটক আমেরিকার পাসেক নামক নদের জল-প্রপাত দেখিতে গিয়া, এক মনোহর ব্যাপার দৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, তাহার ফেনের উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া অবিকল ইন্দ্র-ধনুর আকার উৎপাদন করিয়াছে। গগনমণ্ডলে যেমন সময়ে সময়ে একখানি ইন্দ্র-ধনুর নীচে আর একখানি দৃষ্ট হয়, সে স্থানেও সেইরূপ দেখিলেন, এবং গগনমণ্ডলস্থ ইন্দ্র-ধনু যেমন নানাবর্ণে বিভূষিত হয়, ঐ জল-প্রপাতের ইন্দ্র-ধনুও সেইরূপ দৃষ্টি করিলেন।

জল প্রপাতের শোভা

এক এক নদীর দুই তিন জল-প্রপাতও থাকে। ইংলণ্ডে ডর্হম্ প্রদেশের পশ্চিম ভাগে টীজ্ নামে এক নদী আছে। তাহার প্রবাহ এক সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতে লাগিয়া বাধা পাওয়াতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, দুই প্রকাণ্ড জল-প্রপাত উৎপাদন করিয়াছে, এবং সেই দুই জল-প্রপাত কিছু দূর পৃথক্ পতিত হইয়া, পরে একত্র মিলিত হইয়াছে। উভয়ে মিলিত হইয়া, ভয়ঙ্কর আকার ধারণপূর্ব্বক প্রবলবেগে অবতীর্ণ হইতেছে, এবং তাহার ফেনসমুদায় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া শোভা সম্পাদন করিতেছে।

ভূ-মণ্ডলে শত শত জল প্রপাত আছে। ভারতবর্ষেও হিমালয়ে ও বিন্ধ্যাদি পর্ব্বতে অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে। জল-প্রপাত কিরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার, চক্ষে না দেখিলে, তাহা সম্যক্‌রূপ অনুভব করা যায় না।

আগ্নেয়-গিরি

আগ্নেয়-গিরি

কোন কোন পর্ব্বতের শিখরদেশে অতি গভীর গহ্বর থাকে; তদ্দ্বারা মধ্যে মধ্যে ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখা, প্রস্তর, কর্দ্দম, উষ্ণজল ও ধাতু-নিঃস্রব প্রবলবেগে নির্গত হয়। সে সকল পর্ব্বতের নাম আগ্নেয়-গিরি। ভূমণ্ডলে ন্যূনাধিক তিন শত আগ্নেয়-গিরি আছে।

অগ্ন্যুৎপাত

আগ্নেয়-গিরি হইতে ধূম, ভস্ম, অগ্নি-শিখাদি নির্গত হওয়াকে ঐ গিরির অগ্ন্যুৎপাত বলে। ঐ অগ্ন্যুৎপাত অত্যন্ত ভয়ানক ব্যাপার। উহা দর্শন করিলে চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়া থাকিতে হয়। উহা দ্বারা কত কত গ্রাম ও কত কত নগর একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিয়তই যে অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হয়, এমন নয়, কত কত আগ্নেয়-পর্ব্বত শত শত বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ থাকে; কোন কোনটা অল্পকাল নির্ব্বাণ থাকিয়াই পুনরায় অগ্নি উদ্গিরণ করে; বোধ হয়, কতকগুলি একেবারেই নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। সকল আগ্নেয়-পর্ব্বত হইতে যে পূর্ব্বলিখিত সমুদায় সামগ্রী নির্গত হয়, তাহাও নয়। যে সকল পর্ব্বত হইতে অত্যুষ্ণ ধাতু-নিঃস্রব নিঃসৃত হয়, তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে। ভস্ম, প্রস্তর, উষ্ণজল, কর্দ্দম এই সমুদায় বস্তুই অনেক আগ্নেয়-পর্ব্বত হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যত ঊর্দ্ধে বরফ থাকিতে পারে, তত ঊর্দ্ধে যে সকল আগ্নেয়-গিরির গহ্বর আছে, তাহা হইতে ভূরি-প্রমাণ জল নিঃসৃত হয়। ইহাতে পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, অগ্ন্যাদি-নির্গমন-কালে বরফ দ্রব হওয়াতে জলের ভাগ বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণ আমেরিকাতে কোটাপাক্সি নামে একটি অত্যুচ্চ আগ্নেয়-গিরি আছে; এক সময়ে তাহার গহ্বরস্থিত ও সেই গহ্বরের পার্শ্বস্থিত বরফ সমুদায় দ্রব হইয়া, এরূপ

প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় যে তাহাতে কত কত নিকটবর্ত্তী নগর ও গ্রাম প্লাবিত ও নষ্ট হইয়া যায়। একবার তথা হইতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত একখানি গ্রাম এই উৎপাতে একেবারে জলাকীর্ণ হইয়া যায়।

পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা এই পর্ব্বতাগ্নি উৎপন্ন হইবার যেরূপ কারণ দর্শাইয়া থাকেন, তাহা লিখিত হইতেছে। পৃথিবীর অভ্যন্তর অতিশয় উষ্ণ। অবনীর পৃষ্ঠদেশ হইতে যে স্থান যত নিম্ন, সে স্থান তত উত্তপ্ত। পনর ষোল ক্রোশ নিম্নস্থিত সমুদায় স্থান অত্যুষ্ণ তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। নারিকেলের মধ্যগত জলভাগ যেমন কঠিন আবরণে আবৃত, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তরল বস্তুরাশিও সেইরূপ কঠিন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। সাগরের জল যেমন কম্পিত হইয়া, তরঙ্গ উপস্থিত করে, অবনী গর্ভস্থ উল্লিখিত অগ্নিময় মহাসাগরও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইয়া, তরঙ্গমালা উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ তরঙ্গ লাগিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের কোন কোন স্থান কম্পিত, স্ফীত ও বিদীর্ণ হয়। যদি ঐ তরঙ্গ অধিক প্রবল না হয়, তাহা হইলে, উহার উপরিস্থিত কঠিন পদার্থ সমুদায় অল্পক্ষণ কম্পিত হইয়া, নিবৃত্ত হয়, অথবা কিছুদূর স্ফীত হইয়া থাকে। আর যদি সমধিক প্রবল হয়, তাহা হইলে সেই তরঙ্গের উপরিভাগে যত বস্তু থাকে, তাহা তরঙ্গের শক্তিতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে আসিয়া পর্ব্বতাকার হয় এবং পরে অভ্যন্তরস্থ অগ্নিময় তরল পদার্থ সকল সেই পর্ব্বত নির্ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে থাকে। যে স্থান বিদীর্ণ করিয়া সেই সমুদায় উত্থিত হয় সেই স্থানে একটি গহ্বর হইয়া যায়। এইরূপে আগ্নেয়-গিরির উৎপত্তি হয়।

পর্ব্বতাগ্নির হেতু

পনর শত আটত্রিশ খৃষ্টাব্দে ইটালির অন্তঃপাতী নেপল্‌স্ নগরের নিকটে এইরূপ একটি অভিনব আগ্নেয়গিরি উৎপন্ন হয়; তাহার নাম

নবগিরি। উক্ত বৎসর সাতাশে ও আটাশে সেপ্টেম্বরে তথায় কুড়ি ঘণ্টার মধ্যে অন্যূন কুড়ি বার ভূমিকম্প হইল। পর দিবস সূর্য্যাস্তের দুই ঘণ্টা পরে, এক বৃহৎ গহ্বর উৎপন্ন হইয়া প্রস্তর, ধাতুনিঃস্রব, জল-সংবলিত ভস্ম ও অগ্নি-শিখা নির্গত হইতে লাগিল। নেপল্‌স্ নগরে রাশি রাশি ভস্ম আসিয়া পতিত হইল, এবং পিউজোলি নামে যে নগর নিকটে ছিল, তথাকার লোক তাহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ঐ সমস্ত প্রস্তর ও ধাতু-নিঃস্রব একত্র রাশীকৃত হইয়া পর্ব্বতাকার হইল। ঐ পর্ব্বত দুই শত তিরানব্বই হাত উচ্চ এবং উহার শিখরদেশস্থ গহ্বর দুই শত আশী হাত গভীর।

নূতন আগ্নেয়গিরি

অনেকানেক আগ্নেয়-পর্ব্বত সমুদ্রের অতি নিকটে, কতকগুলি তাহা হইতে অতি দূরে, এবং কোন কোনটা সমুদ্রের গর্ভেতেই অবস্থিত আছে। যখন কোন আগ্নেয়-পর্ব্বত সমুদ্র ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎক্ষিপ্ত বস্তু সমুদায় জলের উপর পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। এইরূপে কত কত দ্বীপ ও সমুদ্রস্থিত পর্ব্বতের উৎপত্তি হইয়াছে। চীন রাজ্যের কিছু পূর্ব্বে জাপান-সাগরে গন্ধকদ্বীপ নামে এক দ্বীপ আছে, তাহা এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে। এদেশীয় লোকে কহিয়া থাকে, সমুদ্রের মধ্যে বাড়বাগ্নি নামে অগ্নি-বিশেষ বিদ্যমান আছে; এ কথা সমুদ্রস্থিত কোন আগ্নেয় গিরির অগ্নি দৃষ্টে কল্পিত হইয়া থাকিবে।

সমুদ্র গর্ভে আগ্নেয়-গিরি

ইউরোপের অন্তঃপাতী ইটালি-দেশস্থ বিসুবিয়স, সিসিলি দ্বীপস্থ এট্‌না, আইস্‌লণ্ড দ্বীপস্থ হেক্লা, আমেরিকার অন্তঃপাতী কোটাপাক্সি ইত্যাদি কতিপয় আগ্নেয়-পর্ব্বত সর্ব্বপ্রধান ও অতি প্রসিদ্ধ।

বিসুবিয়স্ পর্ব্বত বহুকাল নির্ব্বাণ ছিল; পরে উনআশী খ্রীষ্টাব্দে তাহার ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপত্তি উপস্থিত হইয়া, হর্কুলেনিয়ম্ ও পম্পিয়াই নামক দুই

বহুজনাকীর্ণ প্রধান নগর নষ্ট হইয়া যায়। তৎকালে উল্লিখিত আগ্নেয়-পর্ব্বত হইতে যে অপরিমেয় ভস্মরাশি নিঃসৃত হয়, তাহাতে ঐ দুই নগর একেবারে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। ষোল শত একত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে ঐ আগ্নেয়-গিরির একবার অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাতে উপর্য্যুপরি সাত বার ধাতুনিঃস্রব নির্গত হইয়া, নিকটস্থ অনেকানেক গ্রাম প্লাবিত হয় এবং তৎপ্রদেশে রেশিনা নামে যে এক নগর ছিল, তাহা একেবারে দগ্ধ হইয়া যায়। দীর্ঘকাল পরে আঠার শত পঁচাত্তর খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পুনরায় উহার অগ্ন্যুৎপাত হইবার উপক্রম হয়। প্রথমে ভূমিকম্প হইয়া, পরে শিখর দেশস্থ গহ্বরে কতকগুলি ধাতুনিঃস্রব উত্থিত হয়; কিন্তু তাহা নির্গত হয় নাই। এই অবধি শেষ হইয়া যায়।

বিসুবিয়স্ আগ্নেয়-গিরি

এট্‌না নামে আগ্নেয়-গিরিও অতিশয় ভয়ানক; ষোল শত উনসত্তর খ্রীষ্টাব্দে তাহা হইতে ভূরি ভূরি ধাতুনিঃস্রব প্রচণ্ড-বেগে নির্গত হইয়া, দৈর্ঘ্যে সাত ক্রোশ ও প্রস্থে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান একেবারে প্লাবিত করিয়াছিল। তাহাতে উত্তমোত্তম অট্টালিকা-সংবলিত পাঁচ সহস্র উদ্যান এবং নানা প্রকার নিবাস-বাটী ও কেটেনিয়া নামক নগরের কিয়দংশ ধাতু-নিঃস্রবে একেবারে প্রোথিত হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত বিসুবিয়স্ গিরি হইতে যে সকল ধাতু-নিঃস্রব নির্গত হয়, তাহার প্রবাহ তিন-চারি-ক্রোশের অধিক দীর্ঘ হয় না; কিন্তু এট্‌না গিরির ধাতু-নিঃস্রব প্রবাহ কখন সাত, কখন কখন দশ এবং কোন কোন বার পনর ক্রোশ পর্য্যন্ত যাইতে দেখা গিয়াছে।

এট্‌না

হেক্লা নামক আগ্নেয়-গিরির উৎপাতে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমুদায় একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। সতর শত তিরনব্বই খৃষ্টাব্দে তাহার প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইয়া, চতুর্দ্দিকে পঞ্চাশ ক্রোশাপেক্ষাও অধিক

দূর পর্য্যন্ত ভস্মরাশি পতিত হয়; তাহাতে সে প্রদেশের অসম্ভব অপচয় হইয়াছিল। সংপ্রতি আঠার শত পঁচাত্তর খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তাহার আর একবার অগ্ন্যুৎপাতের সূত্র হয়। কয়েকবার ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং তাহার দক্ষিণ দিকের গহ্বর হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া, অনেকদূর পর্য্যন্ত দীপ্তিমান্ করিয়াছিল।

হেক্লা

আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত যে কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহা না দেখিলে অনুভব করা যায় না। প্রভূত ধূম ও ভস্মরাশি নিঃসৃত হইয়া, আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন ও তিমিরাবৃত করে। প্রকাণ্ড অগ্নিময় প্রস্তর খণ্ড-সকল প্রচণ্ড-বেগে যুগপৎ উৎক্ষিপ্ত হইয়া দুই তিন সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়; দশ পনর ক্রোশ দীর্ঘ দ্রবময় ধাতু প্রবাহিত হইয়া মনুষ্য, পশু, পতঙ্গ প্রভৃতি সমুদায় জীব সংবলিত চতুষ্পার্শ্বর্ত্তী গ্রাম, নগর, বন, উপবন ও শস্যক্ষেত্র সকল একেবারে আবৃত করিয়া ফেলে, এবং বজ্রধ্বনি-তুল্য ঘোরতর গম্ভীর নাদ শত শত ক্রোশ হইতে মুহুর্মুহুঃ শ্রুত হইতে থাকে। একব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়া এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, —"একেবারে পাঁচ লক্ষ হাউই দুই তিন সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়া, রক্তবর্ণ গোলা ও বৃহৎ অগ্নিময় প্রস্তরের ন্যায় পতিত হইলে যেমন দেখায়, সেইরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘণ্টায় এক হাজার দুই শত বার করিয়া ঘটিতে লাগিল।" আর তিনি ধাতু-নিঃস্রব ও তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যাপার দেখিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন,—"এই সমুদায় অগ্নিময়ী নদী স্থানে স্থানে ঘোরতর অন্ধকার, কোন কোন স্থানে অত্যল্প আলোক দ্বারা নানাবিধ অবাস্তবিক আকৃতি প্রকাশ, অতিশয় ভীষণ শব্দ ও প্রচণ্ডবেগে বস্তু বিনির্গমন, এই সমস্ত ব্যাপার আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। এই সকল ভয়ঙ্কর কাণ্ড আমার এ প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে চিত্তভূমি হইতে কোনক্রমে অপনীত হইবার নয়।"

অগ্ন্যুৎপাত ভয়ঙ্কর কাণ্ড

[প্রাণি-কথা]

জীব-বিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড-পতির অত্যাশ্চর্য্য সুচারু কৌশল প্রদর্শন করিতেছে। সকল পদার্থই তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান ও অচিন্তনীয় শক্তি প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার অপার করুণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। জীবের শরীর অতি আশ্চর্য্য শিল্প-কার্য্য। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ পরাৎপর পরম শিল্পকরের নিরুপম নৈপুণ্য-পক্ষে নিরন্তর সাক্ষ্যদান করিতেছে। বিশেষতঃ যখন দেখা যায়, তিনি স্থল-বিশেষে আপনার অবলম্বিত পদ্ধতির অন্যথা করিয়াও কোন বিষয়ে কোন জীবের অপ্রতুল পরিহার করিতেছেন, তখন তিনি আমাদের মানস-মন্দিরে স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হইয়া উঠেন। এস্থলে তাঁহার উল্লিখিতরূপ অনির্ব্বচনীয় কৌশলের কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিয়া, একবার চমৎকার সংবলিত ভক্তি-রসামৃতে অভিষিক্ত হউন।

ঈশ্বরে অপূর্ব্ব কৌশলের নিদর্শন

বিশ্বপতির শক্তি বিচিত্র ; সুতরাং তাঁহার কার্য্যও বিচিত্র। কিন্তু তিনি কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি-ব্যতিরেকে কাহাকেও কোন বিশেষ শক্তি ও বিশেষ অঙ্গ প্রদান করেন নাই। সমুদায় প্রাণীই এই পরমার্থ কথার প্রমাণ স্থল। হস্তী যেমন প্রকাণ্ড-কায়, জগদীশ্বর তাহার গ্রীবাদেশ তদনুরূপ দীর্ঘ করেন নাই ; কারণ উহা অত্যন্ত দীর্ঘ হইলে, মস্তকের ভারে অবনত হইয়া পড়িত। কিন্তু এতাদৃশ উন্নত জন্তুর

জীবসৃজনে অসাধারণ কৌশল —হস্তী

গ্রীবা-দেশ আবশ্যকমত দীর্ঘ না হইলে, তাহার পানভোজন সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন হয়। গ্রীবা-দেশ খর্ব্ব হওয়াতে হস্তিগণ গো-মহিষাদির ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া, জলপান ও তৃণপত্রাদি ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। করুণাময় পরমেশ্বর এই সমুদায় আলোচনা করিয়া, তাহাকে একটি সুদীর্ঘ হস্ত অর্থাৎ শুণ্ড প্রদান করিয়াছেন। আহা! পরম শিল্পকুশল বিশ্ব-নির্ম্মাতা তাহার ঐ কর-নির্ম্মাণে যে পর্য্যন্ত পটুতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইয়া, তাঁহার গুণানুচিন্তনে অনুরক্ত হয়। উহার শিরা, অস্থি ও মাংস-পেশী যেরূপ বিন্যস্ত হইলে, উহাকে ইচ্ছানুসারে সঙ্কোচন ও প্রসারণ করিয়া প্রয়োজন মতে সকল দিকেই সঞ্চালন করা যায়; উহা দ্বারা জলাশয় হইতে জল আকর্ষণ ও বৃক্ষ হইতে শাখা পল্লবাদি ভঞ্জন করা যায় এবং সকল প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য অনায়াসে গ্রহণ ও উত্তোলন করা যায়, জগদীশ্বর তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। বিশেষতঃ উহার অগ্রভাগের এরূপ সুন্দর গঠন করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা এক একটি তৃণ পর্য্যন্ত গৃহীত হইতে পারে। আমাদের হস্তের অঙ্গুলি এবং হস্তীর শুণ্ডের অগ্রভাগ উভয়ই তুল্যরূপ উপকারী। উভয়েরই দ্বারা এক প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব হস্তীর হস্ত যে সুনিপুণ শিল্প-করের কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার এই অঙ্গটি অনন্য-সাধারণ অর্থাৎ অন্য অন্য পশু এরূপ সুদীর্ঘ শুণ্ড প্রাপ্ত হয় নাই। সে সকল পশুর উহাতে প্রয়োজন নাই বলিয়াই পরমেশ্বর তাহাদিগকে উহা প্রদান করেন নাই তিনি অসাধারণ স্থলেই অসাধারণ কৌশল প্রকাশ করিয়া মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।

চর্ম্মচটিকার জঙ্ঘা ও পদ অত্যন্ত অপটু; এ নিমিত্ত তাহারা ভূতলে ধাবমান হইতে পারে না, এবং উপবিষ্ট হইলে, উত্থিত হইতেও সমর্থ হয় না। তাহাদের এই স্বভাব-সিদ্ধ দোষ পরিহারের অন্য প্রকার উপায় না থাকিলে,

তাহাদের তুল্য ভাগ্যহীন জীব পৃথিবীতে আর দৃষ্ট হওয়াও সুকঠিন হইত। তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে হিংস্র পশুর গ্রাস-মধ্যে পতিত হইয়া, মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। কিন্তু বিশ্ব-পিতা পরমেশ্বর ইহার সুন্দর প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাহাদের পক্ষযুগের এক এক কোণে লৌহময় বড়িশবৎ এক একটি বক্র নখ প্রদান করিয়াছেন। তাহারা পর্ব্বত-গহ্বর ও গৃহ প্রভৃতির রন্ধ্রাদির মধ্যে সেই নখ নিবেশিত করিয়া লম্বমান থাকে, এবং আবশ্যক মতে তাহা উন্মোচন করিয়া, স্থানান্তরে প্রস্থান করে। জগদীশ্বর অন্য কোন বিহঙ্গমজাতির পতত্রে এতাদৃশ বক্র নখর নির্ম্মাণ করিয়া দেন নাই; চর্ম্মচটিকার জীবন-রক্ষার্থ ইহা আবশ্যক বলিয়াই তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি একটি পরমাণুও কোন স্থানে নিরর্থক স্থাপন করেন নাই। তাঁহার সমস্ত অদ্ভুত কৌশল প্রতীতি করা কত আনন্দের বিষয়!

—চর্ম্মচটিকা।

ঊর্ণনাভের জালও উল্লিখিতরূপ মনোহর কৌশলের এক সুন্দর উদাহরণ-স্থল। তাহারা মক্ষিকা ভোজন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে; কিন্তু তাহাদের উড্ডীয়মান হইয়া মক্ষিকাগণকে আক্রমণ ও হনন করিবার সামর্থ্য নাই। তাহাদের ভক্ষ্যগ্রহণের উপায়ান্তর না থাকিলে, জীবন রক্ষা করা, কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না; এই বিবেচনায় বিশ্ব-পালক পরমেশ্বর তাহাদিগকে জাল প্রস্তুত করিবার শক্তি দিয়াছেন। তাহারা ধীবরদিগের ন্যায় জাল বিস্তৃত করিয়া অবস্থিতি করে এবং মক্ষিকাগণ যেমন আসিয়া পতিত হয়, তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে।

ঊর্ণনাভ

বহুরূপ-নামক প্রাণীর বর্ণ পরিবর্ত্তনের বিষয় অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। যিনি সমুদ্র-তটস্থ বালুকা-বিন্দু ও দূর্ব্বাদলস্থ শিশির বিন্দু পর্য্যন্ত কোন বস্তু নিষ্প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নাই, তিনি যে এই অদ্ভুত

জন্তুকে এই অদ্ভুত শক্তি নিরর্থক দিয়াছেন, অথবা কেবল মনুষ্যের কৌতুক সম্পাদনার্থ প্রদান করিয়াছেন, ইহা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। তাহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

—বহুরূপ

মক্ষিকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ বহুরূপের স্বভাব সিদ্ধ খাদ্য। উহা বৃক্ষ ও গুল্মে আরোহণ ও রসনা প্রসারণ করিয়া, তাহাদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু উহার গতি অত্যন্ত মৃদু। পতঙ্গগণ উহাকে নিকটে দেখিলে, অবলীলাক্রমে পলায়ন করিতে পারে। বিশেষতঃ পতঙ্গের দৃষ্টি-শক্তি বিলক্ষণ তেজস্বিনী; কোন হিংস্র জীব নিকটস্থ হইলে, তাহারা অনায়াসে দেখিতে পায়। অতএব কোন প্রকার ছদ্মবেশ-গ্রহণ-ব্যতিরেকে, বহুরূপের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া কোন মতেই সম্ভবে না; এই নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপুরুষ তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে রূপ-পরিবর্ত্তনের শক্তি প্রদান করিয়া, অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। বহুরূপ যখন হরিদ্বর্ণ বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া গমন করে, তখন হরিদ্রূপ গ্রহণ করে, এবং যখন পীত ও লোহিতবর্ণ পত্র বা পল্লবের নিকট দিয়া গমন করে, তখন পীত ও লোহিতবর্ণ ধারণ করে। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পত্রপুঞ্জের কেবল বর্ণ ধারণ করিয়া নিস্তার পায় না; তদীয় আকারেরও অনুকরণ করে। কি আশ্চর্য্য শক্তি! কি অনুপম গুণ! কি অপূর্ব্ব লীলা! কি অদ্ভুত কৌশল!

প্রাকৃতিক-ইতিবৃত্ত-বিৎ পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, স্থলচর ও জলচরের চক্ষুর গঠন-বিষয়ে পরস্পর অনেক বিভিন্নতা আছে। স্থলচরেরা কেবল স্থলের উপরিস্থিত বস্তু দেখিতে পায়, জলচরেরা কেবল জলাশয়ের অভ্যন্তরস্থ সামগ্রী দৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার মৎস্য আছে তাহার চক্ষুর উপরিভাগ স্থলচরের এবং অধোভাগ জলচরের চক্ষুর তুল্য। জগদীশ্বর কি অভিপ্রায়ে

সাধারণ পদ্ধতির অন্যথাচরণ—মৎস্য

এ স্থলে সাধারণ পদ্ধতির অন্যথাচরণ করিলেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত কাহার কৌতূহলশিখা উদ্দীপ্ত না হইয়া উঠে? এবং পণ্ডিতেরা এ বিষয়ের যে নিগূঢ় অভিসন্ধি অবধারণ করিয়াছেন, তাহা শ্রুতি-গোচর হইলে, কাহারই বা বিস্ময় ও আনন্দোদয় না হইয়া থাকে? উল্লিখিত অসাধারণ মৎস্য যেরূপে সন্তরণ দেয়, তাহাতে তাহার চক্ষুর ঊর্দ্ধভাগ জলের উপর উত্থিত ও অধোভাগ তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকে। অতএব তাহাদিগের চক্ষুর গঠন একরূপ হইলে, তাহাদিগের দৃষ্টিক্রিয়া কদাচ সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না, এই বিবেচনায়, করুণাময় পরমেশ্বর তাহাদের নেত্র দ্বয়ের গঠন প্রণালী উভয়-রীতি সম্পন্ন করিয়া অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি সচেতন জীবে অচেতন উদ্ভিদের গুণ সংস্থাপন করিয়া, পুরুভুজের প্রকৃতি উৎপাদন করিয়াছেন, তিনি উভয় জীবের স্বভাব একত্র মিলিত করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

জগদীশ্বর জীব-সাধারণকে দুই চক্ষু প্রদান করিয়াছেন! কিন্তু কোন কোন পতঙ্গের বহু নেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? জ্ঞান-সিন্ধু স্বরূপ দীনবন্ধু কি মঙ্গলময় অভিপ্রায়ে সাধারণ পদ্ধতির এইরূপ অন্যথাচরণ করিলেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাঁহার কৃপা-ভাজন জ্ঞানিগণ ইহার সিদ্ধান্ত করিয়া, আমাদিগকে অবগত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পতঙ্গ-সমুদায়ের নেত্র নিতান্ত নিশ্চল। তাহাদের চক্ষুর তারা এক স্থানেই স্থির হইয়া থাকে। আমরা যেমন ইচ্ছানুসারে সকলদিকেই চক্ষুর চালনা করিতে পারি, তাহারা সেরূপ পারে না। অতএব এরূপ দুই চক্ষু দ্বারা তাহাদের ভক্ষ্য অন্বেষণ ও শত্রুগণের গমনাগমন নিরীক্ষণ করা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, ইহা বিবেচনা করিয়া, পরম বিজ্ঞানবিৎ পরমেশ্বর তাহা-দিগকে বহু নেত্র প্রদান করিয়াছেন, এবং তৎসমুদায়কে তাহাদের শরীরের

—পতঙ্গ, উর্ণনাভ

যে যে স্থানে স্থাপিত করিলে, সর্ব্বাধিক কল্যাণসাধন ও শোভা-সম্পাদন হয়, তাহাই করিয়াছেন। তিনি উল্লিখিত অভিপ্রায়ে ঊর্ণনাভকে অষ্টচক্ষু প্রদান করিয়াছেন। তাহার মস্তকের উপরিভাগে দুই, সম্মুখভাগে দুই, এবং এক এক পার্শ্বে দুই দুই নেত্র সন্নিবেশিত আছে। এই সমস্ত নেত্র নিতান্ত নিশ্চল হইলেও, প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হওয়াতে, ঊর্ণনাভ স্বকীয় জীবন রক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন সাধনের উপযোগী সমুদায় বিষয়ই দৃষ্টি করিতে পারে। তাহার নেত্র নিশ্চল হওয়াতে, যত প্রকার অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল, বিশ্ব-বিধাতা এইরূপ বিধান দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিয়াছেন। আমরা যে আমাদের স্রষ্টা ও পাতার এই সমস্ত অতি প্রগাঢ় নিগূঢ় অভিপ্রায়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতেছি, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য ও অতুল আনন্দের বিষয়।

কিন্তু তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদায় পতঙ্গেরই নেত্রদোষ যে এই এক প্রকারে নিবারণ করিয়াছেন, এমত নয়। তিনি এরূপ কল্যাণ অশেষরূপ উপায় দ্বারা সম্পাদন করিতে পারেন। তিনি কতকগুলি পতঙ্গের চক্ষুর তারা গোলাকৃতি না করিয়া, বহু-পার্শ্ব-বিশিষ্ট কাচসদৃশ করিয়া আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার এক এক পার্শ্ব এক একখানি কাচ-স্বরূপ; সুতরাং তাহার যে পার্শ্বে যে যে বস্তুর আভা পতিত হয়, সে বস্তু সেই পার্শ্ব দ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের চক্ষুর তারা নিতান্ত নিশ্চল হইলেও তাহার দৃষ্টি-ক্ষেত্র অন্য অন্য প্রাণীর তুল্য বহু বিস্তৃত হইয়া থাকে। এডাম্‌স্‌-নামক পণ্ডিত নিরূপণ করিয়া লিখিয়াছেন, একটি মধুমক্ষিকার চক্ষে এইরূপ চৌদ্দশত খণ্ড কাচ দৃষ্ট হইয়াছে। উল্লিখিত পতঙ্গের চক্ষুর তারার ঐ সমস্ত কাচবৎ ভাগ কিরূপ সূক্ষ্ম ও সুপরিপাটীসম্পন্ন, ও পরম শিল্প-কুশল বিশ্ব-নির্ম্মাতার কত কৌশল ও যত্নের বিষয়, তাহা

পতঙ্গ চক্ষুর প্রকার ভেদ

পাঠকবর্গ একবার চিন্তা করুন এবং চিন্তা করত বার বার তাঁহার ধন্যবাদ করিয়া, পরম পবিত্র প্রেমানন্দ-নীরে নিমগ্ন হউন।

যদি প্রস্তুত বিষয়ে চক্ষুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল, তবে এস্থলে জগদীশ্বরের আর একটি অসাধারণ কৌশলের উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

একপার্শ্বে উভয় চক্ষু

সমুদায় দ্বি-নেত্র প্রাণীরই দুই পার্শ্বে দুই নেত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বংশক প্রভৃতি কয়েক প্রকার মৎস্যের উভয় নেত্রই এক পার্শ্বে থাকে, অপর পার্শ্বে একটিও চক্ষু থাকে না। এরূপ অসামান্য ব্যবস্থা কি বিশ্ব-স্রষ্টার ভ্রান্তি-মূলক? না, কোন বিশেষ প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে এইরূপ ব্যবস্থিত হইয়াছে? অভ্রান্তস্বরূপের কার্য্যে যে ভ্রান্তি সম্ভব, এ কথা মুখাগ্রে আনয়ন করা অকর্ত্তব্য। তিনি এ বিষয়ে আশ্চর্য্য যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ঐ সমুদায় মৎস্য জলাশয়ের অধোভাগে পঙ্কের উপর এ প্রকার এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহে যে, তাহাদের ঐ পার্শ্ব সর্ব্বতোভাবে পঙ্কেতেই পরিলিপ্ত থাকে। সেই পার্শ্বে চক্ষু থাকিলে, তাহা কোন প্রকারে কার্য্যকর না হইয়া, কেবল ক্লেশ-কর হইবে, অথবা পঙ্কেতে অন্ধীভূত হইয়া যাইবে, এই বিবেচনায়, ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ তাহার একটি চক্ষুও সে পার্শ্বে স্থাপন না করিয়া, অপর পার্শ্বে উভয় নেত্রই স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যেক নেত্র নেত্র-নির্ম্মাতার কতই কৌশল প্রদর্শন করিতেছে, এ স্থলে তিনি আবার কৌশলের উপর কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন।

বক ও তাদৃশ কতকগুলি পক্ষী মৎস্যাদি জলজন্তু ভক্ষণ করিয়া, প্রাণ ধারণ করে; কিন্তু হংসাদির ন্যায় তাহাদের পদাঙ্গুলি-সমুদায় চর্ম্মদ্বারা লিপ্ত না থাকাতে, তাহারা সন্তরণ করিতে সমর্থ হয় না; ইহাতে তাহাদের ভক্ষ্যের সহিত শারীরিক প্রকৃতির কিছুমাত্র সামঞ্জস্য থাকে না। কিন্তু ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন করা সামঞ্জস্য-সম্পাদক পরমেশ্বরের পক্ষে কতক্ষণের

কর্ম্ম ? তিনি বকজাতির জঙ্ঘাদ্বয় কিঞ্চিৎ দীর্ঘ করিয়া, একেবারেই এ বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা তীর-সন্নিহিত অগভীর-জলে পদচারণ করিয়া, মৎস্যদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করে। তাহারা অপরাপর জলচর পক্ষীর ন্যায় জলাশয়ে সন্তরণ করিতে সমর্থ না হউক না কেন, তাহাদের স্রষ্টা ও পাতা অতীব সহজ কৌশলে তাহাদিগের জীবনযাত্রানির্ব্বাহের সুন্দর উপায় অবধারণ করিয়া দিয়াছেন।

বকাদি মৎস্য জীবী পক্ষী

উষ্ট্রের কোন কোন অঙ্গ ও কোন কোন গুণ অতি অসাধারণ। তাহাদের খুর সমধিক প্রসারিত, তাহাদের পাক-স্থলীর একাংশে জল রাখিবার স্থান আছে, এবং স্থান-বিশেষে জলাশয় বিদ্যমান আছে কি না, তাহারা দেড় ক্রোশ অন্তর হইতে, তাহা জানিতে পারে। গো, অশ্ব মেষাদি অন্য অন্য পশুর এ সকল বিষয় এ প্রকার নয়। কিন্তু জগদীশ্বর যে অভিপ্রায়ে ঐ অসাধারণ পশুকে উল্লিখিত-রূপ অসাধারণ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিচার করিয়া দেখিলে, চমৎকৃত ও প্রীতিপূর্ণ হইয়া, কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইতে হয়। উষ্ট্র আরবদেশের প্রধান ভারবাহী পশু। তাহাদিগকে সতত যে বালুকাময় মরুভূমি পর্য্যটন করিতে হয়, তাহা প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে অগ্নিবৎ হইয়া থাকে। তথাকার বায়ু নিতান্ত নীরস ও উত্তপ্ত; তথায় জলাশয় নাই, লোকালয় নাই, বন ও উপবন নাই। চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া একটিও জীব-জন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। পথিকগণ যোজন যোজন পথ পর্য্যটন করিয়াও কোথাও বৃক্ষচ্ছায়া,—এমন কি তৃণ-মুষ্টিও দেখিতে পায় না। ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া, নিরন্তর হাহাকার করিতেছে। কালরূপী মৃত্যু যেন তাহাদিগকে সহায় করিয়া, জীবসংহারার্থ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। এইরূপ দুর্গম স্থানে উষ্ট্রদিগকে বণিক্‌দিগের পণ্যসামগ্রী পৃষ্ঠোপরি গ্রহণ

উষ্ট্রের গঠন কৌশল

করিয়া, নিরন্তর ভ্রমণ করিতে হইবে, এই বিবেচনায় জগদীশ্বর ঐ সকল অমূল্য পশুকে তদুপযোগী প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাহাদিগকে সর্ব্বদাই বালুকা-ভূমি পর্য্যটন করিতে হয়; অতএব শ্লথ বালুকা-মধ্যে বারংবার পদ প্রবিষ্ট হইয়া, গমনের ব্যাঘাত না জন্মায়, এই নিমিত্ত, তাহাদিগকে প্রশস্ত খুর প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের উদরে জল রাখিবার এক স্থান করিয়া দিয়াছেন; তাহারা তথায় বারি সঞ্চয় করিয়া ক্রমাগত বহু দিবস নির্জ্জন দেশে ভ্রমণ করে ও প্রয়োজন মতে সেই জল উদ্গীর্ণ করিয়া, পিপাসা শান্তি করে ও শুষ্ক অন্ন সিক্ত করে। মরুভূমির মধ্যে সর্ব্বস্থানে জল প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর; অতএব, তাহাদিগকে এরূপ অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি দিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা তাহারা দেড় ক্রোশ থাকিতে জলাশয়ের উপলব্ধি করিয়া, তদভিমুখে ধাবমান হয়। তাহাদের পৃষ্ঠোপরি যে স্থূলকায় ককুদ্ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল মেদরাশিতে পরিপূর্ণ। পথের মধে একাদিক্রমে অনেক দিবস আহার-সামগ্রী না মিলিলে, ঐ মেদ শোণিতের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া, তাহাদিগের জীবন রক্ষা করে। আহা! পরম করুণাময় জগদীশ্বরের কি মহিমা। ঐ সমস্ত বহূপকারী পশুকে অনেক বিষয়ে অসামান্য কার্য্য করিতে হয় বলিয়াই, তিনি তাহাদিগকে উল্লিখিত-রূপ অসামান্য প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি তত্তৎপ্রদেশের বাণিজ্য-ব্যবসায় অপেক্ষাকৃত সুগম করিয়া, সংসারের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

মানব! তুমি এমন কত উদাহরণ প্রদর্শন করিবে? অনন্ত কালেও তাঁহার সমুদায় শুভাবহ কৌশল গণিত ও বর্ণিত হইবার নয়। যেমন সুধাময় পূর্ণচন্দ্রের মনোহর জ্যোতিঃ সুবিস্তৃত সিন্ধু-সলিলে ও তদীয় তটে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া, পরম রমণীয় শোভা প্রকাশ করে, সেইরূপ আমাদের করুণাময় পরম পিতার মহিমাচন্দ্রমার অনুপম অমৃতরস এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে পরিলিপ্ত হইয়া তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কীর্ত্তি অহর্নিশ প্রকাশ করিতেছে।

বিহঙ্গম

জগদীশ্বর পক্ষিগণের শরীর-নির্ম্মাণ-বিষয়ে যেরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপমা দিবার স্থল নাই। তাহাদের যে অঙ্গের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তাহাতেই তাঁহার নিরুপম নৈপুণ্য প্রতীয়মান হয়। তাহাদিগকে সতত বায়ু-সাগরে সন্তরণ করিতে হয়, এ নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহা-দিগের শরীর একখানি উৎকৃষ্ট তরণি-স্বরূপ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষ দণ্ড-স্বরূপ, পুচ্ছ কর্ণ-স্বরূপ এবং বক্ষঃস্থল নৌকার পুরোভাগ-রূপ। শরীর ভারি হইলে, তাহারা আকাশ-পথে উড্ডীয়মান হইতে অসমর্থ হইবে, এই বিবেচনায়, তিনি তাহাদের অঙ্গ-সমুদায় অত্যন্ত লঘু পদার্থে প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে অক্লেশে বায়ু ভেদ করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাহাদের মস্তকের অগ্রভাগ অস্থূল ও চঞ্চুপুট সুতীক্ষ্ণ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

পক্ষিদেহের নির্ম্মাণ কৌশল

পক্ষিগণের চঞ্চু অতি আশ্চর্য্য বস্তু। যে পক্ষী যেরূপ দ্রব্য আহার করে, জগদীশ্বর তাহার চঞ্চু তদুপযোগী করিয়া দিয়াছেন। শ্যেন, শকুনি প্রভৃতি যে সকল পক্ষী অন্য প্রাণীর শরীর বিদীর্ণ করিয়া, আহার করে, ও শুক-শারিকাদি যে সমস্ত পক্ষী শস্য ভঞ্জন ও ফলাদি খণ্ডন করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাদের চঞ্চু অত্যন্ত কঠিন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হংস-রাজহংসাদি যে সমস্ত পক্ষী পঙ্কের মধ্যে আহার অন্বেষণ করে, তাহাদের চঞ্চু কোমল ও চেপ্টা এবং এ প্রকার কৌশল-সহকারে নির্ম্মিত যে, তাহার মধ্য দিয়া জল নির্গত হয়, কিন্তু সার বস্তু পতিত হয় না। মাংসাশী পক্ষীদিগের চঞ্চুর পার্শ্ব-দেশ তীক্ষ্ণ এবং অগ্রভাগ বড়িশবৎ বক্রাকার। তাহারা তদ্দ্বারা নিহত পশু-পক্ষ্যাদির

চঞ্চু

শরীর বিদারণ ও মাংসাদি উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করে; আবার বক প্রভৃতি যে সমস্ত পক্ষী জলজন্তু ধরিয়া আহার করে, তাহাদের চঞ্চু কঠিন, তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘাকার। কিন্তু তাহাদিগকে যেমন নিহত জীবের শরীর হইতে মাংস উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিতে হয় না, তেমন তাহাদের চঞ্চুও উল্লিখিত মাংস-ভোজী বিহঙ্গমদিগের চঞ্চুর ন্যায় বক্রাকার নহে। কপোতচটকাদি গ্রাম্য পক্ষীদিগের চঞ্চু ছোট, সূচল ও ঈষদ্বক্র; তদ্দ্বারা তাহারা শস্যাদি ভোজ্য বস্তু অক্লেশে তুলিয়া লইতে পারে। এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, নিশ্চয় হয়, পক্ষীদিগের মধ্যে যে জাতি যেরূপ সামগ্রী ভক্ষণ করে, পরমেশ্বর তাহার তদুপযোগী চঞ্চু নির্ম্মাণ করিয়া, নিরুপম নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কোন স্থলে এ নিয়মের কিছুমাত্র অন্যথা দেখা যায় না, যে স্থলে যেমন আবশ্যক, জগদীশ্বর সে স্থানে সেইরূপ করিয়াছেন।

তিনি যাবতীয় প্রাণীরই গ্রাসাচ্ছাদন নির্ম্মাণ-বিষয়ে অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু পক্ষীদিগের শরীরের আচ্ছাদন যেমন পরিপাটী, এমন বুঝি আর কোন জন্তুরই নয়। ইহা যেমন লঘু, তেমনি মসৃণ, আবার তদনুরূপ শীত-নিবারক ও উষ্ণতা-সাধক। উহার বর্ণ ও শোভাই বা কেমন! পর্য্যটকেরা অকস্মাৎ এক এক বন-বিহারী বিহঙ্গমের অসামান্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া, মোহিত হইয়া যান। এক একটি পালক এক এক অত্যাশ্চর্য্য অসামান্য শিল্পকার্য্য। উহার পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ পুচ্ছদেশ যেরূপ লঘু, তদনুরূপ দৃঢ়। লঘুতা ও দৃঢ়তা এই উভয় গুণের এরূপ একত্র সমাবেশ আর কোন বস্তুতে দৃষ্ট হয় না। ঐ পূর্ব্বভাগের ন্যায় অপর ভাগও অতি আশ্চর্য্য। তাহা যে পদার্থে প্রস্তুত, ভূ-মণ্ডলের অন্য কোন প্রাণীতে ও কোন বস্তুতে তাহা বিদ্যমান নাই। উহা লঘু, দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য, কোমল ও নমনীয়; অতএব ইচ্ছানুসারে সকল দিকে নত ও চালিত করা যায়; এবং স্থিতি-স্থাপক,

শরীরের আচ্ছাদন

অর্থাৎ উহাকে কোন দিকে নত অথবা চালিত করিয়া যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, পূর্ব্বে যে ভাবে ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই ভাবে অবস্থিতি করে। পালকগুলি লঘু না হইলে, পক্ষিগণ উড়িতে সমর্থ হইবে না; এই বিবেচনায়, পরমেশ্বর উহাদিগকে লঘু করিয়াছেন। উহারা দৃঢ় না হইলে, বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ভগ্ন হইয়া যাইবে; এই কারণে, উহাদিগকে দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করিয়াছেন। উহাদিগকে পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত সকল দিকে চালনা করা আবশ্যক; এই বিবেচনায়, উহাদিগকে কোমল, শিথিল, নমনীয় ও স্থিতি-স্থাপক করিয়াছেন। বিশ্বপতি বিহঙ্গমজাতির শরীরের লঘুতা ও দৃঢ়তা একত্র সংসাধনার্থ কতই যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। জগতের যে বস্তুর বিষয় উক্তরূপ বিবেচনা করা যায়, তাহাতেই তাঁহার অদ্ভুত কৌশল ও প্রগাঢ় যত্নের লক্ষণ প্রতীয়মান হয়। অপরিচ্ছিন্ন অসীম বিশ্বের কণামাত্রও তাঁহার অযত্নের বিষয় নয়।

প্রবাল

আমরা সচরাচর যে প্রবাল অর্থাৎ পলা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা প্রবাল নামক একরূপ প্রাণীর পঞ্জর। উহাদের স্বভাব ও সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উহাদিগকে সহসা দেখিলে, অকিঞ্চিৎকর যৎসামান্য কীট বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহারা যে সমস্ত প্রশস্ত দ্বীপ উৎপাদন করে, তাহা অবলোকন করিলে, অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়।

প্রবাল

প্রবাল-কীট অনেক প্রকার; তন্মধ্যে কোন কোন প্রকারের আকার দেখিতে উদ্ভিদের ন্যায়। বাস্তবিক, পূর্ব্বে প্রবাল এক প্রকার উদ্ভিদ্ বলিয়াই লোকের বোধ ছিল; এ নিমিত্ত সংস্কৃত গ্রন্থে উহা লতা, মণি

ও রত্ন-বৃক্ষ বলিয়া লিখিত আছে। কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর হইল, মার্সেলিস্‌নগরবাসী পেরেনেল্ নামক ইউরোপীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তিনি সতর শত কুড়ি খ্রীষ্টাব্দে এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং অনবরত ত্রিশ বৎসর বিবিধ প্রকার পরীক্ষা করিয়া অবধারণ করেন,—পলা একপ্রকার প্রাণী; কদাচ উদ্ভিদ নয়। ইহারা সমুদ্রে বাস করে। ইহাদের শরীর হইতে দুগ্ধের ন্যায় একপ্রকার শ্বেতবর্ণ রস নির্গত হয়; সেই রসের এরূপ আশ্চর্য্য গুণ যে, তাহা নির্গত হইয়া অমনি কঠিন হইয়া থাকে। শম্বুকের শরীর যেমন কঠিন আবরণে আবৃত থাকে, উল্লিখিত রস কঠিন হইয়া, প্রবাল-কীটদিগের সেইরূপ গাত্রাচ্ছাদন হইয়া থাকে। সেই আচ্ছাদনকে উহাদের বাসগৃহ বলিলেও বলা যায়। কিরূপে যে উহাদের গাত্র হইতে ঐ অপূর্ব্ব রসের উৎপত্তি হয়, তাহা কেহ অদ্যাপি নিরূপণ করিতে পারেন নাই এবং এ কাল পর্য্যন্ত কেহ কোন প্রকার দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া উল্লিখিত রস উৎপাদন করিতে সমর্থ হন নাই। সেই রস কঠিন হইয়া, এরূপ স্থিরীভূত ও দৃঢ়ীভূত হয় যে, সমুদ্রের প্রবল প্রবাহ ও ভীষণ তরঙ্গও তাহাকে কম্পিত ও বিচলিত করিতে পারে না। তাহা ক্রমে ক্রমে রাশীকৃত হইয়া, প্রকাণ্ড দ্বীপ হইয়া উঠে।

প্রবাল উদ্ভিদ নহে কীট

প্রায় সমুদায় প্রধান সমুদ্রই প্রবাল-কীটের জন্মস্থান; বিশেষতঃ ইউ-রোপের দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী ভূ-মধ্য সমুদ্রে যে সমস্ত মনোহর প্রবাল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার আকার ও বর্ণ অতি সুন্দর। কিন্তু স্থির-সমুদ্রেই প্রবাল-কীটের প্রধান প্রধান কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় এক এক স্থানে অনেক প্রবাল-দ্বীপ, প্রবাল-শৈল ও প্রবাল-স্তম্ভ একত্র বিদ্যমান থাকাতে, সে স্থান প্রবাল-সমুদ্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ প্রবাল

প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবালের প্রাচুর্য্য

সমুদ্রস্থ মৈত্র দ্বীপ, নাবিক দ্বীপ, সামাজিক দ্বীপ প্রভৃতি অনেক দ্বীপ প্রবাল-কীট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। সেই সমস্ত প্রবাল দ্বীপে বিস্তর লোকের বসতি আছে এবং তাহাতে প্রচুরপরিমাণ ফল, মূল ও শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রবাল-দ্বীপের গঠন-ক্রিয়া

বহুসংখ্যক শৈল স্থির-সমুদ্রে মগ্ন আছে; ভূরি ভূরি প্রবাল কীট তাহার উপর একত্র লিপ্ত হইয়া থাকে। তথায় তাহাদের শরীর হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত দুগ্ধবৎ শুক্লবর্ণ রস নির্গত হয় এবং সেই রস কঠিন হইয়া, তাহাদের গাত্রাবরণ হয়। তাহারা প্রাণত্যাগ করিলে, তৎসমুদায় একত্র মিলিত হইয়া প্রস্তরবৎ দৃঢ়ীভূত হয়; তৎপরে আবার অন্য অন্য জীবিতবান্ প্রবাল-কীট তাহার উপর অবস্থিত হইয়া উল্লিখিত গাত্রাবরণ সমুৎপাদন করে। এ প্রকার অসংখ্য প্রবাল-কীটের শরীর একত্র রাশীকৃত হইয়া প্রবাল-দ্বীপ প্রস্তুত হইতে থাকে। এইরূপে নির্ম্মাণ করিয়া তুলিতে তুলিতে, যখন তাহা এত উচ্চ হইয়া উঠে যে, ভাটার সময় তাহার শিরোদেশ আর জলমগ্ন থাকে না, তদবধি আর কোন প্রবাল কীট তাহার উপর আরোহণ করে না; পরে জোয়ারের সময় শঙ্খ, শম্বুক ও বালুকাদি তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। তৎসমুদায় তরঙ্গের তেজে ভগ্ন ও মিশ্রিত হইয়া, একপ্রকার প্রস্তর হইয়া উঠে; সেই শিলা-ভূমি সূর্য্য-কিরণে শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হয়; জোয়ারের সময় সেই সমুদায় খণ্ড জলের বেগে বিচলিত ও বিপর্য্যস্ত হয়; তাহার মধ্যে মধ্যে যে সকল ছিদ্র থাকে, তাহা নানাবিধ জলজন্তু ও অন্য অন্য সামুদ্রিক দ্রব্যে পূর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার উপর বালুকা পতিত হইয়া অত্যুত্তম উর্ব্বরা ভূমি উৎপন্ন হয়। তখন বহু প্রকার বৃক্ষের বীজ তরঙ্গ-সহকারে তথায় আনীত হইয়া, অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং অনতিবিলম্বেই ঐ উচ্চ ভূমিতে ছায়া প্রদান করিয়া সুশীতল করে। যে সকল বৃক্ষ-স্কন্ধ অন্য অন্য স্থান হইতে নদী-প্রবাহ দ্বারা সমুদ্রমধ্যে আনীত হয়, তাহাও কতক

উল্লিখিত অভিনব দ্বীপে উপস্থিত হয় এবং সেই সেই সঙ্গে কীট-পতঙ্গাদিও তথায় উপনীত হইয়া অবস্থিতি করে। বৃক্ষ সকল বর্দ্ধিত হইয়া জঙ্গলবৎ না হইতে হইতেই সামুদ্রিক পক্ষী সকল তাহার মধ্যে অবস্থিতি করে এবং পথভ্রান্ত স্থলচর পক্ষীরাও ক্রমে ক্রমে তথায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে; অবশেষে মনুষ্যেরা দ্বীপান্তর ও দেশান্তর হইতে, ঐ অভিনব দ্বীপে আগমন করিয়া, কুটীর নির্ম্মাণ ও ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক তাহার অধীশ্বর হইয়া বসেন। এককালে যে স্থানে গভীর সমুদ্রের গর্ভ থাকে, পরে সেই স্থান কতকগুলি ক্ষুদ্র কীটকর্ত্তৃক পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদির নিবাস-ভূমিরূপে পরিণত হইয়া বিশ্বপতির অনির্ব্বচনীয় কৌশল ও পরমাশ্চর্য্য মহিমা প্রদর্শন করিতে থাকে।

এই সকল প্রবাল-দ্বীপের আয়তন সমান নয়। কাপ্তেন রীচি বত্রিশটী প্রবাল-দ্বীপ পরিমাণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে যেটা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, তাহা

প্রবাল-দ্বীপের আয়তন

আড়ে তের ক্রোশ এবং যেটা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, তাহা অর্দ্ধ ক্রোশ অপেক্ষা ন্যূন। কোন কোন প্রবাল দ্বীপ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। মাল্‌ডেন নামক দ্বীপ সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে তিপ্পান্ন হাত উচ্চ। পেম্বিয়র নামে কতকগুলি প্রবাল-দ্বীপ একত্র অবস্থিত আছে; তাহার একটা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে আট শত বত্রিশ হাত উন্নত।

প্রবাল-দ্বীপ লবণসংযুক্ত সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হয় এবং চতুর্দ্দিকে লবণপূর্ণ সমুদ্র-জলেই পরিবেষ্টিত থাকে, অথচ কেমন আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ, উহার

প্রবাল-দ্বীপে সুস্বাদ বারি

মধ্যে তিন চারি ফুট খনন করিলেই, লবণশূন্য সুস্বাদ সলিল প্রাপ্ত হওয়া যায়। জোয়ারের জল যতদূর উত্থিত হয়, তাহার দুই হাত অন্তরে এরূপ বিশুদ্ধ বারি নিঃসৃত হইয়া থাকে। পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এ স্থলে সমুদ্রের লবণযুক্ত নীর, পলার গুণে এই প্রকার পরিশোধিত হয়।

প্রবাল কীটের এই চিত্তচমৎকারিণী মহীয়সী কীর্ত্তি পর্য্যালোচনা করিতে করিতে, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। যে সমস্ত মনুষ্য সহস্র সহস্র বৎসর পরে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিবে, ঐ ক্ষুদ্র কীটেরা এক্ষণে তাহাদের বাসগৃহ নির্ম্মাণে নিযুক্ত রহিয়াছে। উহারা নিতান্ত জ্ঞানান্ধ জীব, মনুষ্যের তুল্য বুদ্ধি-চাতুর্য্য প্রাপ্ত হয় নাই; অথচ কিরূপে এই অনির্ব্বচনীয় অভাবনীয় ব্যাপার সম্পাদন করে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। যৎসামান্য কীট হইয়া, এতাদৃশ প্রশস্ত উপদ্বীপ উৎপাদন করিতে তাহাদের কি স্বার্থ আছে? কি কারণে বা কিরূপ মন্ত্রণা করিয়া কোটি কোটি কীট একত্র মিলিত হয়? কিরূপ স্বার্থানুরোধেই বা তাহারা এই বৃহৎ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া অগাধ সমুদ্রের প্রবল প্রবাহ ও ভয়ঙ্কর তরঙ্গ অতিক্রম করে? এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত এই, তাহারা ভালমন্দ কিছুই জানে না, এ বিষয়ে আপন স্রষ্টার নিকট যে অনির্ব্বচনীয় স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া তাহারই মহিমা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ঈশ্বরের মহিমা

উল্কা-পিণ্ড

ইদানীং অনেকে মধ্যে মধ্যে অন্তরীক্ষ হইতে ধাতু-পিণ্ড-পাতের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকেন। সেই সমস্ত ধাতুপিণ্ড এই প্রস্তাবে উল্কাপিণ্ড বলিয়া লিখিত হইল। রাত্রিকালে নভোমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে যে নক্ষত্র-পাত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও বাস্তবিক উল্কাপাত, নক্ষত্র-পাত নয়। এক একটি নক্ষত্র পৃথিবী অপেক্ষাও কত লক্ষ গুণ বৃহৎ তাহা বলা যায় না। সে সমুদায় পৃথিবীর উপর পতিত হইলে, পৃথিবীর প্রলয়াবস্থা উপস্থিত হয়। উল্কাপিণ্ড পতিত বা চালিত হইবার সময়ে নক্ষত্রবৎ প্রতীয়মান হয়।

উল্কাপিণ্ড ও উল্কাপাত

১৭৭২ সতের শত বায়াত্তর শকের ষোলই অগ্রহায়ণে দিবা দ্বিপ্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে একটি উল্কাপিণ্ড পতিত হয়; তাহা কলিকাতার আসিয়াটিক সোসাইটী-নামক সমাজের চিত্র-শালায় আনীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। প্রতিবর্ষে কত স্থানে ঐরূপ কত উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়, তাহার সংখ্যা করিবার উপায় নাই। এক এক দিন লক্ষ লক্ষ উল্কা-পিণ্ড আকাশ-মণ্ডলে আবির্ভূত হইতে দেখা গিয়াছে।

বিষ্ণুপুরের উল্কাপিণ্ড

ঐ সমস্ত উল্কা-পিণ্ড পতিত হইবার সময়ে, অন্তরীক্ষে একটা সুদীর্ঘ অগ্নি-শিখা চলিয়া যায়। তৎক্ষণাৎ একটা মহাশব্দ উৎপন্ন হয়। কখন কখন এ প্রকার ভয়ঙ্কর ধ্বনি উৎপাদিত হইয়া থাকে যে, ঘর, দ্বার, প্রাচীর প্রভৃতি কম্পিত হইয়া উঠে। ইতিপূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের নিকট যে উল্কা-পিণ্ড পতিত হইবার বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহা পতিত হইবার সময়ে, কামানের শব্দের ন্যায় ভয়ানক শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। কখন কখন নির্ম্মল নভোমণ্ডলে অকস্মাৎ একখানি ঘোরতর মেঘ উপস্থিত হইয়া অতি গভীর শব্দ-পরম্পরা উৎপন্ন হয় এবং সেই সঙ্গে বহু-সংখ্যক উল্কা পিণ্ড বর্ষিত হইতে থাকে। এক এক সময়ে ঐরূপ মেঘ হইতে সহস্র সহস্র উল্কা-পিণ্ড পতিত হইতে দৃষ্টি করা গিয়াছে।

উল্কাপিণ্ডের পতন-ধ্বনি

উল্কা-পাতের সময়ে শিখা দেখা যায় ও শব্দ হইয়া থাকে; ইহা বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু নভোমণ্ডল হইতে যে স্থূলাকার উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়, ইহা সেরূপ প্রসিদ্ধ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। ইহা পতিত হইবার সময়ে উষ্ণ থাকে। ১৮৩৫ আঠার শত পঁয়-ত্রিশ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ তেরই নবেম্বর ফরাশিশ দেশে উল্কা-পাত হইয়া একটি শস্যাগার একেবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

উল্কা-পিণ্ডের দাহিকা-শক্তি

রাত্রিকালে অগ্নি-শিখার ন্যায়ই পতিত হউক, আর দিবাভাগে দীপ্তিশূন্য হইয়াই বা বর্ষিত হউক, সমুদায় উল্কা-পিণ্ড একরূপ পদার্থে পরিপূর্ণ।

যাবতীয় উল্কা-পিণ্ডের উপকরণ এক—তন্নির্দ্দেশ

লৌহ, তাম্র, টীন, গন্ধক, নিকল, কোবাল্ট, সোডা প্রভৃতি ত্রয়োদশটি পার্থিব বস্তু উল্কাপিণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যে বস্তু নাই, সে বস্তু উহাতে দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীতে খনির মধ্যে বিশুদ্ধ লৌহ ও বিশুদ্ধ নিকল ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায় না; উহাদের সহিত অন্য বস্তু মিশ্রিত থাকে, পরে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু উল্কা-পিণ্ডে যে লৌহ ও নিকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বিশুদ্ধ। তাহার সহিত অন্য কোন পদার্থ মিশ্রিত থাকে না। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, উল্কা-পিণ্ড পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় নাই, উহারা পৃথিব্যাদি গ্রহগণের ন্যায় সূর্য্য-মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করে। পৃথিবী-মণ্ডলে যে সমুদায় পদার্থ আছে, যখন উল্কা-পিণ্ডে কেবল তাহারই কোন কোন পদার্থ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, তখন গ্রহ ও উপগ্রহগণও পার্থিব পদার্থে প্রস্তুত হওয়া সম্ভব বলিয়া প্রতীত হইতে পারে।

সকল উল্কা-পিণ্ড সমানরূপ বৃহৎ নয়। ছোট বড় নানাপ্রকার দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ব্রেজিল রাজ্যের অন্তঃপাতী বেহিয়া নামক স্থানে একটা

উল্কা-পিণ্ডের বিভিন্ন আয়তন

উল্কা পিণ্ড পতিত আছে, তাহার ব্যাস ন্যূনাধিক পাঁচ হস্ত হইবে। লিখিত আছে, গ্রীসদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সক্রেটিস্ যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসর সে দেশের ইগস পোটেমস্ নামক নগরে এক বৃহৎ উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়। তাহা এত বৃহৎ যে, একখানি শকট তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বোঝাই হইতে পারে। খ্রীষ্টীয় শকের দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে নার্ণি-নামক নগরের নিকটবর্ত্তিনী নদীতে একটি উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়; উহা এত বৃহৎ যে জলের

উপর চারি ফুট জাগিয়া ছিল। মোগলজাতির মধ্যে এরূপ জন-প্রবাদ প্রচলিত আছে, চীনরাজ্যের পশ্চিমখণ্ডে হরিন্নদীর প্রস্রবণ-সন্নিধানে একটি কৃষ্ণবর্ণ উল্কা-পিণ্ডের কিয়দংশ পতিত আছে, সেই পিণ্ড সাতাইশ হস্ত উচ্চ।

উল্কা-পিণ্ড চতুর্দ্দিকে যে দাহ্য পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকে, তাহা লইয়া পরিমাণ করিলে, উহা অতি বৃহৎ বলিতে হয়। কোন কোনটার ব্যাস ৫০০ পাঁচ শত ফুট, কোন কোনটার বা ১,০০০ এক সহস্র ফুট, কোন কোনটার ব্যাস তদপেক্ষাও অধিক দেখা গিয়াছে। সার্ চার্লস ব্লাগডেন্ নামক ইউরোপীয় পণ্ডিত ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারিতে একটা উল্কা দৃষ্টি করেন, তাহার ব্যাস দুই হাজার ছয়শ ফুট হইবে।

উহার-ব্যাস

সৌর-জগতে কত কোটি উল্কা-পিণ্ড নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। মধ্যে মধ্যে একেবারে এত উল্কাপাত হয় যে, তাহা দেখিলে ও শুনিলে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিতে হয়। আরবীয় ইতিহাসবেত্তারা বর্ণন করিয়াছেন, যে রাত্রে ইব্রাহিম্ বেন্ আম্মাদ-নামক নরপতি প্রাণত্যাগ করেন, সেই রাত্রে বহুসংখ্যক নক্ষত্র পতিত হয়। ঐ নক্ষত্র-পাত অগ্নি-বৃষ্টি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা গ্রন্থ-বিশেষে মধ্যে মধ্যে যে অগ্নি-বর্ষণের প্রসঙ্গ করিয়াছেন, তাহা ঐরূপ কোন উল্কাপাত দৃষ্টে উদ্বোধিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এরূপ ইতিহাস আছে, ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে এপ্রেল ফরাসিদিগের দেশে শিলাবৃষ্টির ন্যায় নক্ষত্র-বৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপ লিখিত আছে, ১২০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে অক্টোবরের সমস্ত রাত্রি শলভ-বর্ষণের ন্যায় নক্ষত্র-বর্ষণ হইয়াছিল। ১৩৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবরে রাত্রি-শেষে একেবারে এত নক্ষত্রপাত হয় যে, কেহই তাহা গণনা করিতে সমর্থ হয় নাই।

উল্কাপিণ্ড অসংখ্য

—অগ্নি-বর্ষণ, উল্কাপাত

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বরে আমেরিকা হইতে যে অদ্ভুত উল্কা পুঞ্জের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়-জনক। ঐ দিবস রাত্রি নয় ঘণ্টা অবধি পরদিবস সূর্য্যোদয়ের পরক্ষণ পর্য্যন্ত উল্লিখিত বিস্ময়কর ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। অগ্নি-ক্রীড়ায় নক্ষত্র-রাজির ন্যায় অসংখ্য উল্কা-পিণ্ড আবির্ভূত হইয়া, চক্ষুর্গোচর সমস্ত নভঃপ্রদেশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সে সমুদায় যতক্ষণ অতিশয় অবিরল দৃষ্ট হইয়াছিল, ততক্ষণ কাহারও তাহা গণনা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। অনন্তর যখন কিছু বিরল হইয়া আসিল, তখন বোষ্টন নগরস্থ এক পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিলেন, প্রতি ঘণ্টায় চল্লিশ সহস্র উল্কা-পিণ্ড আবির্ভূত ও চলিত হইতেছে। ক্রমাগত সাত ঘণ্টা ঐরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। অতএব বলিতে হয়, দুই লক্ষ অশীতি সহস্র উল্কা-পিণ্ড ঐ রজনীতে মনুষ্যদিগের দৃষ্টি-পথে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সময় উল্কার সংখ্যা অনেক ন্যূন হইয়া আসিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে তদপেক্ষায় অধিকসংখ্যা দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব, ইহা অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, উক্ত রজনীতে সৌর জগতের অন্তর্গত তিন লক্ষ জড়ময় উল্কা-পিণ্ড আমেরিকার ঊর্দ্ধদেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বিশ্বপতির বিশ্ব-ভাণ্ডারে কত অদ্ভুত বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে, তা কে বলিতে পারে? কেবল কয়েকটি গ্রহ, চন্দ্র ও ধূমকেতু মাত্রই সৌরজগতে বিদ্যমান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। অসংখ্য উল্কা-পিণ্ড যে তাহার অন্তর্গত থাকিয়া নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের স্বপ্নেরও গোচর ছিল না।

বিস্ময়কর উল্কা-পুঞ্জের আবির্ভাব

উল্কা পিণ্ডের গতির বিষয় বিবেচনা করিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ভূমণ্ডলস্থ কোন বস্তুর তাদৃশ সত্বর গতি দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দুইটি উল্কা-পিণ্ডের বেগ নিরূপিত হয়; তন্মধ্যে একটির গতি প্রতিপলে একশ চৌষট্টি ক্রোশ, দ্বিতীয়টির বেগ প্রতিপলে একশ ঊনআশী

ক্রোশের ন্যূন ও দুইশ বাইশ ক্রোশের অধিক নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ দুইটির মধ্যে একটি ভূতলের দিকে অবতীর্ণ হইয়া, পুনরায় উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সাতাইশটি উল্কা-পিণ্ডের গতি ও পথ নিরূপিত হয়; তন্মধ্যে এক একটির বেগ প্রতিপলে তিনশ আশী ক্রোশ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট সুইজর্লণ্ড দেশে অনেকগুলি উল্কা পিণ্ড পর্য্যবেক্ষিত হয়। তাহাদের বেগ প্রতিপলে গড়ে তেইশ শ তেইশ ক্রোশ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। গ্রহগণের গতির সহিত তুলনা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, ঐ সকল উল্কা-পিণ্ড বুধ গ্রহ অপেক্ষা সাড়ে সাত গুণ এবং পৃথিবী অপেক্ষা এগার গুণ প্রবলতর বেগে পরিভ্রমণ করে। অনেকানেক ধূমকেতুও উক্তরূপ সত্বরগামী নয়।

উল্কাপিণ্ডের গতি ও পথ

ঐ সমস্ত উল্কা-পিণ্ড ভূমণ্ডল হইতে কত উর্দ্ধে উদিত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, পণ্ডিতেরা অনেক যত্ন ও অনেক আয়াস পাইয়াছেন, এবং গণনা করিয়া, কতকগুলির উৎসেধাঙ্ক নির্দ্ধারণও করিয়াছেন। এ বিষয়ে অতিমাত্র বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটার উৎসেধ তিন ক্রোশ, কোনটার বা সত্তর ক্রোশ, কোনটার এক শত চল্লিশ ক্রোশ, কোনটার বা দুইশত ত্রিশ ক্রোশ অপেক্ষাও অধিক। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সুইজর্লণ্ড দেশে যে সমস্ত উল্কা-পিণ্ড পর্য্যবেক্ষিত হয়, তাহাদের উৎসেধ ২৭৫ দুইশত পঁচাত্তর ক্রোশ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

উল্কাপিণ্ডের উদয়স্থল

কখন কখন উল্কা-পাতের সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার শিখা আবির্ভূত হইবামাত্র অমনি তিরোহিত হয়। কিন্তু কোন কোন উল্কা-পিণ্ডের শিখা সতের, পঁচিশ ও সাঁইত্রিশ পল পর্য্যন্ত প্রকাশিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। কোন রণপোতাধ্যক্ষ অর্ণব-যান আরোহণ করিয়া, ভূমণ্ডল

প্রদক্ষিণ করিতে করিতে এক স্থানে একটি উল্কা-পিণ্ড দৃষ্টি করিয়াছিলেন।

উল্কাপিণ্ডের শিখা

সেই উল্কা-পিণ্ড তিরোহিত হইবার পর তাহার শিখা এক ঘণ্টা স্থির হইয়াছিল। নভোমণ্ডলের যে অংশে পৃথিবীর ছায়া পতিত হয়, যখন সেই অংশে ঐ ছায়ার মধ্যেও উল্কার আভা দৃষ্ট হয়, তখন ঐ আলোক উহার নিজের আলোক বই আর কি বলিতে পারা যায়? গ্রহ-চন্দ্রাদি যেমন সূর্য্যের তেজঃ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তেজোময় দেখায়, উল্কা পিণ্ড সেরূপ বোধ হয় না।

উল্কা-পিণ্ড কিরূপে কোথা হইতে পতিত হয়, এই বিষয় লইয়া, পদার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। কেহ কহিতেন,—

উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তি, পতনের কাল ও হেতু

উহা বায়ুমধ্যস্থিত বস্তু-বিশেষের সংযোগে উৎপন্ন হয়। কেহ বলিতেন,—উহা আগ্নেয়-গিরি হইতে নির্গত হইয়া থাকে। কেহ বা উহা চন্দ্রলোক হইতে পতিত হয়, বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু ইদানীন্তন পণ্ডিতবর্গ উল্লিখিত অভিপ্রায়-ত্রয় নিরাকরণ করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন, গ্রহ ও ধূমকেতু সমুদায় যেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সূর্য্য-মণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, ঐ সমুদায় উল্কা-পিণ্ড সেইরূপ নিয়ম-বদ্ধ থাকিয়া, সূর্য্য-মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভূ-মণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, ভূ-তলে আসিয়া উপস্থিত হয়।

বৎসরের মধ্যে এক এক সময়ে অধিক-সংখ্যক উল্কা-পিণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, তাহারা নভোমণ্ডলের যে প্রদেশ দিয়া

উল্কাপিণ্ডের আবির্ভাবের বিশিষ্ট কাল

ভ্রমণ করে, পৃথিবীও সেই সময়ে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, পৃথিবীস্থ লোকেরা অনায়াসেই তাহাদিগকে দেখিতে পায়। ৮ই আগষ্ট অবধি ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্তই এবং ৬ই নবেম্বর অবধি ১৯শে নবেম্বর পর্য্যন্তই অধিক উল্কা দৃষ্ট হইয়া

থাকে। নবেম্বর মাসের ১২ই ও ১৩ই তারিখে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক উল্কা-পিণ্ড আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

ইদানীন্তন অনেকানেক প্রধান জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, চন্দ্র যেমন নিরূপিত সময়ের মধ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ কতক উল্কা-পিণ্ড কালক্রমে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইয়া, যথানিয়মে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফরাশিশ্ রাজ্যের অন্তঃপাতী তুলস্-নগরস্থ মান-মন্দিরের অধ্যক্ষ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, এরূপ একটি বৃহত্তর উল্কা-পিণ্ড ধরাতল হইতে দুই সহস্র দুইশত ক্রোশ ঊর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়া, আটদণ্ড কুড়ি পলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে; সুতরাং বলিতে হয়, উহা পৃথিবীকে প্রতিদিন প্রায় সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

উল্কাপিণ্ডের ভূ-প্রদক্ষিণ

১৮৬২ ও ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যে সমস্ত ধূমকেতু দৃষ্ট হয় এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের ভ্রমণ-পথের মধ্যে থাকিয়া যে সমুদায় কনিষ্ঠ গ্রহ সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, সে সমুদায় বৃহৎ বৃহৎ উল্কা-পিণ্ড বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। শনিগ্রহের বলয়ত্রয়ও ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়পিণ্ডে বিরচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

—ও সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ

তাড়িত, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত

ভূ-মণ্ডল ও তাহার উপরিস্থিত বায়ু-মণ্ডলের সর্ব্বস্থানে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহার নাম তাড়িত। এই পরমাশ্চর্য্য পদার্থ সচরাচর প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু কখন কখন কোন কোন বস্তু হইতে অতি সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ-স্বরূপে আবির্ভূত হয়। বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি এই পদার্থের কার্য্য। আর কাচ, রেশম, তৈল-স্ফটিক, গন্ধক, ধুনা প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য ঘর্ষণ করিয়া, তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প-প্রমাণ তাড়িত প্রকাশ করিতে পারা যায়।

তাড়িত

যদি কাচ অথবা লাক্ষা শুষ্ক হস্তে অথবা লোমজ বস্ত্রে ঘর্ষণ করিয়া কেশ, সূত্র, পালক, কাগজ অথবা অন্য কোন লঘু দ্রব্যের নিকট ধরা যায়, তবে ঐ লঘু দ্রব্য সেই কাচ অথবা লাক্ষা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, তাহাতে লগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু অত্যল্প কাল সংযুক্ত থাকিয়াই বিযুক্ত হইয়া পড়ে। এই উভয় ব্যাপারই ঐ তাড়িত নামক পদার্থের গুণ। যে গুণ দ্বারা লঘু বস্তু কাচ অথবা লাক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে তাড়িতাকর্ষণ বলে এবং যে গুণ দ্বারা তাহা হইতে বিযুক্ত হয়, তাহাকে তাড়িত-বিয়োজন কহে।

—গুণ আকর্ষণ ও বিয়োজন

তাড়িতের আর এক গুণ এই যে, যদি উহা এক স্থানে অধিক থাকে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অন্য স্থানে অল্প থাকে, তবে প্রথমোক্ত স্থানের কিয়দংশ, শেষোক্ত স্থানে আসিয়া উভয় স্থানের সমান হয়। যদি একখানা মেঘে অধিক-প্রমাণ তাড়িত থাকে, আর একখানা মেঘে অল্প-প্রমাণ থাকে, তবে উভয় মেঘ পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইবার সময়ে, প্রথমোক্ত মেঘের কিয়ৎ-পরিমাণ তাড়িত নির্গত হইয়া, শেষোক্ত মেঘে প্রবিষ্ট হয়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটনার সময়ে অতি

বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি

প্রখর জ্যোতিঃপ্রকাশ ও ঘোরতর মেঘ-গর্জ্জন হয়, লোকে তাহাকেই বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি কহিয়া থাকে। পৃথিবী হইতে মেঘে, অথবা মেঘ হইতে পৃথিবীতে তাড়িত পদার্থ প্রবেশ করিবার সময়েও ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। বজ্রাঘাত ঐ তাড়িত-প্রবাহের আঘাত ব্যতিরেকে আর কিছু নয়।

পরিচালক ও অপরিচালক বস্তু

কোন কোন বস্তু ঐ তাড়িত পদার্থকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সত্বর সঞ্চালন করিয়া থাকে। সেই সকল বস্তুকে তাড়িত-পরিচালক কহে। অন্য কতকগুলি বস্তুর পরিচালকতা-শক্তি এত অল্প যে, কোন স্থানে তাড়িতের সঞ্চারণ নিবারণ করিতে হইলে, ঐ সকল দ্রব্য ব্যবধান দিতে হয়। ঐ সমস্ত বস্তুকে অপরিচালক কহে। সমুদায় ধাতুই প্রবল পরিচালক। তদ্ভিন্ন অঙ্গার, লবণাক্ত জল প্রভৃতি আর কতকগুলি দ্রব্য আছে, তাহারাও পরিচালক বটে, কিন্তু ধাতুর সদৃশ নহে। কাচ, পালক, পশুলোম এ সমুদায় সর্ব্বতোভাবে অপরিচালক।

অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, কেহ কেহ অট্টালিকার পার্শ্বে এক একটা লৌহময় শীক স্থাপন করিয়া থাকেন। ঐ শীক অট্টালিকার অপেক্ষা উচ্চ। যে যে ধাতুতে উহা প্রস্তুত হয়, তাহার তাড়িত-পরিচালক-শক্তি অত্যন্ত প্রবল। অতএব, অট্টালিকার উপর বজ্রাঘাত হইবার উপক্রম হইলে, তাহার কারণ যে তাড়িতপ্রবাহ, তাহা শীক দ্বারা সত্বর সঞ্চালিত হইয়া, পৃথিবী-গর্ভে প্রবাহিত হয়। ইহাতে গৃহে আর আঘাত হইতে পারে না।

[যন্ত্র-কথা]

মুদ্রা-যন্ত্র

মনুষ্য-কর্ত্তৃক যত প্রকার শিল্প-যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রের তুল্য হিতকারী বুঝি আর কিছুই নাই। পূর্ব্বে কোন গ্রন্থকর্ত্তা একখানি গ্রন্থ রচনা করিলে, শত বৎসরেও তাহা উচিতমত প্রচারিত হওয়া দুরূহ হইত। এক্ষণে কেহ কোন অভিনব পুস্তক প্রকাশ করিলে, মাসত্রয় অতীত হইতে না হইতেই তাহা ভূমণ্ডলস্থ সভ্যজাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। এক দেশের কোন পণ্ডিত কোন নূতন বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া অথবা কোন অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিলে, তাহা মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া অবিলম্বে অন্যদেশীয় পণ্ডিতদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে; রাজ্যের রাজকীয় কর্ম্মচারীরা অদ্য কোন বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিলে, কল্য তাহা সংবাদপত্রে উদিত হইয়া, সর্ব্বসাধারণের গোচর হইতেছে; রজনীতে যে সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা ঘটিত হয়, তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে দ্বারে দ্বারে দৃষ্ট হইতেছে। ফলতঃ মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া অবধি, পৃথিবীতে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রচার বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ উল্লেখ করা অসঙ্গত নয়। কিরূপে কত দিনে ঐ মহোপকারী যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইল, ইহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। অতএব এ স্থলে অতি সংক্ষেপে এ বিষয়ের বিবরণ করা যাইতেছে।

মুদ্রাযন্ত্রের উপ-কারিতা

খ্রীষ্টাব্দের নবম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশের মুদ্রা-যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি হয়। কিন্তু এক্ষণে যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সীসময় অক্ষর প্রস্তুত করিয়া পুস্তকাদি মুদ্রিত করা যায়, প্রথমে সেরূপ

নিয়ম নিরূপিত ছিল না। তখন কোন বিষয় মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন হইলে, তাহা কাষ্ঠ-ফলকে খুদিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইত। কিন্তু উল্লিখিত-রূপ মুদ্রাঙ্কণে অনেক ব্যয় ও বিস্তর সময় আবশ্যক করে; এই নিমিত্ত তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে নাই। যে মহাশয় স্বতন্ত্র অক্ষর প্রস্তুত করিয়া, তদ্দ্বারা পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কিত করিবার নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছেন, তিনি এই অদ্ভুত শিল্পবিদ্যাকে মানবজাতির যথার্থ উপকারিণী করিয়া তুলিয়াছেন। বোধ হয়, এরূপ রীতিও প্রথমে চীনদেশে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ষ্টানিস্‌লাস্ তুলিয়েন নামক এক ইউরোপীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, খ্রীষ্টীয় শকের ১০৪১ অবধি ১০৪৮ পর্য্যন্ত সাত বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে চীনদেশীয় একজন কর্ম্মকারক দগ্ধমৃত্তিকায় নির্ম্মিত কতকগুলি অক্ষর ব্যবহার করিয়াছিল।

—সৃষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি

—চীনদেশে

কিন্তু ইদানীং ইউরোপে এ বিষয়ে নূতন সৃষ্টি হওয়াতে যেরূপ উপকার দর্শিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময় ষ্ট্রাসবুর্গ-নামক নগরবাসী গটেনবুর্গ এবং হায়ের্লেম নগরবাসী কোস্‌টর—এই দুই ব্যক্তি স্বতন্ত্র মুদ্রাবিদ্যার উদ্ভাবন করেন। কোস্‌টর উল্লিখিত হায়ের্লেম নগরের নিকটবর্ত্তী এক কাননে ভ্রমণ করিতেছিলেন; সহসা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া এক বৃক্ষের ত্বকে কতকগুলি অক্ষর খুদিয়া, তাহা কাগজে মুদ্রিত করিলেন। সামান্য মসীতে মুদ্রিত করিতে গেলে, কাগজ আর্দ্র ও অক্ষর সকল অপরিষ্কৃত হয়, ইহা দেখিয়া, তিনি এক প্রকার ঘন মসী প্রস্তুত করিলেন এবং এক এক কাষ্ঠ-ফলকে বহু শব্দ একত্র খুদিয়া, একেবারে এক এক পৃষ্ঠা মুদ্রাঙ্কিত করিতে লাগিলেন। যে

—ইউরোপে

মহোপকারী যন্ত্র দ্বারা ভূমণ্ডলে জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রচার এবং সুখ ও স্বচ্ছন্দতা সংবর্দ্ধন বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপে দুই একজন সামান্ত মনুষ্যের কৌতুকাবেশ হইতে তাহার সূত্রপাত হয়।

গটেনবুর্গ ও কোস্টর উভয়েই প্রথমে কাষ্ঠ-ফলকে অক্ষর খুদিয়া মুদ্রিত করিতেন; পরে তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাষ্ঠময় অক্ষর নির্ম্মাণ করেন। অনন্তর যখন শেখর নামে এক শিল্পকুশল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধাতুনির্ম্মিত অক্ষর প্রস্তুত করিলেন, তখন এ বিষয়ের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল।

বহুকাল পর্য্যন্ত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মুদ্রা-যন্ত্রই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল; পরে ষ্টান্‌হোপ্ নামে এক শিল্প-নিপুণ বিচক্ষণ ব্যক্তি লৌহযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া জ্ঞান প্রচারের পথ সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ঐ যন্ত্র ষ্টান্‌হোপ মুদ্রাযন্ত্র বলিয়া বিখ্যাত আছে। তদনন্তর ক্লাইবমর, কগর, কোপ, রথবেন্ প্রভৃতি অনেকে উল্লিখিত যন্ত্রের প্রণালীক্রমে লৌহ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। তৎসমুদায় কোন কোন অংশে ষ্টান্‌হোপ্ যন্ত্র অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট।

লৌহযন্ত্র

ঐ সমুদায় মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা সংবাদপত্রাদি যত শীঘ্র মুদ্রিত হউক না কেন, তাহাতেও ইউরোপীয় লোকের রাজকীয় ব্যাপার সংক্রান্ত সংবাদ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা সম্যক্ চরিতার্থ হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। মনুষ্যের কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ হওয়া দুর্ঘট হইল। পরে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে আটাশে নভেম্বর টাইমস্ নামক ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র-পাঠকেরা অবগত হইলেন ;— তাঁহারা সে দিবস যে পত্র পাঠ করিতেছেন, তাহা অতি সুন্দর বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। সেই অদ্ভুত যন্ত্র কোনিগ্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রস্তুত। তাহা কলিকাতাস্থ টঙ্কশালার যন্ত্রের ন্যায় বাষ্পের তেজে চলিয়া থাকে। প্রথমে তাহাতে প্রতি ঘণ্টায় এক হাজার এক শত খণ্ড কাগজ এক পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইত। অনন্তর ঐ

বাষ্পীয় যন্ত্র

যন্ত্রের কোন কোন অংশ পরিশোধন করিয়া, অধিকতর উৎকৃষ্ট করিলে পর এক এক ঘণ্টায় আঠার শত তা কাগজ এক পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইতে লাগিল। তাহার পর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে উল্লিখিত কোনিগ্‌ সাহেব তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর এক বাষ্পীয় মুদ্রা-যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন; তদ্দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় এক হাজারতা কাগজ দুই পৃষ্ঠায় মুদ্রাঙ্কিত হইতে লাগিল। অবশেষে আপগাথ ও কৌপর নামক দুই অতি বিচক্ষণ শিল্পকুশল ব্যক্তি একত্র হইয়া এক অত্যুত্তম সুকৌশল-সম্পন্ন বাষ্পীয় মুদ্রা-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহা কোনিগ্‌ সাহেবের যন্ত্র অপেক্ষায় অনেক উৎকৃষ্ট। তাহাতে প্রতি ঘণ্টায় চারি সহস্র তা এক পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়া থাকে।

[স্বাস্থ্য-কথা]

শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান

শারীরিক সুস্থতা

শরীরী জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষা সুখকর বিষয় আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্ন হইলে, সমুদায় সংসার কেবল দুঃখের আগার-স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। যেমন গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে, পূর্ণচন্দ্রের সুধাময় কিরণ প্রকাশ পায় না, সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইলে, শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার সুখাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায় না। তখন অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল যশ, প্রভূত মান-সম্ভ্রম—কিছুতেই অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয় না। রোগী ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসুখী, সকল বিষয়ে বিরক্ত, এবং কেবল রোগের চিন্তাতেই চিন্তাকুল, কত কষ্টেই তাহার দিনযাপন হয়। তাহার দুঃখের দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়। চিররোগী ব্যক্তিদিগের শরীর কেবল দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়া উঠে। তাহারা নিয়তই

উদ্বিগ্ন এবং সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত-চিত্ত। আহার বিহারাদি শরীর-রক্ষোপযোগী সকল ব্যাপারেই কুণ্ঠিত থাকিয়া, কোনক্রমে কষ্টেস্যৃষ্টে কালহরণ করা তাহাদের নিত্যব্রত হইয়া উঠে। স্বাস্থ্যরক্ষার্থ যত্ন না করা যে কিরূপ দুষ্কর্ম্ম, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

শরীর ও মনের নিকট সম্বন্ধ

পরমেশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত শরীরের এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন যে, শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, অন্তঃকরণ সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট থাকে এবং অন্তঃকরণ সতেজ ও প্রফুল্ল থাকিলে, শারীরিক সুস্থতাও সাতিশয় সুলভ হয়। উভয়ের সুস্থতা উভয়ের পক্ষেই উপকারী এবং উভয়ের অসুস্থতা উভয়ের পক্ষেই অপকারী। অন্তঃকরণ শোকাকুল হইলে, শরীর শীর্ণ হয় এবং শরীর পীড়িত হইলে, ক্রোধ রিপু প্রবল হয়, এবং দয়া, ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি দুর্ব্বল হইয়া থাকে। যে শিশু সতত সহাস্যবদন, পীড়িত হইলে, সেও সর্ব্বদা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়। তখন আর তাহার মনোহর মধুর হাস্য দৃষ্ট হয় না, এবং অর্দ্ধস্ফুট সুমিষ্ট শব্দসকলও শ্রুত হয় না। প্রখর ক্ষুধায় সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ না করিলে, শরীর বলহীন হওয়ায় মনও নিস্তেজ হয় এবং অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে, শরীর ও মন উভয়েরই গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রম করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদ্ঘর্ম্মকলেবরে অবিশ্রান্ত পথ পর্য্যটন করিলে, অন্তঃকরণ উত্যক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু প্রাতঃকালে বিশ্বপতির বিশ্বকার্য্যের পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যদর্শন-পুরঃসর সুশীতল সমীরণ সেবন করিলে, মনোমধ্যে পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ-রসের সঞ্চার হইতে থাকে। শারীরিক পীড়া হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মারকতা-শক্তির হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে এবং রোগশান্তি ও স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হওয়ায় কত কত ব্যক্তির স্মরণশক্তি প্রবল হইয়াছে। অতএব যখন শরীরের সহিত

মনের এ প্রকার নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং শরীর সুস্থ না থাকিলে, কর্ত্তব্য-কর্ম্মসমুদায় বিহিতবিধানে সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তখন জীবন-রক্ষা, সুখসাধন প্রভৃতি সকল বিষয়েরই নিমিত্তে শারীরিক স্বাস্থ্য লাভার্থে যত্নবান্ থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি প্রীতমনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হয়, পরোপকার করা বিহিত হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত হয়, তবে স্বীয় শরীরকে সুন্দররূপে সুস্থ স্বচ্ছন্দ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই; কারণ, শরীর ভগ্ন হইলে, ঐ সমস্ত অবশ্য-কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যদি পরমশ্রদ্ধাস্পদ পিতামাতাকে যন্ত্রণারূপ অগ্নিশিখায় দগ্ধ করা অধর্ম্ম হয়, এবং যদি প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র-কন্যাদিগকে যথানিয়মে প্রতিপালন না করা দুষ্কর্ম্ম হয়, তবে সাধ্যসত্ত্বে শারীরিক নিয়ম অবহেলন-পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়া ঐ সমস্ত বিপত্তি উপস্থিত করা অবশ্যই অধর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। জল-প্রবেশ, অগ্নি-প্রবেশ ও উদ্বন্ধনাদি দ্বারা একেবারে প্রাণত্যাগ করা, আর ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দেহ নাশ করা, উভয়ই তুল্য; কেবল শীঘ্র আর বিলম্ব, এইমাত্র বিশেষ। অতএব পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের শরীররক্ষার্থে যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে।

শারীর বিধান বিদ্যা

রোগ ও অকালমৃত্যুঘটিত যাবতীয় ক্লেশ পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল। শারীরবিধান-বিদ্যায় যে সমস্ত ব্যবস্থার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত থাকে, তন্মধ্যে এস্থলে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি প্রধান বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

পরমেশ্বর ইতর প্রাণীদিগকেও শারীরিক নিয়মের অধীন করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে তৎপ্রতিপালনে সমর্থ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন। তাহারা সেই সমস্ত স্বাভাবিক সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব শারীরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করতঃ সুস্থশরীরে কাল-যাপন করে; অতএব এ বিষয়ে তাহাদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে, অশেষ প্রকারে উপকার দর্শিতে পারে। যে যে বিষয়ে তাহাদের শরীরের সহিত আমাদের শরীরের প্রাকৃতিক ঐক্য আছে, সে সে বিষয়ে তাহাদের ব্যবহার আমাদের আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। সবিশেষ মনোনিবেশ-পূর্ব্বক তাহাদের তত্তদ্‌বিষয়ক ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইতর প্রাণীর ব্যবহার—

প্রথমতঃ। ইতর জন্তুরা স্বভাবতঃ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে। সকলেই পক্ষীদিগকে অঙ্গ প্রক্ষালন ও পক্ষ-বিন্যাস করিতে দেখিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাহারা পক্ষসমুদায় পরিষ্কৃত ও বিন্যস্ত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন তাহাদিগকে কেমন সুন্দর দেখায় ও কেমন স্ফূর্ত্তিযুক্ত বোধ হয়। গৃহস্থের গৃহস্থিত বিড়াল গাত্রের লোমগুলি কেমন পরিষ্কৃত ও চিক্কণ করিয়া থাকে। ধেনুগণ কত যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক বৎসের শরীর লেহন করে। অশ্বগণের শরীর মার্জ্জিত করিয়া না দিলে, তাহারা তৃণাদির উপর লুণ্ঠিত হইতে থাকে। বনের প্রায় সমুদায় পশু-পক্ষীই পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু মনুষ্যের আলয়ে থাকিলে, নানা কারণে তাহার কিছু কিছু অন্যথা হইতে দেখা যায়।

(১) পরিচ্ছন্নতা

দ্বিতীয়তঃ। পশুপক্ষীদিগকে আহার অন্বেষণার্থে পরিশ্রম করিতে হয়, ইহাতে শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার্থে অঙ্গ সমুদায়কে যত চালনা করা আবশ্যক,

তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ পরমেশ্বর তাহাদের শারীরিক প্রকৃতির সহিত বাহ্যবস্তুর এরূপ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন যে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না, অথচ পরিমিত পরিশ্রম না করিলে চলে না।

(২)
অঙ্গ-চালনা

তৃতীয়তঃ। প্রত্যেক প্রাণী আপন আপন স্বভাবানুসারে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে। জগদীশ্বর যে যে জন্তুর যে যে খাদ্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই তাহাদিগের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। তাহারা মনুষ্যের ন্যায় পুনঃ পুনঃ অতি ভোজন করিয়া পীড়িত হয় না এবং অহিতকারী দ্রব্য আহার করিয়াও অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় না।

(৩)
আহার

ইতর জন্তুসকল পরমেশ্বর-দত্ত সংস্কার-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রকার স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা সে প্রকার অভ্রান্ত-সংস্কার প্রাপ্ত হন নাই বটে, কিন্তু পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া সে বিষয়ের অভাব পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারা বুদ্ধিসহকারে শরীরের স্বভাব, প্রত্যেক অঙ্গের প্রয়োজন এবং তাহাদের কার্য্যের রীতি নিরূপণপূর্ব্বক শারীরিক নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, এবং তাহা পরিপালন করিয়া, অনির্ব্বচনীয় আরোগ্য-সুখ-সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন। পশ্চাৎ এ বিষয়ের এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে।

মনুষ্যের বুদ্ধি-
প্রসূত নিয়ম পালন

আমাদের গাত্র চর্ম্মে আবৃত। সেই চর্ম্ম লোমকূপে পরিপূর্ণ। এক এক লোম কূপ শরীরস্থ অনিষ্টকারী দুষ্ট পদার্থ নির্গত হইবার এক এক দ্বারস্বরূপ। তদ্দ্বারা প্রতিদিন ন্যূনকল্পে নয় ছটাক দুষ্ট পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। যদি লোমকূপ রুদ্ধ হওয়ায়, সেই সকল অনিষ্টকারী পদার্থ বহির্গত

হইতে না পায়, তবে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া, তাহাকে দোষাশ্রিত করে। রক্ত দূষিত হইলে শরীর অসুস্থ হয়। শরীর হইতে যে স্বেদ নির্গত হয়, তাহার জলীয় ভাগ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। অবশিষ্ট ভাগ গাঢ় হইয়া লোমকূপ সমুদায় রোধ করে। অতএব তাহাদিগকে পরিষ্কৃত রাখিবার নিমিত্ত অঙ্গ সকল প্রক্ষালন ও মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যে বস্ত্র এ প্রকার ছিদ্রযুক্ত ও পরিষ্কৃত যে, অনায়াসে স্বেদ শোষণ করিতে পারে; এবং যে বস্ত্রের মধ্য দিয়া স্বেদ বহির্গত হইতে পারে, তাহাই পরিধান করা বিধেয়। নতুবা শরীর অপরিষ্কৃত থাকিলেও যে প্রকার অপকার হয়, অত্যন্ত ঘন ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেও সেই প্রকার হইয়া থাকে। চর্ম্ম লোমকূপ দ্বারা যেমন শরীরের দুষ্ট পদার্থ বাহির করিয়া দেয়, সেইরূপ আবার বাহিরের বস্তুও শোষণ করে। অতএব গাত্র ধৌত ও মার্জ্জিত না করিলে, দুই প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। এক প্রকার এই যে, লোমকূপ বদ্ধ হওয়াতে, অনিষ্টকর দুষ্ট পদার্থসকল শরীর হইতে বহির্গত হইতে পায় না; আর এক প্রকার এই যে, গাত্রে যে সকল মলা থাকে, তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগোৎপাদন করে। শরীরস্থ চর্ম্মের এই প্রকার গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গাত্র ও বস্ত্র পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হয়। যাঁহারা এই প্রকারে এই নিয়ম অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা তৎপ্রতি-পালনে যেমন যত্নবান্ হন, ইতর ব্যক্তিদিগের তাদৃশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

(১)
অঙ্গমার্জ্জন ও
প্রক্ষালন

এই প্রকারে শরীরস্থ মাংসপেশী, মস্তিষ্ক প্রভৃতির স্বভাব ও প্রয়োজন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে স্বাস্থ্যসাধনার্থ শরীর ও মন অতিশয় চালনা করা আবশ্যক।

কোন অঙ্গকে নিতান্ত নিশ্চল রাখা উচিত নয়, এবং কোন অঙ্গকে অতিমাত্র চালনা করাও শ্রেয়ঃ নহে। উভয়ই দোষ, উভয়েই শরীর রুগ্ন ও

ভগ্ন হয়। সুস্থ-শরীরে উৎসাহ-সহকারে শরীর ও মনকে অনতিশয় চালনা করিলে, আপনাকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বোধ হওয়ায় অতি বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত ভোগ-বিলাসী ব্যক্তিরা তদনুরূপ সুখাস্বাদনে সমর্থ নহেন। তাঁহারা যাহাকে ইন্দ্রিয়সুখ কহেন, তাহা শারীরিক সুস্থতাজনিত বিশুদ্ধ আনন্দ অপেক্ষায় অনেকাংশে নিকৃষ্ট।

সর্ব্ব অঙ্গ সমভাবে চালনা

সাংসারিক আচার-ব্যবহারে এ প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে যে, প্রায় সকলেই অঙ্গসঞ্চালন-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত দুই দোষের কোন না কোন দোষে লিপ্ত আছেন। ধনীদিগের মধ্যে অনেকে পরিশ্রম বিমুখ হইয়া আলস্য-সলিলে শারীরিক স্বচ্ছন্দতাকে বিসর্জ্জন দেন, নির্ধনেরা ধনোপার্জ্জনার্থে নিয়মাতীত পরিশ্রম করিয়া পরমায়ু হ্রাস করিয়া ফেলেন; এবং বিদ্যার্থীরা শারীরিক পরিশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতিমাত্র মানসিক পরিশ্রম করিয়া, শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করেন ও তন্মধ্যে কেহ কেহ চিররোগী হইয়া বহু কষ্টে জীবন যাপন করেন। প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের অনেকানেক ছাত্রকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার কিছুকাল পরেই ক্রমে ক্রমে জীর্ণ হইতে দেখা যায়। সেই সময়ে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা ছাত্রদিগের শারীরিক নিয়ম-প্রতিপালন বিষয়ে বিশিষ্ট রূপ দৃষ্টি না রাখাতে এবং বিদ্যালয়স্থ সমস্ত ছাত্রকে শারীর-বিধান-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আপনাদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া না জানাতেই মহানর্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

ধনী ও ছাত্রের নিয়ম-লঙ্ঘন

এক্ষণে বিষয় কর্ম্মের যে প্রকার রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। বিষয়ী ব্যক্তিরা দিবসের অধিক ভাগ কেবল বিষয়কার্য্যেই ক্ষেপণ করেন, জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে অবকাশ পান না। কিন্তু মনুষ্যের সকল প্রধান-বৃত্তিই যথানিয়মে চালনা করা উচিত এবং কিঞ্চিৎকাল

পরিশ্রম ও আমোদ-প্রমোদ করাও কর্ত্তব্য। তদ্‌ব্যতিরেকে কোন মতেই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সর্ব্বতোভাবে সুখী হওয়া যায় না। যখন পরম কারুণিক পরমেশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে গান-শক্তি ও পরিহাস-প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন তন্নিবন্ধন বৈধ-সুখ-সম্ভোগ করা কোন মতে গর্হিত নয়। তাহাদিগকে অসৎ বিষয়ে অর্থাৎ অসৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনার্থে নিয়োজন করাই অধর্ম্ম। নির্দ্দোষ আমোদ স্বাস্থ্যসাধন পক্ষে অত্যন্ত উপকারী ও সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

নির্দ্দোষ আমোদ আবশ্যক

এইরূপ পরিপাক-শক্তি, শোণিত-সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া পশ্চাল্লিখিত নিয়ম সমুদায় নিরূপিত হইয়াছে। প্রতিদিন পরিমিত ভোজন ও বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য, শরীর প্রক্ষালন ও পরিমার্জ্জন করা এবং পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কৃত রাখা আবশ্যক। যে গৃহ শুষ্ক, প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত এবং যাহাতে অহোরাত্র বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চার থাকে, তাহাতে বাস করা বিধেয়। সচরাচর মাদক সেবন করা অকর্ত্তব্য। প্রতিরাত্রিতে ছয় সাত ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক ও মনোমধ্যে উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে না দেওয়া ও উপস্থিত বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই সমুদায় নিয়ম পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা। অপর সাধারণ সকলেরই এই সমুদায় শুভদায়ক আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ থাকা উচিত। সকলে এই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে পারিলে ভূমণ্ডলে রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইয়া শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-লাভ ও তন্নিবন্ধন অশেষ প্রকার সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়।

কয়েকটি পরীক্ষিত নিয়ম

বায়ু-সেবন ও গৃহ-পরিমার্জ্জন

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বায়ুকে জগৎপ্রাণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বাস্তবিক উহা পৃথিবীস্থ জীবগণের জীবনস্বরূপ, তাহার সন্দেহ নাই। অন্ন, জল ব্যতিরেকে দুই এক দিবস অতিক্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায়; কিন্তু বায়ু-ব্যতিরেকে ক্ষণমাত্র প্রাণ ধারণ করা যায় না। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম নিষ্ঠ ব্রতধারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে নবরাত্র করিয়া, অর্থাৎ নয় দিবস নিরশন থাকিয়া জীবিত থাকেন, শুনা গিয়াছে; কিন্তু নির্ব্বাত স্থানে নয় পল মাত্র অবস্থিতি করিতে হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। যে সমস্ত পথিক ও বণিক বালুকাময় মরুভূমি পর্য্যটন করে, তাহারা জলপান-ব্যতিরেকে দশ পোনের ক্রোশ অনায়াসেই ভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু নির্ব্বাত স্থান দিয়া দশ পোনের পদও গমন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব, বায়ু আমাদিগের জীবন-রক্ষার্থ যেমন আবশ্যক, অন্য কোন বস্তু সেরূপ নয়। অন্ন, জল ও জ্যোতিঃ আবশ্যক বটে, কিন্তু বায়ুর তুল্য নয়। বায়ু পৃথিবীর জীবের সাক্ষাৎ প্রাণস্বরূপ।

বায়ু জীবের প্রাণ-স্বরূপ

কিন্তু সকল স্থানের বায়ু সমানরূপ উপকারী নয়। বিশুদ্ধ বায়ুই প্রকৃতরূপ উপকারী। যেমন, দুর্গন্ধ জল পান করিলে ও গলিত ফল ভক্ষণ করিলে রোগ জন্মে, সেইরূপ অবিশুদ্ধ দুষ্ট বায়ু সেবন করিলেও রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরের মধ্যে অবিশ্রান্ত রক্ত চলিতেছে। সেই রক্ত চলিতে চলিতে শরীরস্থ অন্যান্য দুষ্ট পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইতেছে; পরে অপর্য্যাপ্ত বায়ু নিঃশ্বাস-সহকারে দেহমধ্যে নীত হইয়া সেই দূষিত রক্ত সংস্কৃত করিতেছে। যদি কোন অহিতকারী পদার্থ ঐ বায়ু-সমভিব্যাহারে সতত শরীরমধ্যে

বিশুদ্ধ ও দুষ্ট বায়ু

প্রবেশ করে, তাহা হইলে, আশু বা বিলম্বে রোগ জন্মে, তাহার সন্দেহ নাই।

বায়ু নানা কারণে ও নানা প্রকারে দূষিত হইতে পারে। মনুষ্যের শ্বাস-প্রশ্বাস উহার এক প্রধান কারণ। আমরা যে বায়ু নাসিকা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া শরীরস্থ করি, তাহা শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, বিকার প্রাপ্ত হইয়া বহির্গত হয়। ইহা নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবার সময় আমাদিগের প্রাণ ধারণের উপযোগী থাকে, পরে প্রাণ সংহারের উপযোগী হইয়া বাহির হইয়া আইসে। ইহার প্রাণ-ধারণ-গুণ নষ্ট হইয়া, প্রাণ-হরণ-গুণ উৎপন্ন হয়। ঐ বিষতুল্য বিকৃত বায়ু শরীর হইতে বাহির হইয়া যে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকারী। তাহা সেবন করা কর্ত্তব্য নয়।

দূষিত বায়ু

বিশুদ্ধ বায়ু শ্বাস, প্রশ্বাস দ্বারা উক্তরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়, ইহা অক্লেশে পরীক্ষা করিয়া সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। চূণের জলে সামান্য বায়ু ব্যজন করিলে, সে জলের কিছুমাত্র রূপান্তর হয় না, যেমন তেমনই থাকে। কিন্তু ফুৎকার দিলে, উহা অবিলম্বে মলিন হইয়া উঠে। যে অহিতকারী পদার্থ নিঃশ্বাস-সহকারে শরীর হইতে বহির্গত হয়, চূণের জলে মিলিত হইলে, সে জল ঐরূপ আবিল হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ বায়ু

আমরা যে গৃহে অবস্থিতি করি, সে গৃহের বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা অনবরতই উক্তরূপ দূষিত হইতে থাকে। যদি বাহিরের বায়ু প্রবাহিত হইয়া, ঐ দূষিত বায়ুকে অপসারিত করিয়া না দেয়, তাহা হইলে, ঐ বায়ু ক্রমশঃ বিষতুল্য হইয়া উঠে। উহা সেবন করিলে, অবিলম্বেই মৃত্যুগ্রাসে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মাণিকচাঁদ কলিকাতার দুর্গমধ্যে দৈর্ঘ্যে বার হস্ত

রুদ্ধ বায়ু বিষতুল্য

ও প্রস্থে নয় হস্তপ্রমাণ একটি প্রকোষ্ঠে একশ ছচল্লিশ জন ইংরাজকে সমস্ত রাত্রি রুদ্ধ করিয়া রাখাতে যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। ঐ প্রকোষ্ঠের এক দিকে একটিমাত্র বাতায়ন ছিল; সুতরাং আবশ্যকমত বায়ু-সঞ্চারের উপায় ছিল না। উল্লিখিত বন্দী সকলের নিশ্বাসে উক্ত গৃহের সমস্ত বায়ু অতি শীঘ্র ভ্রষ্ট হইয়া গেল, তাহারা অবিলম্বেই পিপাসায় অস্থির হইল, গাত্রদাহে দগ্ধ হইল এবং বায়ুবিরহে অধীর হইতে লাগিল। সকলেই কিঞ্চিৎ বায়ু লাভের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হইয়া, ঊর্দ্ধস্থ বাতায়নের নিকটস্থ হইবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিল এবং "বন্দুক করিয়া আমাদের যন্ত্রণার পর্য্যবসান কর" বলিয়া রক্ষকদিগের নিকট ব্যগ্রতা-সহকারে প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরিশেষে এক এক করিয়া হতচেতন হইয়া, ধরণীতলে পতিত হইল, এবং অবশিষ্ট সকলে তাহাদের মৃত শরীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বায়ু প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে দ্বারোদ্ঘাটন হইলে, দৃষ্ট হইল, একশ ছচল্লিশ জনের মধ্যে তেইশ জন মাত্র তখন পর্য্যন্ত জীবিত আছে; অবশিষ্ট সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

নাসিকার ন্যায় লোম-কূপ দ্বারাও শরীরস্থ অনিষ্টকারী পদার্থ সমূহ নিয়ত বহির্গত হয়। অতএব তদ্দ্বারাও গৃহের বায়ু ক্রমাগত দূষিত ও অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কখন কখন এমন দূষিত হয় যে, তদ্দ্বারা এক প্রকার দুঃসহ দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শিশির-কালে ঊষা-কালীন বিশুদ্ধ বায়ু সেবনপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির শয়নগৃহের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া, তাহার শয্যার নিকট গমন করিলে, এরূপ দুর্গন্ধ অনুভূত হয় যে, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইবার জন্য ব্যস্ত হইতে হয়।

শয়নগৃহে দূষিত বায়ু

এইরূপে নিশ্বাস-ক্রিয়া, স্বেদ-নিঃসরণ, রন্ধন-ধূম, দুর্গন্ধ বস্তুর বাষ্পোদ্গম ইত্যাদি অনেক কারণ দ্বারা গৃহের বায়ু অবিরত দূষিত হইয়া, গৃহবাসীদিগের

পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইতে থাকে। অতএব যাহাতে গৃহমধ্যে সতত বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে অর্থাৎ বাহিরের বিমল বায়ু গৃহের মধ্যে সর্ব্বদা সঞ্চারিত হইয়া, তথাকার দূষিত বায়ু বহির্গত করিয়া দেয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু আবশ্যক

তাহার উপায় করা কঠিন কর্ম্ম নয়। বায়ু আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, করুণাময় পরমেশ্বর উহা সর্ব্বত্র প্রচুর রাখিয়া দিয়াছেন। উহা সকল স্থানে, সকল গৃহে ও সকল রন্ধ্রেই সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পথ, ঘাট, গৃহ, কানন, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি যে কোন স্থানে আমাদের অবস্থিতি করা আবশ্যক হয়, তাহাই বায়ুরাশিতে পরিপূর্ণ; মৎস্য, কুম্ভীর, হাঙ্গর প্রভৃতি জল-জন্তু যেমন জলাশয়-মধ্যে নিমগ্ন থাকে, আমরাও সেইরূপ সুগভীর বায়ুরাশিতে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি। অতএব বায়ু যেমন সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক, তেমনি সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। কিন্তু কেমন দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরমেশ্বরের করুণাময় অভিপ্রায় অবহেলা করা আমাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে; আমরা প্রযত্ন-পূর্ব্বক বায়ু-প্রবাহের প্রতিরোধ করিয়া থাকি। বাসস্থানে অপ্রতিহত বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকা নিতান্ত আবশ্যক, ইহা এতদ্দেশীয় লোকেরা কিছুমাত্র বিবেচনা করে না; সুতরাং গৃহ-নির্ম্মাণের সময়ে তাহার উপায় করিয়াও রাখে না।

—তাহার উপায়

এতদ্দেশীয় লোকের গৃহ-নির্ম্মাণের প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, বিস্মিত ও দুঃখিত হইতে হয়। গৃহমধ্যে জ্যোতিঃ ও বায়ু সঞ্চালনের প্রতিষেধ করা যেন ঐ প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন গৃহ-সমুদায়ের এক একটি প্রকোষ্ঠ এক একটি সিন্দুক বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। বাস্তবিক, সিন্দুকের এক পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র ছিদ্র

এদেশের গৃহ-নির্ম্মাণ প্রণালী

এবং অন্য এক পার্শ্বে তদপেক্ষা বৃহত্তর আর একটি চতুষ্কোণ ছিদ্র কর্ত্তন করিলে যেমন হয়, পূর্ব্বকালের প্রকোষ্ঠ-সমুদায় অবিকল সেইরূপ ছিল এবং অদ্যাপি পল্লিগ্রামে অনেক স্থানে সেইরূপ গৃহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদীয় ভিত্তির ঊর্দ্ধদেশে দুই একটি হস্ত-প্রমাণ গবাক্ষ বা বাতায়ন থাকে; তদ্দ্বারা যে-প্রমাণ বায়ু গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে, গৃহবাসীরা তাহাই সেবন করিয়া সজীব থাকেন। অনেকানেক তৃণাচ্ছাদিত গৃহে উক্তরূপ গবাক্ষ থাকে না; কেবল এক দিকে অথবা ঊর্দ্ধসংখ্যা দুই দিকে এক বা দুইটি মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার বিদ্যমান থাকে। আপাততঃ বোধ হয়, উল্লিখিত গৃহ ও প্রকোষ্ঠ সমুদায় প্রস্তুত হইবার সময়ে তাহার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বায়ু যাহা রুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা বুঝি তাহা হইতে কোন কালেই নিঃশেষে নিঃসারিত হয় না। অনেক মহাশয় শীতঋতুতে গৃহের বাতায়ন উদ্ঘাটন করা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। তথাকার বিষপূরিত দূষিত বায়ু যত্নপূর্ব্বক রুদ্ধ করিয়া রাখেন। ঐরূপ একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে বহুসংখ্যক লোক শয়ন করিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা তথাকার বায়ু বিষাক্ত করিয়া রাখে। তাহারা সেই বিষাক্ত বায়ুর মধ্যে সমস্ত রজনী রুদ্ধ থাকিয়া যে প্রাতঃকালে সজীব শরীরে গাত্রোত্থান করে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ভাগ্যে আমরা উক্তরূপ গৃহের উক্তরূপ বাতায়নে সার্সী ব্যবহার করিতে শিক্ষা করি না, তাহাই তো বাতায়নের ছিদ্র দিয়া অল্প অল্প বায়ু প্রবেশ করিয়া গৃহবাসীদিগের প্রাণরক্ষা করে। সার্সী ব্যবহার করিলে, সমুদায় রন্ধ্র রুদ্ধ হওয়ায়, তাহাদিগকে এক রজনীতেই মৃত্যুগ্রাসে প্রবিষ্ট হইতে হইত।

এই মহানগরের এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অধুনাতন লোকেরা ইংরাজদিগের দৃষ্টান্তানুসারে গৃহের দ্বার ও বাতায়নাদি প্রশস্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের গৃহনির্ম্মাণের সমগ্র প্রণালী বিবেচনা করিয়া

দেখিলে বোধ হয়, গৃহমধ্যে অতি প্রচুর বায়ু সঞ্চার থাকা যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা তাঁহাদের কদাচ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে এক একটি প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণের যেরূপ রীতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এতদ্দেশীয় সমগ্র গৃহই সেইরূপ রীতিক্রমে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় লোক আবাস গৃহ চক্‌বন্দি করা যেমন ভালবাসেন, অন্য কোন প্রণালী সেরূপ ভালবাসেন না। নূতন গৃহের সূত্রপাত করিবার সময়ে, অগ্রে চকের ঘরের স্থান রাখিয়া, তবে অন্যান্য কার্য্য আরম্ভ করেন। চকৃবন্দি করার গুণ এই যে, সমগ্র গৃহ চতুর্দ্দিকে প্রকোষ্ঠ-শ্রেণীতে বেষ্টিত থাকিয়া, চতুর্দ্দিকের বায়ু রোধ করিতে থাকে। বিশেষতঃ রাজধানীর মধ্যে উক্তরূপ চকৃবন্দি করা নিবাস-গৃহ অশেষ অনর্থের মূল। পল্লীগ্রামে স্থান সুলভ, গৃহ সমুদায় অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, বাস্তুবাটির চতুর্দ্দিকে প্রায়ই উদ্বাস্তু থাকে; অতএব তথায় চকৃবন্দি হইলেও গৃহমধ্যে কিয়ৎপ্রমাণ বিশুদ্ধ বায়ু কথঞ্চিৎ সঞ্চারিত হইতে পারে। কলিকাতার বিষয় ইহার নিতান্ত বিপরীত; এখানে ভূমি অতি দুর্লভ। গৃহ অতি সঙ্কীর্ণ; চতুর্দ্দিক্‌ চকৃবন্দি হইলে অঙ্গন অতি অল্প থাকে। এই সমস্ত চকের ঘর দ্বিতল এবং ত্রিতল হইয়া থাকে। বাটীর পার্শ্বে কিছুমাত্র উদ্বাস্তু থাকে না। প্রতিবাসীর বাস-গৃহ এরূপ সন্নিহিত ও সংলগ্ন যে, সেদিকে একটি বাতায়ন রাখিবারও উপায় হয় না। উক্তরূপ এক একটি গৃহ এক একটি কূপ বলিয়া অনায়াসেই উল্লিখিত হইতে পারে। আবার যখন ক্রিয়াকাণ্ডের সময়ে চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হয়, তখন দারুময় সিন্দুকের সহিত উহার কিছুমাত্র বিশেষ থাকে না। উহার মধ্যে নিশ্বাস-বিষ নির্গত হইতেছে, স্বেদ-বিন্দু সঞ্চিত হইতেছে, রন্ধন-ধূম বিরচিত হইতেছে এবং কত প্রকার গলিত বস্তুর বিষময় বাষ্প সঞ্চরণ করিতেছে। করুণাময় পরমেশ্বর, গৃহমধ্যে অপর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ুর সতত সঞ্চার থাকা আবশ্যক বিবেচনা

— কলিকাতায় গৃহনির্ম্মাণ

করিয়া, যে মঙ্গলগর্ভ মনোহর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় লোকে সে নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া সমুচিত শাস্তি-ভোগ করিতেছেন।

আমরা ভ্রান্তিক্রমে যাহা সুখের বিষয় বিবেচনা করি, আমাদিগের বুদ্ধি-দোষে তাহা অত্যন্ত অসুখের কারণ হইয়া উঠে। ক্রিয়াকাণ্ডের সময়ে গৃহস্থের গৃহ যেরূপ অনিষ্টকারী ও বীভৎসজনক হয়, তাহা এইমাত্র উল্লিখিত হইল। রাত্রিকালে নৃত্য-গীতাদি হইলে, ততোধিক অহিতকারী হইয়া উঠে।

লোকসমাগমে অনিষ্ট

উহা চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ও প্রকোষ্ঠ-শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত, উপরিভাগে চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত, এবং অভ্যন্তরে লোক-জনে পরিপূর্ণ। বাস্তবিক, উহা ঊর্দ্ধাধঃ-সংবলিত দশ দিকে রুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিলেও অসঙ্গত হয় না। বহির্দ্বার উদ্ঘাটিত থাকে বটে, কিন্তু কৌতুকাবিষ্ট অনাহূত লোকের সমাগমে নিতান্ত নিরবকাশ হইয়া যায়। কোন দিক্ হইতে বায়ু-সঞ্চারণের পথ থাকে না। লোকের নিশ্বাসে ও স্বেদনিঃসরণে তথাকার রুদ্ধ বায়ু অতি শীঘ্র দূষিত হয়, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে এমন দুর্গন্ধ হয় যে, অসহ্য হইয়া উঠে। তালবৃন্তধারী আজ্ঞাকারী ভৃত্যগণ, সেই সমস্ত দুর্গন্ধময় ঘনীকৃত গরল বারংবার সঞ্চালন করিয়া, নিয়োগকর্ত্তাদিগের ও তদীয় বান্ধবদিগের মুখমণ্ডলে প্রক্ষেপ করিতে থাকে। রাত্রি-জাগরণ ও বিষ-পূরিত বায়ু-পরিষেবন দ্বারা তত্রস্থ সমস্ত লোকের শরীর অবিলম্বে ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইয়া পড়ে। যাঁহারা নিশার্দ্ধ-সময়ে অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সতেজ শরীর ও সরস বদনে সঙ্গীত-ভূমি আরোহণ করেন, প্রাতঃকালে তাঁহাদিগকে বিবর্ণবদন ও ক্লিষ্ট-লোচন অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইতে হয়। তদীয় মুখশ্রীতে স্বকীয় অত্যাচারের লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা আমাদিগের আবাস-গৃহ উল্লিখিতরূপ বিধিবিরুদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করেন, তাঁহারা দেব-গৃহও তদনুরূপ করিবেন, ইহা সর্ব্বতোভাবেই সম্ভব ;

ফলতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, তাঁহারা দেবালয়-নির্ম্মাণ-বিষয়ে শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান-বিষয়ক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণের একশেষ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় দেব-মন্দিরের মধ্যে অনেক মন্দিরই একদ্বার। যদি বা দুই দ্বার থাকে, তাহার একটি চিরদিন রুদ্ধ; অতএব তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু-সঞ্চার ও অব্যাহত জ্যোতিঃ-সমাগমের সম্ভাবনা থাকে না। পবন তথায় প্রবেশ করিতে স্থান পান না এবং সূর্য্যও স্বীয় রশ্মি বিকীর্ণ করিতে পথ পান না। সুপ্রশস্ত উন্নত মন্দিরের মধ্যে দিবা-রাত্র রাত্রি বিরাজ করে, এবং উহা প্রস্তুত হইবার সময়ে যে বায়ু উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, চিরকারারুদ্ধ দুষ্ট লোকের ন্যায় দূষিত ভাবে চিরকালই তথায় অবস্থিতি করে। কোন কোন প্রধান তীর্থের প্রধান মন্দিরে দিবাভাগেও দীপালোক ব্যতিরেকে দেব-সেবা সম্পন্ন হয় না। ঐ সমস্ত দেবালয়-মধ্যে দীপ-শিখার ধূম উত্থিত হয়, বিল্বদল ও কুসুম-পুঞ্জ গলিত হইয়া দুর্গন্ধ হয়, যাত্রিগণের নিশ্বাস-বায়ু নিঃসৃত হইয়া ব্যাপ্ত হয় এবং যে মন্দিরে শক্তি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার অভ্যন্তর ও বাহির পশুকণ্ঠ-বিনির্গত পূতিগন্ধ শোণিতে দূষিত হইয়া অতিমাত্র জঘন্য হইয়া থাকে।

দেবমন্দির নির্ম্মাণ প্রণালী

এতদ্দেশীয় লোকের গৃহ-নির্ম্মাণের প্রণালী-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, ঐ প্রণালী যে অত্যন্ত অনিষ্টকারী, ইহা অক্লেশেই প্রতীত হইতে পারে। বাসগৃহের সূত্রপাত করিবার সময়ে সর্ব্বাগ্রে অপর্য্যাপ্ত বায়ু-সঞ্চারের সদুপায় নির্দ্ধারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

রন্ধনের ধূম, গলিত বস্তুর বাষ্প, দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা, লোমকূপ-বিনির্গত স্বেদ-বিন্দু ইত্যাদি অনেক বস্তু দ্বারা গৃহের বায়ু যে নিয়ত দূষিত হইয়া থাকে, ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যে সমস্ত দুঃখী লোক এক কুটীর বা প্রকোষ্ঠের মধ্যেই অশন, শয়ন, রন্ধনাদি সমস্ত নিত্যক্রিয়া সম্পাদন

করিয়া থাকে, তাহাদিগের গৃহের বায়ু ঐ সমস্ত অনিষ্টকারী পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া, অনবরতই দোষাশ্রিত হয়। যে গৃহে ঐ সমস্ত বস্তু বিদ্যমান থাকে, সতত বায়ুসঞ্চার থাকিলেও তথাকার বায়ু বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। প্রত্যুত নিরন্তর বিষাক্ত হইয়া, গৃহবাসীদিগের শরীরের তেজ ও মনের বীর্য্য বিনাশ করিতে থাকে। অতএব বাসগৃহ সতত পরিষ্কৃত রাখা, গলিত ও দুর্গন্ধ বস্তু দৃষ্টিমাত্র অপসারিত করিয়া দেওয়া এবং রন্ধনের ধূম গৃহমধ্যে রুদ্ধ না হইয়া, যাহাতে তৎক্ষণাৎ উত্থিত ও বহির্গত হইয়া যায়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

বাসগৃহ মুক্ত ও পরিষ্কৃত রহিবে

শরীরের স্বেদাদি দ্বারা শয্যার আস্তরণ মলিন হইলে অত্যন্ত অস্বাস্থ্য-জনক হয়। তাহা হইতে যে এক প্রকার দুঃসহ দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে, তাহা নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রোগাবহ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। অনেক ব্যক্তির শয্যা এরূপ মলিন ও দুর্গন্ধ, যে উহা কস্মিন্ কালে রজকের হস্তস্পর্শ করিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। উহা প্রতিরাত্রিতে স্বেদস্বরূপ গরল সংযুক্ত হইয়া, তাহাদিগের স্বাস্থ্যসুখ হরণ করে, ইহা তাহারা জানিতে পারে না। অতএব শয্যা পরিষ্কৃত রাখা, বিশেষতঃ তাহার আস্তরণ সতত প্রক্ষালন ও পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শয্যা পরিষ্কৃত রাখিবে

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পরে, উহার আস্তরণাদি তুলিয়া বায়ু সেবিত করা এবং শয়নগৃহের দ্বার ও বাতায়ন উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তন্মধ্যে বায়ু-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে দেওয়া, সম্যক্ রূপেই বিধেয়। রাত্রিকালের শ্বাস, প্রশ্বাস, ও স্বেদ নিঃসরণ দ্বারা গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া থাকে, তাহা উল্লিখিত বায়ু-প্রবাহ দ্বারা অপসারিত হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ বায়ু সমাগম হইতে

শয্যার আস্তরণ পরিবর্ত্তন

পারে, এবং শয্যাতে যে সমস্ত স্বেদবিন্দু বিলিপ্ত থাকে, তাহাও ঐ বায়ুপ্রবাহ দ্বারা বিচলিত ও উড্ডীন হইয়া বহির্গত হইতে পারে। যাহাদের শরীর সুপটু নয়, তাহাদিগের শয্যা ও শয়নগৃহ উত্তমরূপ বায়ু-সেবিত করা নিতান্ত আবশ্যক ও সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক ব্যক্তি রাত্রিকালে অতিশয় ঘর্ম্মাক্ত হইত। বিস্তর ঔষধ সেবন করিয়াছিল, কিছুতেই প্রতীকার হয় নাই। কিছু দিন পরে দৃষ্ট হইল, তাহার শয্যার আস্তরণ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন আস্তরণ পাতিয়া দিলে, দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত কিছুমাত্র ঘর্ম্ম হয় না, এবং নিদ্রারও ব্যাঘাত ঘটে না। ইহা দেখিয়া, তাহার সমুদায় শয়ন বস্ত্র দুই দিবসান্তর প্রক্ষালণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার সে রোগের আশু প্রতীকার হইল এবং সে উত্তরোত্তর বলবান্ হইতে লাগিল।

ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য, বিশেষতঃ সামিষ ব্যঞ্জন কিয়ৎক্ষণ থাকিলেই পচিয়া উঠে; ইহা হইতে যে দুর্গন্ধময় বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা আমাদিগের পক্ষে বিষবৎ অনিষ্টকারী। তাহার ঘ্রাণ লইলে, শরীর-স্বাস্থ্যসাধনের অতি শীঘ্র ব্যতিক্রম ঘটে। অতএব, উহা গৃহ হইতে অবিলম্বে অপসারিত করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ পীড়িত ব্যক্তির গৃহে ঐ সকল সামগ্রী ক্ষণমাত্র রক্ষা করা বিধেয় নয়।

ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য শয়ন গৃহে রাখা গর্হিত

নিশ্বাস সহকারে শরীর হইতে যে বিষতুল্য অনিষ্টকারী পদার্থ নির্গত হয়, রাত্রিকালে বৃক্ষলতাদি হইতেও সেই পদার্থ নিঃসৃত হইয়া, সমীপস্থ সমস্ত বায়ু দূষিত করে। অতএব শয়ন-গৃহে সজীব বৃক্ষ ও জলাভিষিক্ত পুষ্প স্থাপিত করা, কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়; যে গৃহে ঐ সমস্ত বস্তু স্থাপিত হয়, তাহাতে শয়ন করিয়া, অনেক ব্যক্তি এক রজনীর মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

শয়নগৃহে সজীব বৃক্ষাদি রাখা অনুচিত

এতদ্দেশীয় অনেক লোক প্রস্তাবিত বিষয়ে আর একটি দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাহার তুলনায় উল্লিখিত সমুদায় দোষ, সামান্য দোষ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় শৌচাগার পার্য্যমাণে পরিষ্কৃত রাখিতে চাহেন না। কোম্পানির লোক তদর্থে তাঁহাদিগকে উত্তেজনা করিলে, তাহাকে উৎকোচ দিয়া বিদায় করিয়া দিবেন এবং আপনারা সপরিবারে দুঃসহ দুর্গন্ধ সহ্য করিয়া থাকিবেন, তথাচ উহার প্রতীকারার্থে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় অঙ্গীকার করিবেন না। মনে করেন, যৎকিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া ব্যয়ের লাঘব, করিলেন; কিন্তু শৌচাগার-জনিত সাঙ্ঘাতিক বিষ নিয়ত শরীরস্থ করিয়া প্রাণ ধন বিসর্জ্জন দিতেছেন, ইহা ভ্রমেও একবার ভাবেন না। প্রজারা যখন নিজ ভবনে, এবং রাজ-পুরুষেরা যখন রাজপথের প্রান্তবর্ত্তিনী জল-প্রণালীতে উক্তরূপ সাঙ্ঘাতিক বিষ সঞ্চার করিয়া রাখেন, তখন যে কলিকাতা একটি প্রকৃতরূপ প্রধান নরক হইয়া উঠিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি।

শৌচাগার পরিষ্কার রাখা উচিত

গৃহের বায়ু অভ্যন্তরস্থ অনিষ্টকর পদার্থ দ্বারা যেমন দূষিত হয়, সমীপস্থ অস্বাস্থ্য-কর বস্তু দ্বারাও সেইরূপ হইয়া থাকে। পল্লিগ্রামে বাস্তুর চতুর্দ্দিকে অনেক উদ্বাস্তু থাকাতে অপর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ু প্রাপ্ত হইবার উপায় আছে বটে, কিন্তু গৃহের পার্শ্ব-দেশ অত্যন্ত অপরিষ্কৃত করিয়া রাখাতে, সেই বিশুদ্ধ বায়ু অবিশুদ্ধ না হইয়া, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পায় না। দ্বার-সন্নিহিত আবর্জ্জনা-রাশি, দুর্গন্ধময় ক্ষুদ্র জলাশয়, বাঁশ বাকসাদির নিবিড় জঙ্গল ইত্যাদি অহিতকারী বস্তু দ্বারা সমুদায় গ্রামস্থ লোকের অতি সুলভ স্বাস্থ্যলাভের বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটে। গৃহ-মধ্যে মলমূত্রাদি যত প্রকার আবর্জ্জনা উপস্থিত হয়, সমুদায়ই বহির্দ্বার অথবা গুপ্তদ্বারের সমীপে রাশীকৃত থাকিয়া গৃহ-বাসীদিগের সতেজ শরীর নিস্তেজ ও সুস্থ দেহকে অসুস্থ করিয়া

গৃহ সমীপে অস্বাস্থ্য-কর দ্রব্য অনিষ্টকর

থাকে। উল্লিখিত অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী যে সময়ে জলপূর্ণ হয়, সে সময়ে তটস্থ-তৃণাদি তন্মধ্যে পতিত হইয়া পচিতে আরম্ভ হয়, এবং গ্রীষ্মকালে সেই জল যত শুষ্ক হয়, ততই বিষতুল্য বাষ্প-রাশি তাহা হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে রোগ ও মারী বিকীর্ণ করিতে থাকে। গৃহ-পার্শ্বে যে স্থানে নিবিড় জঙ্গল থাকে, তথাকার বায়ু কোন কালেও পরিশুষ্ক ও পরিশুদ্ধ হয় না। সে স্থানে যখন গমন করা যায়, তখনই এক প্রকার দুরাঘ্রেয় গন্ধ নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। বিশেষতঃ বর্ষাকালে গলিত পত্রাদি পচিয়া এমন অহিতকারী হয় যে, বোধ হয়, অনেক স্থান কলিকাতা অপেক্ষাও অস্বাস্থ্যজনক হইয়া উঠে।

বাস্তু ও উদ্বাস্তুর এইরূপ অপরিষ্কৃত অবস্থা যে রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ, ইহার শত শত প্রমাণ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে এডিন্‌বরা নগরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে কতকস্থান এ প্রকার অস্বাস্থ্যকর ছিল যে, প্রতিবৎসরই বসন্তকালে তথাকার কৃষকদিগের কম্পজ্বর হইত। তাহারা মনে করিত, পরমেশ্বরের বিড়ম্বনাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। পরে যখন তথাকার প্রবাহ-শূন্য পীড়াকারক জলাশয় সকল শোধিত হইল, সুনিয়মানুসারে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল, গৃহ সমুদায় প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত করিবার রীতি প্রচলিত হইল এবং দ্বার-সন্নিধানে যে সকল দুর্গন্ধময় রাশীকৃত আবর্জ্জনা থাকিত, তাহা দূরীকৃত হইল, তখন পূর্ব্বকার সমুদায় রোগ তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া সে স্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক বলিয়া, এতদ্দেশীয় লোকের যাবৎ হৃদয়ঙ্গম না হইবে, তাবৎ তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘন-জনিত বিবিধ শাস্তি ভোগ করিয়া, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে থাকিবেন।

অপরিষ্কৃত অবস্থা রোগোৎপত্তির হেতু

অক্ষয়-সুধা

চতুর্থ খণ্ড

১। ভারতে আর্য্য-আগমন

২। রাজা রামমোহন রায়

৩। সেই ও এই

৪। 'উপাসক-সম্প্রদায়ে'র রচনা-কার্য্য

অক্ষয়-সুধা

চতুর্থ খণ্ড

বিবিধ

ভারতে আর্য্য-আগমন

হিন্দুগণ কি শুভদিনে ও কি শুভক্ষণেই সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা উত্তরকালে যে অত্যুন্নত অতি দুর্লভ গৌরব-পদে অধিরোহণ করেন, ঐ দিনেই তাহা অনুসূচিত হয়। যে উজ্জয়িনী-জনিতা কবিতা-বল্লীর মধুময় কুসুম বিকসিত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত রাখিয়াছে, তদীয় বীজ ঐ দিনেই ভারত-ভূমিতে সমাহৃত হয়। যে পরমার্থ বিমিশ্রিত বিদ্যাবলী জলদানুবিদ্ধ পৌর্ণমাসী রজনীর ন্যায় মানবীয় মনের একটি অপরূপ রূপ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারও নিদান ঐ দিনেই ভারতবর্ষ মধ্যে সমানীত হয়। যে ইন্দ্রজালবৎ অদ্ভুত বিদ্যা, অবলীলাক্রমে দ্যুলোকের সংবাদ ভূলোকে আনয়ন করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালের ইতিহাস এক কালেই বর্ণন

করিতেছে, এবং জাহ্নবী-জল-পবিত্র পাটলিপুত্র ও শিপ্রা-সলিল-সুস্নিগ্ধ অবন্তিকায় অতিবিস্তৃত রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া অবনী-মণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাহার আদিম সূত্র ঐ দিনেই ভারত-রাজ্যে পতিত হয়। আরোগ্য-রূপ অমূল্য রত্নের আকর-স্বরূপ যে আয়ুঃ-প্রদ শুভকর শাস্ত্র আবহমানকাল স্বদেশীয় ও ভিন্ন-দেশীয় অসংখ্য লোকের রোগজীর্ণ বিবর্ণ মুখ-মণ্ডলকে স্বাস্থ্য-গুণে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে এবং কোটি কোটি জনের উৎপৎস্যমান শোক-সন্তাপ ও পতনোন্মুখ বৈধব্য-বিপদের একান্ত প্রতিবিধান করিয়া আসিয়াছে ও অদ্যাপি যে অমৃতময় শাস্ত্রকে ঔষধ-বিশেষের শক্তি যোগে কখন কখন প্রভাববতী ইউরোপীয় চিকিৎসাকেও অতিক্রম করিতে দেখা যায়, তাহারও মূল ঐ দিনেই ভারত-ক্ষেত্রে সংরোপিত হয়।

যে শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম-প্রভাবে ভারতবর্ষীয় আদিম-নিবাসী যাবতীয় জাতি বিজিত হইয়া গহন ও গিরি-গুহায় আশ্রয় লইয়াছে, এবং সে দিনেও যে শৌর্য্যাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ শূর-শেখর শিখজাতির হৃদয়-চুল্লী হইতে উত্থিত হইয়া অত্যদ্ভুত অনল-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, ঐ দিনেই তাহা এই আর্য্য ভূমিতে অবতারিত হয়। মহাবল-পরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত পূর্ব্ব-পুরুষেরা একহস্তে হল-যন্ত্র ও অপর হস্তে রণ-শাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্র কলত্র দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে, স্নেহ-পালিত গোধন সঙ্গে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছেন, ইহা স্মরণ ও চিন্তন করা কি অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়! ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের আগমন-পদবীতে আম্র-শাখা-সম্বলিত সলিলপূর্ণ কলসাবলী সংস্থাপন করিয়া রাখি এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনি এবং সেই পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষদিগের পদাম্বুজরজঃ গ্রহণ করিয়া কলেবর পবিত্র করিতে থাকি।

রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায় কোন্ কালে কিরূপ বিজ্ঞানোৎসাহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ভাবিলে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। যে সময়ে ভারতবর্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলিলে হয়, এবং যখন হিন্দু-সমাজে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নামোচ্চারণ মাত্রও ঘটিয়াছিল কি না সন্দেহ, এই দেশে সেই অন্ধকারময় সময়ে বিজ্ঞান-বিষয়ে এরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ-প্রকাশ আশ্চর্য্যের বিষয়।

ধন্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধি-জ্যোতিঃ ঘোরতর অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদরাশি বিদীর্ণ করিয়া এতদূর বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার সুবিমল স্বচ্ছ চিত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয়। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয়, জঙ্গলময় পঙ্কিল-ভূমি-পরিবেষ্টিত একটি অগ্নিময় আগ্নেয়-গিরি ছিল; তাহা হইতে পুণ্য পবিত্র প্রচুর জ্ঞানাগ্নি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত।

তুমি বিজ্ঞানের অনুকূল পক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণ-কুহর ধ্বনিত করিতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তূরবী-ধ্বনি অদ্যাপি বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া, এই অযোগ্য দেশেও জয়-সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশ-ব্যাপী শ্রম ও কুসংস্কার-সংহার-উদ্দেশে আততায়ি-স্বরূপে রণ-দুর্ম্মদ বীর পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এবং বিচার-যুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া, নিঃসংশয়ে সম্যক্‌রূপে জয়ী হইয়াছ।

তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমি-খণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তর মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ। তোমার সমকালীন

ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন সুমার্জ্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তোমাকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমান কাল হিন্দুজাতির মনোরাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়-পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর পতিত হইল না, হইবেও না ; নিয়তই এক ভাবেই উড্ডীয়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শত্রু বালিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু।

একদিকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত করিয়া জন্ম-ভূমিকে উজ্জ্বল করিবার যত্ন করিয়াছ, অপরদিকে সঙ্কটময় সুগভীর সমুদ্র-সমূহ উত্তরণ-পূর্ব্বক বৃটিস্‌রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, নানাবিধ রাজ্য-শাসন প্রণালীর সংশোধন ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ। সে সময়ের পক্ষে এ কি কাণ্ড ! কি ব্যাপার ! স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিমা ! তুমি ইংলণ্ডে গিয়া অধিষ্ঠান করিলে, তথাকার সুপণ্ডিত সাধু লোকে তোমার অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যান। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, একবার তথাকার কোন সজ্জন-সমাজে চমৎকার-সম্বলিত এরূপ একটি অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, সক্রেটিস্ বা নিউটন্ ধরণী-মণ্ডলে পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

তুমি আপন সময়ের অতীত বস্তু। কেবল সময়েরই কেন ? আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। একব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন, এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্মগ্রহণ, অবনী-মণ্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল, বোধ হয় না।

সহমরণ-নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংস্থাপন, স্বদেশীয় লোকের পদোন্নতি-সাধন ইত্যাদি তোমার কত জয়স্তম্ভ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। না জানি, কি কল্যাণময়ী মহীয়সী কীর্ত্তি-সংস্থাপন-উদ্দেশে অর্দ্ধ-ভূমণ্ডল অতিক্রম করিতে কৃত-সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলে। তাদৃশ সুদূর-স্থিত ভূখণ্ড-বাসী সুপ্রতিষ্ঠ সাধু লোকেও তোমার অসামান্য মহিমা জানিতে পারিয়া, প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক, তোমাকে সমাদর করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র ছিলেন। মনে মনে কতই শুভ সঙ্কল্প সঞ্চারিত ও কতই দয়া-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলে। কিন্তু ভারতের কপাল মন্দ! সে সমুদয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইলনা। বৃষ্টল! বৃষ্টল! তুমি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছ! আমাদিগকে একেবারেই অনাথ ও অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছ! যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-স্বাদ-ফল উৎপৎস্যমান হইয়াছিল, সেই অলোক-সামান্য বৃক্ষ-মূলে সাংঘাতিক কুঠার প্রহার করিয়াছ।

সেই বিপদের দিন কি ভয়ঙ্কর দিনই গিয়াছে! আমাদের সেই দিনের মৃতাশৌচ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে। সেই দিন ভারত-রাজ্যের কল্যাণ-শিরে বজ্রাঘাত হইয়াছে। এদেশীয় নব্য-সম্প্রদায়! সেই দিন তোমরা নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া রণজিৎ-শূন্য শিখ্ সৈন্যের অবস্থায় পতিত হইয়াছ। দুঃখজীবি কৃষিজীবিগণ! যে সময়ে তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের জন্য অপর্য্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াও, নিজে স্বচ্ছন্দ মনে ও নিরশ্রু-নয়নে অত্যপকৃষ্ট তণ্ডুল-গ্রাসও গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময়ে যিনি ঐ দুঃখ-রাশি পরিহার করিয়া, তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন এবং তজ্জন্য বৃটিস্ রাজ্যের রাজধানীতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তোমাদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক রাজপুরুষের নিকট স্বহস্তে লিখিয়া, বিশেষরূপ কাতরতা প্রকাশ করেন, সেই দিনে তোমরা সেই করুণাময় আশ্রয় ভূমির আশ্রয়-লাভে চির-দিনের মত বঞ্চিত হইয়াছ! ভারতবর্ষীয়

চির-নিগ্রহ-ভাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষরূপ দুঃখ-বিমোচন ও বিশেষরূপ উন্নতি-সাধন যাঁহার অন্তঃকরণের একটি প্রধান সঙ্কল্প ছিল এবং যে হৃদয়-বিদীর্ণকারী ব্যাপার স্মরণ হইলে, শরীরে শোণিত শুষ্ক হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যিনি নিতান্ত অযাচিত ও অশেষরূপ নিগৃহীত হইয়াও তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মঘাত-ব্যবস্থা ও তন্নিবন্ধন স্বজনবর্গের শোক-সন্তাপ, আর্ত্তনাদ ও অশ্রুবারি সমস্তই নিবারণ পূর্ব্বক ভারত-মণ্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া যান, সেই দিনে তোমরা সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে হারা হইয়াছ! বিবিধ পীড়ায় প্রপীড়িত জননী ভারতভূমি! যে আশা নরলোকের জীবন-স্বরূপ, সেই দিন তোমার সেই আশাবল্লী বুঝি নির্মূল হইয়াছে!

সেই ও এই

এককালে বীর-কেশরী গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দের বীরত্ব ও রণ-পাণ্ডিত্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া মুক্ত-কণ্ঠে যেরূপ গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে যেরূপ দীর্ঘকায় পরাক্রমশালী ও রণ-পণ্ডিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এখন তাহা কেবল পুরাবৃত্তের বিষয় ও উপাখ্যানের স্থল হইয়া পড়িয়াছে। সে আকার নাই, প্রকার নাই, বীর্য্য নাই ও আত্ম-রক্ষারও ক্ষমতা নাই। ভারত-ভূমি! তোমার মহিমা-সূর্য্য একেবারেই অস্ত গিয়াছে! তোমার কীর্ত্তি-চন্দ্র আর সঞ্চরণ করে না! কেবল তোমার ভুবন-বিখ্যাত বহুমূল্য দৃশ্যমান কোহিনূরই অন্তরিত হইয়াছে এমন নয়, তাহার বহুপূর্ব্বে চির-সঞ্চিত অমূল্য অন্তরস্থ কোহিনূর একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! দীর্ঘকায় এখন অতি ক্ষীণ হ্রস্বাকারে পরিণত হইয়াছে।

কোথায় সিংহ-শার্দ্দূলের ভয়াবহ গর্জ্জন-ধ্বনি, আর কোথায় ঝিল্লীগণের মৃদুমন্দ আর্ত্তস্বর! কোথায় বীরগণের বীরত্ব-দর্প ও স্পর্দ্ধা-সহকৃত সাহঙ্কার হুঙ্কার-ধ্বনি, আর কোথায় দীন হীন আশ্রিত জনের কৃতাঞ্জলিপুটে কৃপা-প্রার্থনা! সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! এককালের সিংহ-শার্দ্দূল প্রসবিনী ভারত-ভূমি এখন শশ-মূষিক-প্রসবিনী হইয়া কতই লাঞ্ছিত হইতেছেন! তদীয় পূর্ব্ব প্রতাপের চিতাগ্নি হইতে কি সুদীর্ঘ ও ঘনীভূত ধূমাবলী উত্থিত হইতেছে! তাহার বর্ত্তমান অবস্থা অগ্নিময়; ভবিষ্যৎ গাঢ়তর ধূমে আচ্ছন্ন।

বৃদ্ধকায় ভারত-ভূমি আর অধর্ম্মের ভার বহন করিয়া কুপোষ্য-পোষণ করিতে সমর্থ হন না। ভীম-জননী ও অর্জ্জুন-মাতা আর কাহার মুখাবলোকন করিয়া আশা-পথ অবলম্বন করিবেন? গগনস্পর্শিবৎ হিমালয় ও আর্য্যাবর্ত্তের বপ্র-বিশেষ বিন্ধ্যাচল যাহাদের বল ও বিক্রম, বীর্য্য ও উৎসাহ এবং ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠা রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, সেই মহাপুরুষদের বংশে এখন এই অধম পামর-স্বরূপ আমরাই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদের শোণিত-কণা হিন্দু জাতির রক্তশিরা হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। তদীয় চিতাভস্মকণাও বিদ্যমান নাই। সে সমস্ত পুরাতন মহত্তর পদার্থ একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার সহিত আর কণামাত্রও সংযোজিত হইল না, কখনও হইবেও না! তাহার কিছু কিছু কেবল ভারত-কথায় পরিণত হইয়াছে ও শ্রুতিপথমাত্রে অবস্থিত রহিয়াছে।

অস্ত্র-শিক্ষা ও অস্ত্র-পরীক্ষা যে জাতির বালক-সমূহের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের উৎসাহ-স্থল ছিল এবং প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-ক্রিয়া ও সামাজিক ব্যবহার বল-বিক্রম, তেজস্বিতা ও রণোৎসাহেরই পরিচায়ক ছিল, সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! যে জাতীয় লোকের সমগ্র তৃতীয়াংশ যুদ্ধ-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত যুদ্ধামোদে আমোদিত ও যুদ্ধমদে উন্মত্ত

ছিল, যাহারা যুদ্ধে বিমুখ ও যুদ্ধ-স্থলে ভয় প্রাপ্ত হইলে, ক্ষত্রিয় কুল-বহির্ভূত কুলাঙ্গার বলিয়া ঘৃণিত ও তিরস্কৃত হইত, ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইবে বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করিত এবং সুসভ্য বিদেশীয় বীরপুরুষেরা যাহাদিগকে মহাপরাক্রমশালী প্রধান যোদ্ধা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! যাহারা অভূতপূর্ব্ব প্রভূত শৌর্য্য বীর্য্য ও পরাক্রম প্রভাবে তুষার-মণ্ডিত হিমালয় অবধি সমুদ্র-সলিল-সুস্নিগ্ধ কন্যাকুমারী ও সাগর-পার-স্থিত দ্বীপ-দ্বীপান্তর পর্য্যন্ত আপনাদের জয়পতাকা ও ধর্ম্ম-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া অতুল-কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে এবং বলবৎ নদী-প্রবাহের পুরস্থিত তৃণ-পুঞ্জ-সদৃশ আদিম নিবাসী দিগকে নির্ভয়ে ও নৃশংসভাবে গহন ও গিরি-গুহায় তাড়িত করিয়া যার পর নাই রণ-প্রতাপ ও জিগীষা-প্রভাব-প্রদর্শন করিয়াছে, সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! তদীয় পূর্ব্ব-প্রভাব ও পূর্ব্ব-মহিমার ভগ্নাবশেষও বিদ্যমান নাই সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে! কোথায় সে হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ? কোথায় সে মথুরা ও উত্তর-কোশলা? কোথায় বা সে উজ্জয়িনী ও পাটলি-পুত্র? নাম আছে, কিন্তু পদার্থ নাই—অঙ্গার আছে, তাহাতে অগ্নি নাই, দেহ আছে, তাহাতে জীবন নাই—সাকারবাদীর অশ্বত্থ-মূল-বিদ্ধ কবাট-শূন্য জরাজীর্ণ দেবমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে দেব-বিগ্রহ বিরাজমান নাই! জয়শ্রী ও রাজশ্রী দেবী একেবারে অন্তর্হ্ত হইয়া গিয়াছেন!

মামুদ শা ও সবক্তিজীন্! তোমরা ঐরাবতের পদে লৌহ-শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়াছ—তাহার আর মোচন হইল না; বোধ হয় হইবেও না। মোগল ও পাঠান কুল! দুর্দ্ধর্ষ যবন-রাজ-কুল! তোমরা ক্রমাগতই তদীয় কঠিন বন্ধনের উপর কঠিনতর বন্ধন সংঘটন করিয়াছ। তাহার আর পদ-চারণ ও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনেরও সামর্থ্য নাই। তোমরা তাহাকে পরবশতারূপ কঠিন কারাগৃহে চিরকালের মত রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছ। এস্থলে পরবশ কি

ভয়ানক শব্দ! হিন্দুদের নরক, খৃষ্টানদের হেল্ ও মোসলমান্দের জাহান্নাম্ও বুঝি সেরূপ ভয়ানক নয়! নরকুলের কাল-স্বরূপ জঙ্গিজ্, তৈমুর ও নাদির্শার ভীষণ নামও সেরূপ ভীষণতর ভাব ধারণ করিতে পারে না! যে দিন তোমরা তাহাকে স্পর্শ করিয়াছ, সেই দিন তাহার স্বাধীনতা-সুখের মৃত্যু-দিবস! জননী ভারত-ভূমি! সেই দিন তোমার চির-দিনের মত দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল, সেই দিন তোমার চির-সঞ্চিত সুপ্রসন্ন ভাগ্য-জ্যোতিঃ ঘোরান্ধকারে পরিণত হইল! সেই দিন আমাদের ভারত-গৃহে অসীম-কাল-ব্যাপী মৃতাশৌচের ক্রন্দন-কোলাহল উত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। তোমার অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ আর নিরস্ত হইল না! কত শিলা-পাত, ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রাঘাত প্রভাবে সুমহান্ আশা-বৃক্ষ একেবারে উন্মূলিত ও বিনষ্ট হইয়া আকাশপথে উড্ডীয়মান ও অন্তর্হ্ত হইয়া গেল! জননী! এখন অভিষেক-বারির পরিবর্ত্তে কেবল অশ্রুজলে তোমার চরণযুগল অভিষিক্ত করিতেছে!

'উপাসক-সম্প্রদায়ের' রচনা-কার্য্য

শরীরের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থায় এত দূর চলিল, তাহা কি বলিব? না লিখন, না পঠন, না চিন্তন, না গ্রন্থ-শ্রবণ—কোনরূপ মানসিক ও শারীরিক কার্য্যেই আমি সমর্থ নই। ইহার কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত মাত্রেই মানসিক কষ্ট হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় এভাগের (দ্বিতীয়) কি রচনা, কি শোধন, কি মুদ্রাঙ্কন যে কিছু কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতি একটি বারও নেত্রপাত করিতে পারি নাই।

অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ় ভাব-সম্বলিত চিন্তা-প্রবাহ উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য-ক্ষয় করিতেছে স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তথাপি তাহা

নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। কষ্ট হয় বলিয়া, অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশে নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করি, কিছুতেই সে চিন্তা-স্রোত মন্দীভূত হয় না। যতক্ষণ সে সমুদায় এবং যাহা কিছু অন্যরূপে জানিতে পারি, তাহাও লিপিবদ্ধ করা না হয়, ততক্ষণ মস্তক মধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। আমার কর্ম্মচারীকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে, তাঁহাকে লিখিয়া রাখিতে বলি। কেহ নিকটে না থাকিলে, যান-বাহন-দ্বারা দূরস্থিত বন্ধু-বিশেষের সমীপে গমন পূর্ব্বক লিখিতে অনুরোধ করি। যাহার ষত্ব ণত্ব জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, অপার্য্যমাণে কখন কখন এরূপ অশিক্ষিত ও অযোগ্য লোকের দ্বারাও লিখাইতে হইয়াছে। অর্দ্ধরাত্রেও নিদ্রা-কাতর কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া কতবার কতবিষয়ই লিখাইতে হইয়াছে। নতুবা উপস্থিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হইয়া সে রজনীতে নিদ্রার সম্ভাবনা থাকিত না। মনোমধ্যে এরূপ কোন বিষয়ের উদয়েও কষ্ট, তাহার চিন্তন ও আন্দোলনেও কষ্ট, নিজে দূরে থাকুক, অন্য দ্বারা তাহা লিপি-বদ্ধ করাইতেও কষ্ট এবং যে পর্য্যন্ত লিপি-বদ্ধ না করা হয়, সে পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে। সেই যন্ত্রণা নিবারণ উদ্দেশেই লিপি-বদ্ধ করাইতে হইয়াছে এবং ইহাতেই অতীব অল্পে অল্পে পুস্তক খানি প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে।

কোন বিষয়ের প্রমাণ-প্রয়োগ-উদ্দেশে কোন গ্রন্থার্থ অবগত হইবার প্রয়োজন হইলে, ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা তাহা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতে হয়। তাহাই কি যে-সে দিনে ও যে-সে সময়ে শুনিতে পারি?—না, সমুচিত মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ হই? শরীরের অবস্থানুসারে দিন-বিশেষে ও সময়-বিশেষে ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে হইয়াছে। এইরূপ করিয়া কখন পাঁচ সাত পংক্তি, কখন দুই চারি পংক্তি, কখন দুই চারিটি বা দুই একটি শব্দ মাত্র এবং কদাচিৎ কিছু অধিকও বিরচিত হয়।

সেই সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া, উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই সমুদায় বাক্য যে প্রথমে যথাস্থানে পর পর লিখিত হয়, পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না। কোন্ বাক্যটি কোন্ স্থানে বা কোন্ বাক্যের পর বিনিবেশিত হইবে, উক্ত রূপে লিপি-বদ্ধ করাইবার সময় তাহা কিছুই স্থির থাকে না। সে সমুদায় যে দিবস একত্র সঙ্কলন করা হয়, সেই দিনই বিভ্রাট্! পূর্ব্বোক্ত রূপে, শরীরের অবস্থানুসারে দিন-বিশেষে ও সময়-বিশেষে তদর্থ ঔষধ-বিশেষ সেবন ও অন্যান্য নানারূপ প্রক্রিয়া করিয়া বহু কষ্টে সেটি কথঞ্চিৎ সম্পন্ন করিয়াছি। এইরূপ বহু-কষ্ট-সাধ্য সঙ্কল্পেও আবার কতবার কত প্রতিবন্ধকই ঘটিয়াছে। বলিব কি? যেরূপ বিপদের দিবসে বিপদ ভিন্ন অন্য কোন বিষয় মনে স্থান পায় না, সেইরূপ দিবসে অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশে এই পুস্তকের উপক্রমণিকাংশের অন্তর্গত রামমোহন রায় সংক্রান্ত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি শ্রবণ করি এবং সেইরূপ বিপদের সময়েই ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবস্থা বিষয়ক সন্দর্ভের পূর্ব্ব লিখিত বাক্যগুলি যথাস্থানে একত্র বিন্যস্ত করিয়া দিই।

এ অবস্থায় গ্রন্থ-প্রণয়নের অভিলাষ করা অনুচিত ও অসঙ্গত কার্য্য। ও-দিকে চির-জীবন নিশ্চেষ্টমনে কালহরণ করাও অসহ্য। তাহা স্থির ভাবে মনে করাও দুঃসহ যন্ত্রণার বিষয়। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া, এই গ্রন্থ-প্রকাশের অভিলাষ করি এবং পূর্ব্ব-লিখিত কিয়দংশ বিদ্যমান ছিল বলিয়াই, তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই। যে শুভকর বিষয়ে একবার কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছি, পার্য্যমানে দূরে থাকুক, অপার্য্যমানেও তাহা পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অতীব কষ্টের বিষয়। এই নিমিত্ত এইরূপ করিয়া কার্য্য সাধন করিতে হইয়াছে। যখন গুরুতর কার্য্যে মনঃসংযোগ করিবার পথ একেবারেই রুদ্ধ হইল, মনোহর পূর্ব্ব-বাসনা সমুদায় স্বপ্ন-কল্পিত ব্যাপার হইয়া গেল, এবং অনেক বৎসর একাদিক্রমে নানা প্রকার চেষ্টা পাইয়া যখন

রোগের শান্তি না হইল, তখন কেবল ঔষধ সেবন ও পথ্য-গ্রহণ দ্বারা রোগের সেবায় জীবন ক্ষেপ করা অপেক্ষায় এরূপ কষ্ট-স্বীকারও তৃপ্তির বিষয়। আমার পূর্ব্ব অধ্যবসায়-বৃত্তির নষ্টাবশেষ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা যদি এইরূপে কিছু কার্য্যকর হইয়া থাকে, তবে গুরুতর কল্যাণকর কার্য্য-সাধনের নিতান্ত অনুপযুক্ত এই বিষম শারীরিক দুরবস্থায় তাহাও আমাকে সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

এরূপ অবস্থায় কি কত দূর হইল কি বলিব? আমার আর বলিবার কথা নাই। সকলই শোচনার বিষয়। অন্তঃকরণ বার্দ্ধক্য-দশায়ও নানা প্রকার শুভকর বিষয়ে যৌবনোচিত প্রবল অনুরাগ-প্রভাবে সঞ্চরণ করিতে লাগিল; কিন্তু শরীর যৌবনাবধি বার্দ্ধক্য কাল অপেক্ষা নিস্তেজ হইয়া চিরদিন মৃতবৎ হইয়া রহিল! আমার জরাজীর্ণ কম্পমান লেখনীকে নিজহস্তে আর একটি বারও ধারণ করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারিলাম না! আমার একটি পরম বন্ধু একবার আক্ষেপ করিয়া বলেন, যাহার হস্ত পুস্তকালঙ্কারে অলঙ্কৃত না হইয়া, একদণ্ড কালও অতীত হইত না, এখন, বৎসর বৎসর ও যুগযুগান্তর তদ্ব্যতিরেকে অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে! ষোড়শ বা সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে রীতিমত শিক্ষারম্ভ করিয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত না হইতেই দুর্জ্জয় রোগ-প্রভাবে চির দিনের মত অসমর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলাম। যে সময়ে মনোমত কার্য্য সাধনের কেবল উদ্যোগ পাইতেছিলাম, সেই সময়ে চিরজীবনের মত গুরু লঘু সকল কর্ম্মেই অক্ষম হইলাম। তদবধি আমার বাসনারূপ বৃক্ষ-বাটিকায় আর না পুষ্প, না ফল—কিছুই উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিল না; শাখা পল্লবাদি সমস্তই শুষ্ক হইয়া গেল। কোথায় বা প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞান-বিশেষের বিশেষরূপ অনুশীলন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ক অভিনব তত্ত্বানুসন্ধান-চেষ্টা, কোথায় বা ভূমণ্ডল অথবা তদীয় ভূরিভাগ সন্দর্শন-বাসনায় এক এক বারে বহুবিধ

বর্ব্বর-নিবাস, সুপ্রাচীন মানব-কীর্ত্তি এবং অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সামগ্রী ও অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপারাদি-বিশিষ্ট বিস্তৃত ভূ-খণ্ড পরিভ্রমণ, কোথায় বা আপনাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকৃতির যুগপৎ সমোন্নতি-সাধন-ব্রতে-ব্রতী স্বদেশীয় সম্প্রদায়-বিশেষ-প্রবর্ত্তনের অভিলাষ এবং কোথায় বা বিজ্ঞান, দর্শন ও ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন ও স্বদেশ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার হিতানুষ্ঠান কামনা রহিল! সকলই বাষ্পীভূত হইয়া গেল! সকল বাসনাই নির্ম্মূল হইল! অঙ্কুরেই আঘাত ঘটিল! আমার হৃদয়স্থ পুষ্পোদ্যানটি একেবারেই শুষ্ক হইয়া গেল!

অক্ষয়-সুধা

পরিশিষ্ট

স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত—স্বরূপ-নির্ণয়

অক্ষয়-সুধা

পরিশিষ্ট

স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত—স্বরূপ-নির্ণয়

সমালোচনা করিতে হইলে, যাহার সমালোচনা করিতে হইবে, সমালোচককে তাহার নিকট যাইতে হইবে। সমালোচক যদি ইচ্ছা করেন যে, সমালোচ্য বস্তু বা ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসুক, তাহা হইলে সে সমালোচনা ভ্রান্ত হইবে। অক্ষয় কুমার দত্ত কি ছিলেন না, কি হইলেই বা ভাল হইত, সে আলোচনা বাঙ্গালা সাহিত্যে কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু তিনি কি ছিলেন, এবং যাহা ছিলেন, কেনই বা তাহা হইয়াছিলেন—এ আলোচনা আদৌ হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

অক্ষয় কুমার দত্ত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বৈজ্ঞানিক বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি তাহা ষোল আনাই ছিলেন। তবে, পাশ্চাত্য-দেশের অনেক বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তাঁহার যে সমুদায় প্রভেদ, তাহা ভারতবর্ষের হিন্দু-সমাজের লোক বলিয়াই, তাঁহার ভিতর প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কি, একথা বুঝাইয়া বলা বড়ই কঠিন। আমাদের দেশে

বৈজ্ঞানিকতার অবির্ভাবের অল্পদিন পরেই, ইউরোপ হইতে এমন অনেক আন্দোলন আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহা দেখিতে বৈজ্ঞানিক, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বৈজ্ঞানিক কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ পক্ষে বৈজ্ঞানিকতায় উন্নত ইউরোপে বা মার্কিণে, সেই সব চিন্তা-পদ্ধতি যদিই বা বৈজ্ঞানিক হয়, আমাদের দেশে তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় বৈজ্ঞানিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা। উদাহরণ স্বরূপে আমরা প্রেততত্ত্ববাদ (Spiritualism) এবং নব্য-ব্রহ্মবিগ্যার (Theosophy) নাম করিতে পারি।

এই দুই প্রকারের চিন্তা-পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিকতায় অভ্যস্ত ও সংস্কার-মুক্ত এবং স্বাধীন চিন্তার পথে বীরের ন্যায় অগ্রসর ইউরোপবাসীর নিকট বৈজ্ঞানিক হইলেও, আমাদের দেশে ঐ চিন্তা-পদ্ধতি বা আন্দোলন, বৈজ্ঞানিকতার বিরুদ্ধতা করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে, বিদেশ হইতে Mysticism বা ভাবুকতার তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, আমাদের চিন্তার মধ্যে অনেক সময় একটা অস্পষ্টতা ও জড়তা আসিয়াছে। ইহাও বৈজ্ঞানিকতার বিরোধী। স্পষ্টভাবে চিন্তা করিব, সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিব, প্রত্যেক বিষয় ও ব্যাপারকে নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব, কোথাও ভয় পাইব না—ইহাই বৈজ্ঞানিকতার লক্ষণ। অক্ষয় কুমারের চরিত্রে, এই লক্ষণই পূর্ণ মাত্রায় সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়।

অক্ষয় কুমারের উদ্ভবের পর, বিশ্ববিগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিগ্যালয়ের সাহায্যে সুদীর্ঘকাল আমরা ইউরোপের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছি, ইউরোপের বিগ্যায় আমাদের মস্তিষ্ক স্ফীত হইয়াছে, মুখের জোর অর্থাৎ তর্ক করিবার ও বক্তৃতা করিবার শক্তি খুব বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু হস্তপদ ও বক্ষ ক্রমশঃ তুলনায় দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। বহুদিন পরে দেশে কথা উঠিল—এ শিক্ষায় আমাদের

উপকার নাই, ইহা আমাদের অপকার করিয়াছে—আমাদের শিল্প শিক্ষা চাই, বিজ্ঞান শিক্ষা চাই। এই আন্দোলন আরম্ভ, চলিতেছে। শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষা সার্ব্বজনীন শিক্ষা। কাব্য ও দর্শনের উচ্চ শিক্ষা, উচ্চাধিকারীর শিক্ষা। এই সিদ্ধান্ত ছিল। অকর্ম্মণ্য মানুষ, বড় বড় শেখা-কথা না বুঝিয়াই আবৃত্তি করে—মনে করে, কাব্যরস আস্বাদন করিতেছি, অথবা দার্শনিক বিচার করিতেছি। কাব্য ও দর্শন, অধিকারী পুরুষের নিকট উচ্চতম ও পবিত্রতম বস্তু তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাবলম্বনহীন স্বাধীন চিন্তায় অনভ্যস্ত অলস ব্যক্তির পক্ষে ইহা একটি দুঃস্বপ্ন মাত্র। সুতরাং, বৈজ্ঞানিকতায় অনভ্যস্ত স্বাবলম্বন হীন কোন জাতিকে অতিমাত্রায় কাব্য-চর্চ্চায় অভ্যস্ত করা তাহাকে মৃত্যু-মুখে পরিচালনা করা, একই কথা।

অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়, কি পদ্ধতিতে দেশের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থাপত্র দিয়া গিয়াছেন—সে অনেক দিনের কথা। কিন্তু আজ সে কথা খুব ভাল করিয়া আলোচনা করা দরকার। তিনি প্রথমে ভাষাশিক্ষা ও লিপি-অভ্যাসের কথা বলিয়াছেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে—পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত, তাহার পর ভূগোল, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, রসায়ন, শারীর স্থান ও শারীর বিধান, তৎপরে পদার্থ-বিদ্যা, পুরাবৃত্ত, লোকযাত্রা-বিধান, মনোবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি, পরমার্থ-বিদ্যা, সাহিত্য, তাহার পর চিত্রবিদ্যাদি, শিল্প-বিদ্যা। তাঁহার সঙ্কলিত তালিকায় 'সাহিত্য' দ্বাদশ স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অর্থাৎ, কাব্যরস আস্বাদন করিবার পূর্ব্বে, যদি জীর্ণ করিবার শক্তি না জন্মায়, তাহা হইলে অজীর্ণতার বাষ্পোদ্গম নামক ব্যাধি (Intellectual Toxinization) জন্মাইবে। আমাদের দেশে তাহা জন্মাইয়াছে কিনা, সুধীবৃন্দ তাহা চিন্তা করিবেন। আর যদি জন্মাইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সুতীব্র জীবন-সংগ্রাম, আন্তজাতিক প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের যুগে, বৈজ্ঞানিকতাকে

একেবারে উপেক্ষা করিয়া, অপরিমিত কাব্য-দর্শনের সেবা ও তাহার ফলে মনোবৃত্তি ও হৃদয় বৃত্তি সমূহের প্রকৃত ভাব কেন্দ্রের অভাব ইহার হেতু কিনা তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।

আমাদের সাহিত্যালোচনায় অক্ষয় কুমারের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই। অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে বৈজ্ঞানিকতা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন শিক্ষা-পদ্ধতি তাহার কথঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। এখন অবশ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং আমরাও বুঝিয়াছি, বৈজ্ঞানিকতার পথে অগ্রসর না হইলে, আমাদের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। সুতরাং অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারার পুনরুত্থান অসম্ভব নহে।